নিশঙ্ক জীবনের গল্প

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর
জীবনভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

নাঙ্গা তলোয়ার

৬

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর
জীবনভিত্তিক উপন্যাস

(৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর জীবনভিত্তিক উপন্যাস

৬ষ্ঠ খণ্ড

মূল

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ

মাওলানা আলমগীর হোসাইন

উস্তাদ ঃ জামিয়াতুস সুন্নাহ

শিবচর, মাদারীপুর

আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স

(মাতৃভাষা বাংলায় বিশুদ্ধভাবে ইসলামকে সর্বস্তরে পৌঁছানোর একটি প্রয়াস)

৪০/৪১, আহমাদ কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৮১৯৪২৩৩২১, ০১৯১৫৫২৭২২৫

উৎসর্গ

তাঁদের প্রতি
যাঁদের সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়,
ইসলামের সত্যবাণী
উদ্ভাসিত হয়েছে বিশ্বময় ॥

ভূমিকা

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) ইসলামের ঐ তলোয়ারের নাম যা কাফেরদের বিরুদ্ধে চিরদিন খোলা থাকে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'সাইফুল্লাহ্' – 'আল্লাহর তরবারী'– উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি নাম করা ঐ সকল সেনাপতি সাহাবীদের অন্যতম যাঁদের অবদানে ইসলামের আলো দূর-দূরান্তে পৌছতে পেরেছে। শুধু ইসলামী ইতিহাস নয়; বিশ্ব সমরেতিহাসও হযরত খালিদ (রা)-কে শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের কাতারে গণ্য করে থাকে। প্রখ্যাত সমরবিদ, অভিজ্ঞ রণকুশলী এবং স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞগণও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর রণকৌশল, তুখোর নেতৃত্ব, সমরপ্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতীত্ব এবং বিচক্ষণতার স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন।

প্রতিটি রণাঙ্গণে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। কাফেরদের সংখ্যা কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোম সম্রাট এবং তার মিত্র গোত্রসমূহের সৈন্য ছিল ৪০ হাজারের মত। শত্রুর সৈন্য সারি সুদূর ১২ মাইল প্রলম্বিত, এর মধ্যে কোথাও ফাঁক ছিল না। অপরদিকে, মুসলমানরা (শত্রুবাহিনীর দেখাদেখি) নিজেদের সৈন্যদের ১১ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। তাও প্রতি দু'জনের মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান ছিল।

শত্রুসৈন্যের বিন্যস্ত সারিও বৃহদাকার ছিল। সৈন্যরা একের পর এক সাজানো ছিল। একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড়ানো। যেন একটি প্রাচীরের পিছনে আরেক প্রাচীর খাঁড়া। এর বিপরীতে মুসলমানদের সৈন্য বিন্যাসের গভীরতা ছিল না বললেই চলে।

ইতিহাস মুক। সমর বিশেষজ্ঞগণ বিস্মিত। সকলের অবাক জিজ্ঞাসা– ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের কিভাবে পরাজিত করল? রোমীয়দের সেদিন চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। এ অবিশ্বাস্য ঘটনার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পাকা ফলের মত মুসলমানদের ঝুলিতে এসে পড়েছিল।

এটা ছিল অভূতপূর্ব সমর কুশলতার ফল। ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) যে সফল রণ-কৌশল অবলম্বণ করেছিলেনতা আজকের উন্নত রাষ্ট্রের সেনা প্রশিক্ষণে গুরুত্বের সাথে তা ট্রেনিং দেয়া হয়।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) এটা মানতে রাজি ছিলেন না যে, দুশমনের সৈন্যসংখ্যা বেশী হলে এবং তাদের রণসম্ভার অত্যাধুনিক ও উন্নত হলে আর মুসলমানরা সংখ্যায় কম হলে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া উদ্বেগজনক ও আত্মঘাতী হবে। এমন ঘটনাও তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে ঘটেছে যে, তিনি সরকারী নির্দেশ এড়িয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করে শ্বাসরুদ্ধকর বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। এটা তাঁর প্রগাঢ় ঈমান এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের ফসল ছিল। ইসলাম এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভালবাসার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল।

এছাড়া হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। যে কোন পাঠক শ্রোতাই তাতে চমৎকৃত হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করলে তিনি এতটুকু বিচলিত কিংবা ভগ্নাহত হননি। খলিফার নির্দেশের সাথে সাথে সেনাপতির আসন থেকে নেমে গেছেন সাধারণ সৈনিকের কাতারে। সেনাপতি থাকা অবস্থায় যেমন শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেছেন, সৈনিক অবস্থায় তার থেকে মোটেও কম করেননি। ইয়ারমুক যুদ্ধশেষে হযরত ওমর (রা) এক অভিযোগে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে মদীনায় তলব করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মদীনায় এসে উপস্থিত হন এবং আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ান।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সেনাপতির সাথে 'অসেনাপতিসুলভ' আচরণ করলেও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর প্রতিক্রিয়া এমন শান্ত ছিল যে, হযরত উমর (রা)-কে এর জন্য একটুও চাপের সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি অবনত মস্তকে খলিফার নির্দেশ শিরোধার্য বলে মেনে নেন। প্রদত্ত শাস্তি অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-বরখাস্তের দরুণ দুঃখিত হন ঠিকই কিন্তু তাই বলে খলিফার বিরুদ্ধে তিনি টুশব্দটি করেননি। খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কল্পনাও মাথায় আনেননি। নিজস্ব বাহিনী তৈরী করেননি। পৃথক রণাঙ্গন সৃষ্টি করেননি। তিনি এমন কিছু করতে চাইলে পুরো সেনাবাহিনী থাকত তাঁর পক্ষে। জাতির চোখে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইতোমধ্যে দু'টি বিশাল সমরশক্তিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। এক ছিল পরাক্রমশালী ইরানী শক্তি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অপর পরাক্রমশালী রোম শক্তি। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) তাদেরকে চরম নাকানি-চুবানি খাইয়ে পরাজিত করে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা ইরাক এবং সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। খেলাফতের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি খলিফার সিদ্ধান্তে রুখে দাঁড়ান না। তিনি নিজের সম্মান-মর্যাদার কথা বিবেচনা না করে মাননীয় খলিফার মর্যাদা সমুন্নত রাখেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর পরিচয়, ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান এবং বর্তমান মুসলমানরা তাঁর থেকে কি আদর্শ গ্রহণ করতে পারে–বক্ষমান উপন্যাসে পাঠক তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পারবেন।

ইসলামের ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার কোন কোন ঘটনায় পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। একই ঘটনা একাধিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। ফলে তা হতে সত্য ও বাস্তব তথ্য আহরণ পাঠকের জন্য গলদঘর্মের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য-সঠিকরূপে পেশ করতে আমরা বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সম্ভাব্য যাচাই-বাছাই করেছি এবং অনেক পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর তা লিখেছি।) মাঝে মাঝে এমন স্থানে এসে হোচট খেয়েছি যে, কোন্‌টা বাস্তবভিত্তিক আর কোন্‌টা ধারণা নির্ভর–তা শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য-সূত্রের উপর ভিত্তি করে বাস্তবতা উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছি। এ কারণে মতান্তর ঘটবে; আর তা ঘটাই স্বাভাবিক। তবে এ মতবিরোধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অপ্রসিদ্ধ ঘটনায় গিয়ে প্রকাশিত হবে মাত্র।

যে ধাঁচে এ বীরত্ব-গাঁথা রচিত, তার আলোকে এটাকে কেউ উপন্যাস বললে বলতে পারে, কিন্তু এটা ফিল্মি স্টাইল এবং মনগড়া কাহিনী ভরপুর বাজারের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত নয়। এর পাঠক উপন্যাসের চাটনিতে 'ঐতিহাসিকতার পথ্য' গলধঃকরণ করবেন গোগ্রাসে। এতে ঐতিহাসিকতা বেশী, ঔপন্যাসিকতা কম।

এটা কেবল ইতিহাস নয়, ইসলামী ঐতিহ্যের অবয়ব। মুসলমানদের ঈমানদীপ্ত ঝাণ্ডা। পূর্বপুরুষের গৌরব-গাঁথা এবং মুসলিম জাতির জিহাদী জযবার প্রকৃত চিত্র। পাঠক মুসলিম জাতির স্বকীয়তা জানবেন, সাহিত্যরস উপভোগ করবেন এবং রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

বাজারের প্রচলিত চরিত্রবিধ্বংসী উপন্যাসের পরিবর্তে সত্যনির্ভর এবং ইসলামী ঐতিহ্যজাত উপন্যাস পড়ুন। পরিবারের অপর সদস্যদের পড়তে দিন। নিকটজনদের হাতে হাতে তুলে দিন মুসলিম জাতির এ গৌরবময় উপাখ্যান।

এনায়েতুল্লাহ্‌ আলতামাশ
লাহোর, পাকিস্তান

প্রকাশকের মিনতি

╠► সম্মানিত পাঠকবৃন্দের প্রতি এটি আমাদের একটি আনন্দঘন আয়োজন। মজাদার পরিবেশনা। ইতিহাসের উপাদান, সাহিত্যের ভাষা আর উপন্যাসের চাটনিতে ভরপুর এর প্রতিটি ছত্র। শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী ঝরঝরে বর্ণনা আর রুচিশীল উপস্থাপনার অপূর্ব সমন্বয় আপনার হাতের এই *নাঙ্গা তলোয়ার*।

╠► পাঠক অবশ্যই মুগ্ধ হবেন। লাভ করবেন অনাবিল আনন্দ। তুলবেন তৃপ্তির ঢেকুর। নাঙ্গা তলোয়ারের ৬ষ্ঠ ও সমাপনী খণ্ডের আত্মপ্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে আমরা এ ব্যাপারে গভীর আশাবাদী।

╠► ***শমশীরে বে-নিয়াম***-এর ভাষান্তর ***নাঙ্গা তলোয়ার***, মূল লেখক এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ। পাকিস্তানের জনপ্রিয় এই লেখকের সাথে বাংলাদেশের পাঠকবৃন্দকে নতুন করে পরিচয় করানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। ইতোমধ্যে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত হাতের একাধিক উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাংলার জনগণ এমন ঔপন্যাসিক পেয়ে বড়ই গর্বিত এবং আনন্দিত। এর জলন্ত প্রমাণ হলো– তাঁর কোন উপন্যাস ছেপে বাজারে আসতে দেরী, ছাপা ফুরাতে দেরী না।

╠► এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ-এর এমনি একটি অনবদ্য উপন্যাস ***শমশীরে বে-নিয়াম*** যা এখন বাংলায় অনূদিত হয়ে ***নাঙ্গা তলোয়ার*** নামে আপনার হাতে।

╠► সবটুকু মেধা, যোগ্যতা, অধ্যাবসায় সেঁচে পাঠকের রুচিসম্মত মুক্তা-মানিক্য উপহার দিতে আমরা একটুও কার্পণ্য করিনি। ভুল-ভ্রান্তি এড়িয়ে যাবার প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছি। পাঠক এ গ্রন্থ হতে জানতে পারবে মর্দে মুজাহিদ সাহাবী (রা)দের ঈমানদীপ্ত চেতনা, হযরত খালিদ (রা)-এর দুঃসাহসিক অভিযান ও বীরত্বগাঁথা। এবং লাভ করবেন মুসলিম মানসের দৃঢ়চেতা মনোবল। পাঠক সামান্যতম উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হবে। অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য পাবে বাস্তবতা। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন!

হযরত খালিদ (রা.)-এর মুজাহিদ বাহিনী দামেস্ক পানে ছুটে চলছিল।

রোমীয় সালার আযাযীর দামেস্ক পৌঁছেই শহর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার কার্যক্রম শুরু করে। দামেস্ক শহর-প্রাচীরের ৬টি দরজা ছিল। প্রত্যেক দরজার নাম ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আযাযীর দামেস্ককে অবরোধ হতে রক্ষার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বেশির ভাগ সৈন্য শহরের বাইরে রাখে। যাতে মুসলিম বাহিনী শহর পর্যন্ত পৌঁছতেই না পারে। তারা তাদেরকে শহরের বাইরেই খতম করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শহরে মাত্র নির্বাচিত একটি বাহিনী রাখা হয়েছিল। সেখানে একটি বিশেষ বাহিনীও ছিল, যাদেরকে 'জানবায বাহিনী' বলা হত। তারা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও শক্তিধর। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা ছিল সম্পূর্ণ সক্ষম এবং দক্ষ। বিশেষ প্রশিক্ষণে তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল।

সোয়া মাইল দৈর্ঘ্য এবং ৮৮০ বা ১১০০ গজ প্রস্থের দামেস্ক শহরের আবাদীতে এই সংবাদে বিরাট হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম বাহিনী শহর অবরোধ করতে ছুটে আসছে। এই সংবাদের পূর্বেই মুসলমান বাহিনী এসে শহরে পৌঁছে গিয়েছিল। সালার শহরবাসীদেরকেও শহর প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত করছিল। কিন্তু শহুরে লোকজন তাদের সহায়তা করছিল না। তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আর যুবতী কন্যাদের লুকাতে সর্বাত্মক তৎপর ছিল। কোনো কোনো পরিবার ও অভিভাবক তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেনারা তাদের প্রচেষ্টায় বাধ সাধছিল। তারা কাউকে শহর ত্যাগ করতে দেয় না।

মুজাহিদ বাহিনী দামেস্ক শহরের কাছাকাছি চলে এসেছিল প্রায়। ইতোপূর্বে যেসব গোয়েন্দাদের দামেস্কে পাঠানো হয়েছিল, তারা পর্যায়ক্রমে মুসলিম বাহিনীর কাছে ফিরে এসে সংগৃহীত তথ্য ও রিপোর্ট পৌঁছে দিয়ে আবার গন্তব্যে চলে যাচ্ছিল। চলমান মুজাহিদদের জযবা ছিল তুঙ্গে। দেশ, বাড়ি, স্ত্রী, সন্তান-এ সবের কোনো খেয়াল তাদের এ মুহূর্তে ছিল না। তারা এক আল্লাহর নামের জিকির করতে করতে পথ অতিক্রম করছিল। মাঝে মধ্যে রণ-সঙ্গীতেও সুর তুলে গাইছিল। তারা তাদের সার্বিক সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিল। তারা তাদের জান আল্লাহর জন্য কুরবান করে রেখেছিল। রোমীয়দের জন্য ছিল শুধু

তাদের প্রাণহীন দেহ। তাদের দেহগুলো কষ্ট, ব্যথা-বেদনা এবং আরাম-আয়েশের উর্ধ্বে চলে গিয়েছিল। তাদের এই অনুভূতিও ছিল না যে, তাদের সংখ্যা খুবই কম এবং এর বিপরীতে শত্রুদের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি।

মুসলিম বাহিনীর সালার হযরত খালিদ (রা.)-এর জযবার অবস্থাও তাঁর সিপাহীদের মতোই ছিল। ইতিহাসখ্যাত এই সেনাপতির দৃষ্টি বাস্তব অবস্থার উপরেও ছিল। জযবায় তার বুক ভরপুর থাকলেও বাস্তবতাকে তিনি কোনো সময় ভুলেন নি। তাই তিনি দামেস্ক পানে চলছিলেন আর ভাবছিলেন যে, এত কম সৈন্যকে বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ফল কীভাবে লাভ করা সম্ভব। তিনি ইতোপূর্বে কয়েকটি যুদ্ধে রোমীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে জেনেছিলেন যে, সৈন্য হিসেবে রোমীয়রা ভাল এবং তারাও লড়াই করতে জানে। হযরত খালিদ (রা.)-এর ভাবনায় এ দিকটিও ছিল যে, রোমীয়রা স্বদেশে রয়েছে এবং এর সুবাদে তারা যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তা আমাদের পাওয়া সম্ভব নয়। মুসলমানরা পরাজিত হলে তাদের কোথাও আত্মগোপনেরও জায়গা ছিল না। এহেন অবস্থায় হয়ত বন্দী হতে হবে অথবা নিহত হতে হবে। এসব দিক ভেবে হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীর মাঝে বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন।

এর মধ্যে একটি হলো, তিনি গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নততর করে তাকে গতিশীল করেন। অপর কয়েকটি পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, হযরত খালিদ (রা.) একটি অশ্ববাহিনী গড়ে তোলেন যার সদস্য ছিল চার হাজার নির্বাচিত অশ্বারোহী। এ ইউনিট যেমনি গতিশীল তেমনি অপ্রতিরোধ্য ছিল। এ বিশেষ বাহিনী এক স্থানে থেকে যুদ্ধ করত না; বরং চলতে চলতে হামলা করে উধাও হয়ে যেত। শত্রুকে অস্থির ও পেরেশান করে তুলতো। শত্রুদেরকেও তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লড়াই করাতো। তাদেরকে এক স্থানে জমে লড়াই করতে দিত না।

হযরত খালিদ (রা.) এই বাহিনীর কমান্ড নিজের হাতে রেখেছিলেন। দামেস্ক সফরকালে এই বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সর্বাগ্রে ছিল।

সফরের চতুর্থ দিন চলছিল। এদিন সর্বাগ্রে থাকা বিশেষ বাহিনী মারাজুস ছুফর নামক এক বসতি এলাকার কাছে গেলে আগে পাঠানো দুই গোয়েন্দা ফিরে আসে। হযরত খালিদ (রা.) এই অশ্ববাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। গোয়েন্দারা তাঁকে জানায় যে, কিছু দূর সামনে একদল রোমীয় সৈন্য শিবির স্থাপন করে অবস্থানরত আছে। গোয়েন্দাদের তথ্য মতে সেটা ছিল দামেস্ক হতে ১২/১৩ মাইল দূরে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রোমীয়দের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। তাদের বেশির ভাগ ছিল অশ্বারোহী। সৈন্যদের মাঝে দু'জন সালার ছিল। আযাযীর ও

কুলূস। এদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা ছিল। তাদেরকে দামেস্কের সালার তুমা এই পরিকল্পনা করে পাঠিয়েছিল যে, যাতে মুসলিম বাহিনী দামেস্ক পর্যন্ত না পৌঁছতে পারে। যদি তাদেরকে সমূলে শেষ করা না যায় তবে অন্তত এমন দুর্বল করে দেয়া যে, তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এটাও না পারলে এ কাজটি অবশ্যই করা যে, তাদেরকে দামেস্ক থেকে বেশির থেকে বেশি দিন দূরে রাখা। যাতে দামেস্ক শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য বেশির থেকে বেশি সৈন্য সেখানে এসে জমা হতে পারে এবং শহরের মধ্যে এত বেশি খাদ্যসামগ্রী জমা করা যায়, যাতে অবরোধ বিলম্বিত হলেও শহরে খাদ্যের অভাব যেন না দেখা দেয়।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে এই সমস্যা দেখা দেয় যে, তাঁর সঙ্গে মাত্র এই একটি বাহিনীই রয়েছে, যাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। অবশিষ্ট বাহিনী তখনো অনেক দূরে ছিল। অগ্রগামী বাহিনীর গতি ছিল দ্রুত। শত্রুদের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে হযরত খালিদ (রা.) চলার গতি হ্রাস করেন। এর একটি উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যেন ইতোমধ্যে পুরো বাহিনী এসে যায়। দ্বিতীয় কারণ ছিল, দুশমনদের কাছাকাছি সন্ধ্যায় পৌঁছা। যাতে তারা পুরো রাত বিশ্রাম নিয়ে তাজাদম হতে পারে এবং পরদিন প্রভাতে লড়াই শুরু করা যায়।

যদি আগে আগে গোয়েন্দা না পাঠানো হত এবং তারা এসে শত্রুপক্ষের অবস্থানের কথা না জানাত, তাহলে হযরত খালিদ (রা.) শুধু বিশেষ অশ্ববাহিনী নিয়ে শত্রুদের মুখোমুখি হতেন আর তখন পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে থাকত না। রোমীয়দের ১২ হাজার সৈন্য খুবই উপযোগী এলাকায় অবস্থান করছিল। সেখানে একটি উপত্যকা ছিল। যার মধ্যে ঘন ঘন গাছ ছিল এবং পাহাড়ের একটি সারি ছিল। রোমীয়রা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উপত্যকার মুখোমুখি প্রান্তরে অবস্থানরত ছিল। তারা যুদ্ধের জন্য এই স্থানটি নির্বাচন করেছিল। এতে তাদের কয়েকটি লাভের দিক ছিল। তারা যেভাবে অবস্থান নিয়েছিল তাতে তা মুসলমানদের জন্য কঠিন ফাঁদে পরিণত হয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.) তাদের চলার গতি এমন রাখেন, যাতে সূর্যাস্তের একটু পূর্বে দুশমনের মুখোমুখি পৌঁছেন। শত্রুদের থেকে তাদের দূরত্ব ছিল এক মাইলের মত। হযরত খালিদ (রা.) এই এক মাইল দূরত্বে সেনাক্যাম্প স্থাপন করার নির্দেশ দেন। যেহেতু ইতোমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়েছিল তাই শত্রুদের আক্রমণের কোনো আশংকা ছিল না।

১৩ হিজরীর জুমাদাস সানী মাসের ১৮ তারিখ ছিল। চাঁদনী রাত, আলোকস্নাত। হযরত খালিদ (রা.) পায়ে হেঁটে সামনে যান। রোমীয় টহলরত অশ্বারোহী সান্ত্রীরা টহল দিয়ে ফিরছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদের চোখ

ফাঁকি দিয়ে ঐ পাহাড়ের কাছাকাছি চলে আসেন, যেখানে শত্রুসেনারা শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিল। হযরত খালিদ (রা.) আশেপাশের স্থান ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কেননা, সকাল হতেই তাকে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ করতে হবে। তিনি গভীরভাবে দেখছিলেন যে, তাদের অশ্বারোহীদের পালিয়ে যাবার কোনো পথ আছে কিনা।

হযরত খালিদ (রা.)-এর টেনশনের বিষয় এটা ছিল যে, তার মূল বাহিনী অনেক অনেক দূরে ছিলেন। তিনি যদিও বার্তা পাঠিয়েছিলেন দ্রুতগতিতে আসার জন্য কিন্তু তত তাড়াতাড়ি পৌঁছা সম্ভব ছিল না। ইতোপূর্বেও তাদের গতি ছিল দ্রুত। কেননা তারা সর্বদা দ্রুতগতিতেই সফর করত।

৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ আগস্ট মোতাবেক ১৩ হিজরীর ১৯ জুমাদাস সানীর প্রভাত রবির উদয় হয়। ফজরের নামায শেষ হতেই হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেন। ওদিকে রোমীয়রাও প্রস্তুত হতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) রোমীয় বাহিনীর সৈন্যবিন্যাস দেখে আশংকা করেন যে, হয়ত তারা আগে বেড়ে হামলা করতে ইচ্ছুক নয়। হযরত খালিদ (রা.)-ও আগে হামলা করার পজিশনে ছিলেন না। তাঁর এতটুকু সময়ের প্রয়োজন ছিল, যেন তার মধ্যে মূল বাহিনী এসে পৌঁছতে পারে।

হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের মতিগতি বোঝার জন্য তাঁর বাহিনীর একাংশকে হামলা চালিয়ে পেছনে অথবা ডানে-বামে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী সমুদ্রের উর্মিমালার মত এগিয়ে যায়। রোমীয়রা তাদের হামলা প্রতিরোধ করার পরিবর্তে পেছনে সরে যায়। মুসলিম অশ্বারোহীরা এই চিন্তায় আরও অগ্রসর হয় না যে, আরও আগে গেলে শত্রুরা তাদের ঘিরে নিতে পারে। সম্মুখ যুদ্ধে এখনই জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছাও তাদের ছিল না। ফলে তারা যে গতিতে গিয়েছিল ঘোড়া ফিরিয়ে আবার সে গতিতেই ফিরে আসে।

কয়েকজন সালার হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। সকলের ধারণা ছিল, রোমীয়রা এবার আক্রমণ করবে। তাদের সৈন্য ছিল মুসলমানদের তিন গুণ। কিন্তু তারপরও তারা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। জবাবী হামলা চালায় না।

"খোদার কসম! রোমীয়দের মতিগতি ভিন্ন" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের বলেন, "তারা আমাদের সঙ্গে খেলতে চায় আর আমি স্বীয় বাহিনীর আসার অপেক্ষায় রয়েছি"।

"তাদের সঙ্গে খেলব ইবনে ওলীদ?" সালার যাররার বিন আযওয়ার (রা.) বলেন, "তারা লড়তে চায় না, তাদের ইচ্ছা আমাদের গতিরোধ করা।"

"সম্ভবত তাদের জানা নেই যে, আমাদের সৈন্যরা এখনও দূরে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

"এটাও চিন্তা করুন ইবনে ওলীদ!" সালার শুরাহবীল (রা.) বলেন "এটা কি এ সতর্কতাও হতে পারে না যে, আমাদের বাহিনী হয়ত অন্য কোনো দিক হতে এসে তাদের উপর চড়াও হবে!"

"আমি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছি" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

রোমীয়দের দৃষ্টি ফিরানোর জন্য হযরত খালিদ (রা.) এই ব্যবস্থা নেন যে, শত্রুদেরকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানান। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তৎযুগের নিয়ম ছিল দু'পক্ষের ব্যাপক যুদ্ধের পূর্বে মল্লযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হত। এতে উভয়পক্ষের এক একজন যোদ্ধা ময়দানে এসে একে অপরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতো।

হযরত খালিদ (রা.) হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.), হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.) এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-কে মল্লযুদ্ধ করতে আগে পাঠান। তিনজনই সালার ছিলেন। তারা উভয় ফৌজের মাঝে গিয়ে ঘোড়া দৌড়াতে থাকেন এবং শত্রুদেরকে মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানান। তাদের জবাবে রোমীয় বাহিনী হতে তিন অশ্বারোহী আসে। তারাও সালার পদমর্যাদার ছিল। রোমীয়রা যুদ্ধবাজ জাতি ছিল। এ জাতি বহু প্রখ্যাত যোদ্ধাদের জন্ম দিয়েছে। হযরত খালিদ (রা.)-এর তিন সালারের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে আসা রোমীয় তিনজনই ছিল ভয়ঙ্কর যোদ্ধা।

উন্মুক্ত প্রান্তরে লড়াই শুরু হয়। এটা ছিল তিন জোড়া যোদ্ধার যুদ্ধ। তিন জোড়া পৃথক পৃথক হয়ে যায়। ঘোড়া দৌড়াচ্ছিল। চক্কর দিয়ে ফিরছিল। বর্শায় বর্শায় সংঘর্ষ হচ্ছিল। উভয় বাহিনী হতে স্লোগান উচ্চারিত হচ্ছিল। ঘোড়ার পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধুলারাশিতে ঘোড়াগুলো হারিয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর এক সময় ধুলার আবরণ ভেদ করে একটি ঘোড়া বাইরে বেরিয়ে আসে। তার আরোহী একদিকে ঝুলে পড়েছিল। ঘোড়া লাগামহীন হয়ে ওদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছিল। সে ছিল এক রোমীয় সালার যে মারাত্মক আহত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে রোমীয়দের সারি চিড়ে এক অশ্বারোহী দৌড়ে আসে এবং পতনোন্মুখ অশ্বারোহীর কাছে গিয়ে তাকে তুলে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে সে মরে গিয়েছিল।

একটু পরে আরেক রোমীয় অশ্বারোহী ভূপতিত হয়। এক সময় তৃতীয় রোমীয় সালারও ভূতলে লুটিয়ে পড়ে। রোমীয় তিন সালারই মারা যায়। হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.) তাঁর চিরায়ত নিয়মানুযায়ী যুদ্ধে নেমেই শিরস্ত্রাণ, বর্ম এবং জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলেন। মল্লযুদ্ধ এক সময় শেষ হলে তিন রোমীয় সালার মরে ইতস্তত পড়ে ছিল। হযরত যাররার (রা.), হযরত শুরাহবীল (রা.)

এবং হযরত আব্দুর রহমান (রা.) রোমীয়দের প্রথম সারির কাছে গিয়ে ঘোড়া দৌড়াতে থাকেন এবং তাদেরকে শক্তি পরীক্ষা করার আহ্বান করছিলেন।

"রোমীয়রা! লাশগুলো উঠিয়ে নাও। সামনে আস কাপুরুষরা!"

"আমরা রোমীয়দের জমদূত।"

"রোমীয়রা! এই ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে।"

এদিকে মল্লযুদ্ধে নামা মুসলিম সালারদের বিজয়ে মুসলিম বাহিনীতে আনন্দের স্রোত বইতে থাকে। তারা থেকে থেকে এমন নারাধ্বনি ও শ্লোগান দিচ্ছিল যে, তাতে আকাশ পর্যন্ত কাঁপছিল।

ইতোমধ্যে আরেক রোমীয় অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে ময়দানে আসে এবং সে তলোয়ার উঁচিয়ে ঘোড়াকে ছুটাতে থাকে।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) আগত এ রোমীয় পানে এগিয়ে গেলে হযরত যাররার (রা.) তার ঘোড়ায় পদাঘাত করেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলেন, "আবু বকরের পুত্র পেছনে থাকুন। তাকে আমার জন্য ছেড়ে দিন।" এ কথা বলেই হযরত যাররার (রা.) হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-কে ছেড়ে সামনে এগিয়ে যান। রোমীয় সালার হযরত যাররার (রা.)-কে আসতে দেখে ঘোড়া তার দিকে ঘুরিয়ে আনে। কিন্তু হযরত যাররার (রা.) তাকে ঘোড়া পরিপূর্ণ ঘোরাতে দেননা। ইতোমধ্যে তিনি তলোয়ারের অগ্রভাগ রোমীয় সালারের পার্শ্বদেশে বসিয়ে দেন। কিন্তু এত বেশি না যে, সে আহত হয়ে পড়ে যায়। হযরত যাররার (রা.) তাকে মোকাবিলা করার সুযোগ দেন। সে মোকাবিলা করে কিন্তু তার উৎসাহ ও প্রেরণা প্রথম আহত হওয়াতেই খতম হয়ে গিয়েছিল। হযরত যাররার (রা.) তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। শেষে এমন কোপ দেন যে, এক কোপেই সে দু'ভাগ হয়ে ভূতলে আছড়ে পড়ে।

মদীনার এই তিন সালারের মোকাবিলায় আরও কয়েকজন রোমীয় সালার আসে এবং সবাই মারা যায়। হযরত যাররার (রা.), হযরত শুরাহবীল (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান (রা.) শুধু এতটুকুই করেন না যে, রোমীয়দের সৈন্যসারির প্রথম কাতারে গিয়ে ঘোড়া দৌড়াতেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে নামার আহ্বান জানাতেন; বরং কোনো রোমীয় তাদের খোঁচা মারা আহ্বানের জবাব দিলে সে তাদের তিন জনের মধ্যে হতে যার সামনে পড়ত তিনি তাকে বর্শা অথবা তলোয়ার দ্বারা শেষ করে দিতেন। এ প্রক্রিয়ায় তাঁরা কয়েকজন রোমীয়কে আহত এবং নিহত করেন।

হযরত খালিদ (রা.) এতক্ষণ যাবত তামাশা দেখছিলেন। এক সময় তিনি জযবায় ফেটে পড়েন। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং সামনে চলে আসেন।

"তিন জনই পেছনে সরে এসো!" হযরত খালিদ (রা.) জলদগম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশটি দেন এবং ময়দানে তাঁর ঘোড়া ছুটাতে থাকেন।

তাঁর হাতে বর্শা ছিল। ঐতিহাসিকগণ তাঁর যুদ্ধ আহ্বানের কথাগুলো এভাবে লিখেছেন–

আমি ইসলামের স্তম্ভ।

আমি আল্লাহর রসূলের সাহাবী।

আমি খালিদ বিন ওলীদ।

আমি মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার, আমার মোকাবিলায় রোমীয় বাহিনীর সিপাহসালার এসো।

আল্লামা ওকিদী এবং তবারী (রহ.) লিখেছেন, রোমীয় সালার আযাযীর এবং কুলূসের মধ্যে টানাপোড়েন ছিল। যখন হযরত খালিদ (রা.) এই আহ্বান জানান যে, তাঁর মোকাবিলায় যেন সিপাহসালার আসে। তখন রোমীয় সালার আযাযীর তার সাথী কুলূসের দিকে তাকান এবং বলেন, কুলূস নিজেকে নিজে সিপাহসালার মনে করে। আমি তার তুলনায় কিছুই নই। কুলূস এ কথা শুনে চুপ থাকে কিন্তু মোকাবিলা করার জন্য সামনে অগ্রসর হয় না।

"আমাদের সালার কুলূস ভয় পেয়েছে" আযাযীর খোঁচা দিয়ে বলে। আযাযীর কুলূসকে আরও অনেক খোঁচা মারা কথা বলে। কুলূসের কিন্তু সালার তাকে খোঁচার পর খোঁচা দিয়ে চলছিল। আযাযীরের তীরের খোঁচায় অতীষ্ট হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক সময় কুলূস তার ঘোড়া বের করে এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর মোকাবেলার জন্য ময়দানে আসে।

চার জন ঐতিহাসিক সর্বসম্মতভাবে লিখেন যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে বর্শা ছিল। কুলূস তাঁর দিকে এলেও তার প্রকৃতি হামলাকারীর মত ছিল না। সে হযরত খালিদ (রা.)-কে কিছু ইশারা দেয়, যেন সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) তার ইশারা আমলে নেন না। কেননা, শত্রুর বন্ধুসুলভ ইশারাও অনেক সময় ধোঁকা হয়ে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া কুলূসের দিকে ছুটিয়ে দেন এবং তার উপর বর্শার আঘাত হানেন। কুলূস অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিল। সে বর্শার আঘাত হতে নিজেকে রক্ষা করে।

হযরত খালিদ (রা.) আবার সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ঘোড়া ঘুরান এবং কুলূসের উপর দ্বিতীয় হামলা করার জন্য এগিয়ে যান। কুলূসের উপর আবার আক্রমণ চালান কিন্তু কুলূস এবারও তার হামলা ব্যর্থ করে দেয়। হযরত খালিদ (রা.) তার বর্শা ছুঁড়ে ফেলেন। কুলূস দেখে যে, এবার হযরত খালিদ (রা.) খালি হাতে আসছেন। সে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়া নিরাপদে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু তিনি ঘোড়া বেশি দূর নিয়ে যান না।

একটু এগিয়ে আবার পেছনে ঘুরান। ইতোমধ্যে কুলূসও ফিরে আসে। কুলূস ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। সে চাচ্ছিল ভাল পজিশনে এসে চরম আঘাত হানতে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) পেছন হতে এসে তাকে মজবুতভাবে এঁটে ধরেন এবং ঘোড়া থেকে নিচে ফেলে দেন। কুলূসকে মাটিতে ফেলেই তিনিও ঘোড়া থেকে নামেন এবং কুলূসকে জাপটে ধরেন।

কুলূস মাটিতে পড়ে ছিল। সে উঠার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর মুহাফিজদের ডাক দেন। দু'তিন মুহাফিজ দৌড়ে গেলে হযরত খালিদ (রা.) তাদের বলেন যে, কুলূসকে বন্দী করে ফেল। এভাবে কুলূস মরার হাত থেকে বেঁচে যায় এবং যুদ্ধবন্দী হয়।

যখন সালার কুলূসকে বন্দী করে হযরত খালিদ (রা.)-এর মুহাফিজরা নিয়ে যায়, তখন তাকে পেছনে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, যাতে রোমীয়রা তাকে দেখতে পায়। হযরত খালিদ (রা.) পুনরায় ঘোড়ায় চেপে বসেন। তিনি ঘোড়া ছুটাতে থাকেন এবং রোমীয়দেরকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান জানান। তিনি তাদের প্রতি তাচ্ছিল্যও প্রদর্শন করছিলেন। কুলূসের ঘোড়া এক স্থানে থেমে গিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর ইঙ্গিতে তাঁর এক মুহাফিজ কুলূসের ঘোড়া আটক করে।

হযরত খালিদ (রা.)-এর আহ্বানের জবাবে এবার রোমীয় সালার আযাযীর সামনে আসে।

"ওহ কুলূস!" সালার আযাযীর হযরত খালিদ (রা.)-এর আহ্বানের জবাব দানের পরিবর্তে তার সঙ্গী সালার কুলূসকে সম্বোধন করে খোঁচা দেয় "তোমার পরিণাম দেখ, কাপুরুষ ছোট লোক! তুমি আমাকে অপমান করতে চাচ্ছিলে? এবার আমার তলোয়ারের নৈপুণ্য দেখ।" সে এ কথা বলে হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি আক্রমণ করার পরিবর্তে স্বাভাবিকভাবে তার ঘোড়া হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে অগ্রসর করে এবং আক্রমণাত্মক কণ্ঠে বলে, "আরব ভাই! আমি তোমার কাছে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব, কাছে এসো।"

"এসো আল্লাহর দুশমন!" হযরত খালিদ (রা.) তার খোঁচা অনুধাবন করে বলেন, "আমি তোমার কাছে গেলে তোমার মাথা শরীরের সঙ্গে থাকবে না। তুমিই এগিয়ে এসো।"

আযাযীর তলোয়ার বের করে হযরত খালিদ (রা.)-এর পানে এগিয়ে যায় কিন্তু সে হাসছিল। যেন হযরত খালিদ (রা.)-কে পাত্তাই দিতে চায় না। সে হযরত খালিদ (রা.)-এর অদূরে এসে থেমে যায়।

"আরব ভাই!" আযাযীর বলে "তোমাকে আমার মোকাবেলায় কে আসতে বলেছে? তোমার কি এই চিন্তা হয় না যে, তুমি আমার হাতে মারা গেলে তোমার সঙ্গী সালাররা তোমাকে ব্যতীত কী করবে?

"হে আল্লাহর দুশমন রোমীয়!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "তুমি কি দেখনি যে, আমার সঙ্গীগণ কী করে দেখিয়েছেন? তারা যদি আমার অনুমতি পেত, তাহলে তোমার সমস্ত বাহিনী ঐভাবে কেটে সাবাড় করে দিত, যেভাবে তোমার এই সাথীরা কেটে মরে পড়ে আছে। আমার সঙ্গীগণ আমাকে পরকালের উদ্দেশ্যে মহব্বত করেন। এই জীবন এবং এই দুনিয়া তাদের কাছে কিছুই নয়। তুমি কে? আমি তোমাকে চিনি না।"

"হে হতাভাগা আরব!" আযাযীর হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে বলে, "আমি এই দেশের প্রতাপশালী সালার। তোমার জন্য গযব স্বরূপ। আমি পারস্যদের হত্যাকারী। তুর্কী বাহিনীকে ধ্বংসকারী।"

"আমি তোমার নাম জানতে চাচ্ছি" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

"আমি মৃত্যুর ফেরেশতা" আযাযীর বলে, "আমার নাম আযাযীর; তবে আমি তোমার জন্য আজরাঈল।"

"খোদার কসম! তুমি যে মৃত্যুর ফেরেশতা, সে মৃত্যু তোমাকে খুঁজে ফিরছে।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "সে তোমাকে জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নতর স্তরে তোমাকে পৌছে দিবে।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর এই খোঁচায় আযাযীরের উত্তেজিত হয়ে উঠা দরকার ছিল। কিন্তু সে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখে।

"আমার আরব ভাই!" আযাযীর হযরত খালিদ (রা.)-কে বলে, "তুমি তোমার বন্দী কুলূসের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছ?

"ঐ দেখ রোমীয় সালার!" হযরত খালিদ (রা.) জবাবে বলেন, "তোমার সালার বাঁধা রয়েছে।"

আযাযীরের কথার ধরন এবং কণ্ঠ আরও নম্র হয়ে যায়।

"তাকে তোমার হত্যা না করার কারণ কী?" আযাযীর বলে "তুমি জান না যে, রোমীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধূর্ত ও শয়তান হলো কুলূস। ... তুমি তাকে হত্যা করছ না কেন?"

"কোন কারণ নেই"– হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "শুধু এই ইচ্ছায় যে, তোমাদের দু'জনকে একত্রে হত্যা করব।"

এই দুই সালারের পারস্পরিক শত্রুতা এত বেশি ছিল যে, সে হযরত খালিদ (রা.)-এর কোনো কথায় উত্তেজিত হচ্ছিল না।

"আমার একটি কথা মন দিয়ে শোনো আরব সালার!" আযাযীর মিত্রতামূলক কণ্ঠে বলে, "যদি তুমি আমার সামনে কুলূসকে হত্যা কর, তাহলে আমি তোমাকে এক হাজার দীনার, দশটি রেশমী জুব্বা এবং উন্নত জাতের পাঁচটি ঘোড়া দিব।"

"হে রোমের প্রতাপশালী সালার!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এগুলো তো তুমি কুলূসের হত্যার বদলে দিলে। এর আগে বল, আমার হাত হতে বাঁচতে তুমি আমাকে কী দিবে। তোমার জীবনের মূল্য বল।"

"তুমিই বল" আযাযীর বলে "কী নিবে?"

"জিযিয়া!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "এটা না দিতে চাইলে ইসলাম কবুল কর।"

এবার আযাযীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

"আয় আরবের বদ্দু!" আযাযীর বলে, "এবার আমার ধার দেখ। আমি সম্মানের দিকে যেতে চাই আর তুই অপমানের দিক যেতে চাস। আয়, এখন নিজেকে আমার হাতে কতল হওয়া থেকে বাঁচা।"

আযাযীর নাঙ্গা তলোয়ার শূন্যে নাচিয়ে নাচিয়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি আক্রমণ করার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। হযরত খালিদ (রা.) দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন এবং ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। আযাযীর তার নিকটেই ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তলোয়ার উঁচিয়ে আক্রমণ করলে আযাযীর স্বাচ্ছন্দে এক দিকে সরে গিয়ে সে আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। এরপর হযরত খালিদ (রা.) প্রান্ত বদল করে করে আক্রমণ করতে থাকেন কিন্তু রোমীয় সালার আযাযীর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রতিটি আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে থাকে। কিছু আক্রমণ সে তলোয়ারের মাধ্যমেই ফিরিয়ে দেয়।

ঐতিহাসিক ওকিদী তৎযুগের তথ্যসূত্রে হযরত খালিদ (রা.) এবং আযাযীরের মোকাবিলার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। আযাযীর আক্রমণ প্রতিহত করছিল শুধু; আক্রমণ করছিল না। রোমীয় বাহিনী তো আযাযীরের নৈপুণ্যে আনন্দ প্রকাশ করছিল, এমনকি মুসলমানরাও তার বীরত্বের প্রশংসা করে। হযরত খালিদ (রা.) এক সময় আক্রমণ করা বাদ দেন।

"এসো আরব সালার!" আযাযীর বলে, আমি কি তোমাকে কতল করতে পারতাম না? ... আমি তোমাকে জীবিত ধরব এবং তোমাকে এই শর্ত মানাব যে, তুমি যে দিক হতে এসেছ সেদিকে স্বীয় বাহিনী নিয়ে চলে যাবে।"

"খোদার কসম! এবার তুমি আমার হাতে জীবিত গ্রেফতার হবে" হযরত খালিদ (রা.) উত্তেজিত হয়ে বলেন এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আযাযীর দ্রুত ঘোড়া ঘুরায় এবং পালিয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) তার পশ্চাতে ঘোড়া দৌড়ান। আযাযীর ঘোড়ার গতি আরও বাড়িয়ে দেয়। উভয় বাহিনীর মাঝে ঘোড়া দৌড়াতে থাকে। এবার মুসলিম বাহিনী নারাধ্বনি দেয়। হযরত খালিদ (রা.) আযাযীরের পশ্চাতে লেগে থাকেন। আযাযীর ঘোড়ার গতি

একটু কমাত কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়া যেই তার ঘোড়ার কাছাকাছি আসত, অমনি আবার দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিত।

এভাবে ঘোড়া ছুট এবং পশ্চাদ্ধাবনে অনেক সময় কেটে যায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়া ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে এবং ঘোড়া রীতিমত ঘামতে থাকে। আযাযীরের ঘোড়া হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়ার তুলনায় উন্নত এবং অধিক শক্তিশালী ছিল। আযাযীর দেখেছিল যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আযাযীর তার ঘোড়া ঘোরায় এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর চতুর্দিকে ঘোড়ার পিঠে বসে ঘুরতে থাকে।

"এসো আরব!" আযাযীর সম্বোধন করে বলে, "তুমি ভেবেছ যে, আমি তোমার ভয়ে পালিয়ে ফিরছি। আমি তোমাকে আরও কিছু সময় জীবিত দেখতে চাচ্ছিলাম। আমি তোমার রুহ বেরকারী ফেরেশতা।"

হযরত খালিদ (রা.) দেখেন যে, তাঁর ঘোড়া রোমীয় সালার আযাযীরের ঘোড়ার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তখন তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নেমে আসেন। তাঁর হাতে তলোয়ার ছিল। আযাযীর হযরত খালিদ (রা.)-কে সহজ শিকার মনে করে তাঁর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে। হযরত খালিদ (রা.)-এর উপর আক্রমণ করে। তার আক্রমণ হতে নিজেকে বাঁচানো হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল কিন্তু তারপরও তিনি মাথা নীচু করে আযাযীরের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন।

আযাযীর ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার সামনে আসে। হযরত খালিদ (রা.) পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে থাকেন। আযাযীর আবার আক্রমণ করে। হযরত খালিদ (রা.) এবার তার আক্রমণ শুধু ব্যর্থই করেন না; বরং সাথে সাথে আযাযীরের ঘোড়ার সামনের পায়ে এমনভাবে তলোয়ার মারেন যে, ঘোড়ার একটি পা কেটে পড়ে যায় আর অপর পা চামড়ার সাথে ঝুলছিল। ফলে ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং আযাযীর ঘোড়ার সামনে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

আযাযীর মাটিতে পড়েই দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) তাকে পুরোপুরি উঠতে দেন না। তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে তাকে জাপটে ধরে এবং দুই হাত দিয়ে তাকে উঁচু করে জমিনে আছাড় দেন। আবার তাকে ধরে পূর্বের চেয়েও বেশি জোরে আছাড় দেন। পরপর দু'বার আছাড় খেয়ে আযাযীরের এই আশংকা হয় যে, হযরত খালিদ (রা.) তাকে এভাবে আছড়িয়ে প্রাণে মেরে ফেলবেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) তাকে আর আছাড় দেন না; বরং তাকে টানতে টানতে স্বীয় বাহিনীর কাছে নিয়ে যান এবং কুলূসের পাশে তাকে দাঁড় করে দেন।

"এই নাও!" হযরত খালিদ (রা.) তাকে বলেন, "তোমার বন্ধু কুলূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন যে, আযাযীরকেও বেঁধে ফেলা হোক।

একদিকে যখন আল্লাহ তা'আলা শত্রু বাহিনীর দুই সালারকে মুসলমানদের উপহার হিসেবে দান করেন, ঠিক তখন অপর দিকে এই আওয়াজ ওঠে যে, অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনী এসে গেছে। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর এই বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং শত্রুদের ব্যস্ত রেখে সময় পার করার চেষ্টা করছিলেন। এই বাহিনীর সঙ্গে ইসলামী ইতিহাসের দুই মহান সেনাপতি ছিলেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.)।

হযরত খালিদ (রা.) মুহূর্তকালীন সময় নষ্ট না করে সৈন্যদেরকে যুদ্ধবিন্যাসে সাজিয়ে ফেলেন। চার হাজার অশ্বারোহীর বিশেষ ইউনিট নিজের কমান্ডে রাখেন এবং আক্রমণ শুরু করার নির্দেশ দেন। এটাই ছিল প্রথম রণাঙ্গণ যেখানে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা শত্রুদের সমান বরং কিছু বেশিই ছিল। রোমীয়রা মোকাবিলা করলেও তা ছিল অনেকটা প্রাণহীন। যুদ্ধে স্বতস্ফুর্ততা ও আন্তরিকতা ছিল না। তারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করছিল।

তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা চূর্ণ হওয়ার একটি কারণতো এই ছিল যে, তাদের দুই সেনাপতি মুসলমানদের হাতে বন্দী এবং অন্যান্য সালাররা মল্লযুদ্ধে মারা গিয়েছিল। তবে এ ছাড়া আরেকটি কারণ এই ছিল যে, রোমীয় বাহিনীতে অন্যান্য রণাঙ্গণ হতে পালিয়ে আসা সৈন্যও ছিল। তাদের মাঝে মুসলিম ভীতি ভরপুর ছিল। তারা মুসলমানদেরকে বজ্র ও গযবের মত লড়তে এবং সাথীদেরকে তাদের তলোয়ারে কচুকাটা হতে দেখেছিল। যার ফলে রোমীয় বাহিনী মুর্দার মত লড়াই করে এবং পেছনে ভাগতে শুরু করে। তাদের কমান্ড দেয়ার মত কেউ ছিল না। ফলে অল্প সময়ে তারা রণে ভঙ্গ দেয়।

মুসলিম বাহিনী তাদের পিছু হটা রোধ করতে তাদের পশ্চাতে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পশ্চাতে ঘন বৃক্ষবিশিষ্ট উপত্যকা ছিল; যার মধ্য দিয়ে তারা সহজে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। তাদের পিঠের দিকে দামেস্ক ছিল, যা ছিল একটি কেল্লাবিশিষ্ট শহর। ১২ মাইলের দূরত্ব ছিল মাত্র। এটা রোমীয়দের জন্য একটি সৌভাগ্য ছিল যে, আশ্রয়স্থল নিকটেই ছিল। ফলে তারা এক এক করে বৃক্ষের আড়ালে আড়ালে দামেস্ক অভিমুখে পালিয়ে যাচ্ছিল।

রোমীয় বাহিনী মুসলমানদের হাতে এমনভাবে গণহত্যা হতে থাকে যে, রণাঙ্গন তাদের লাশ এবং আহতদের দ্বারা ভরে গিয়েছিল। আহতদের ধাবমান ঘোড়া দৌড়ে দৌড়ে তিলে তিলে পিষছিল। রোমীয়রা ব্যাপকভাবে পিছু হটতে

থাকলেও মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে না। কেননা হযরত খালিদ (রা.) তার সৈন্যদের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছিলেন। কারণ তারা অনেক দূর হতে সফর করে আসায় কিছুটা ক্লান্তও ছিল।

বেশ সংখ্যক রোমীয় সৈন্য পালিয়ে দামেস্ক পৌছে গিয়েছিল। কেল্লা পরিবেষ্টিত শহর তাদেরকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নেয়।

মুসলমানরা গনীমতের মাল জমা করে। মহিলারা আহতদের তুলে নিয়ে সেবা-শুশ্রুষার জন্য তাঁবুতে নিয়ে যায়। শহীদদের লাশ এক স্থানে রেখে জানাযা পড়া হয় এবং প্রত্যেক শহীদকে পৃথক পৃথক কবরে দাফন করা হয়।

হযরত খালিদ (রা.) রাত সেখানেই পার করার নির্দেশ দেন এবং সকল সালারদের ডেকে তাদের জানান যে, দামেস্ক অবরোধ সফল করার জন্য জরুরী হলো দামেস্কগামী সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া, যাতে শত্রুরা দামেস্কে থাকা সৈন্যদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করতে না পারে।

হযরত খালিদ (রা.) ফাহল কেল্লার নিকটে পূর্ব হতে একটি অশ্বারোহী ইউনিট রেখে এসেছিলেন। কারণ সেখান থেকে সাহায্য আসার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। হযরত খালিদ (রা.) অপর দু'টি অশ্বারোহী বহর দু'টি স্থানে পাঠিয়ে দেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, এসব রাস্তা দিয়ে মদদ ও রসদ আসতে চাইলে তাদের উপর আক্রমণ করবে।

৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের ২০শে আগস্ট মোতাবেক ১৩ হিজরীর ২০শে জুমাদাস সানীতে হযরত খালিদ (রা.) দামেস্ক পৌছে শহর অবরোধ করেন।

দামেস্কের অভ্যন্তরে যে সৈন্য ছিল তাদের সংখ্যা ১৬ হাজারের মত ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীতে ২০ হাজার মুজাহিদ ছিল। শহীদ ও আহত হওয়ার কারণে তাদের সংখ্যা কিছু কমে গিয়েছিল। কয়েকটি বাহিনী বিভিন্ন স্থানে রোমীয়দের মদদ রুখতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এসব কারণে মুজাহিদদের সংখ্যা কমে ২০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দামেস্ক ছিল বড় শহর। তার দরজা ছিল ছয়টি। প্রত্যেক দরজার একেকটি নাম ছিল। (১) বাবুশ শারাক (২) বাবে তুমা (৩) বাবে যাবিয়া (৪) বাবে ফারাদীস (৫) বাবে কায়সান (৬) বাবে সগীর। হযরত খালিদ (রা.) প্রত্যেকটি দরজার সামনে দু'-তিন হাজার সৈন্য দাঁড় করিয়ে দেন। প্রত্যেক দরজার জন্য একজন সালার নিযুক্ত করা হয়। (১) রাফে বিন উমাইয়া (২) আমর ইবনুল আস (রা.) (৩) শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.) (৪) হযরত আবু উবায়দা (রা.) (৫) হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর জিম্মায় দু'টি দরজা দেয়া হয়।

হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.)-কে বাছাইকৃত দুই হাজার অশ্বারোহী এই উদ্দেশ্যে দেয়া হয় যে, তারা কেল্লার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াবে এবং

রোমীয়রা বেরিয়ে কোনো বহরের উপর হামলা চালালে হযরত যাররার (রা.) তাদের মদদ যোগাবেন।

শহরের প্রাচীরে রোমীয়রা কামান এবং বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে অন্যান্য সালারসহ দামেস্ক শহর প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সালার তুমাও ছিল, যে সম্রাট হিরাকেলের জামাতা ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের বন্দী দুই সালার আযাযীর ও কুলূসকে সামনে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। উভয়কে বাঁধা অবস্থায় হাজির করা হয়। তাদেরকে প্রাচীরের এত কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখান থেকে প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন তাদের দেখতে পায়।

"তোমরা কি ইসলাম কবুল করবে?" হযরত খালিদ (রা.) উভয়ের কাছে উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

"না" উভয়ে একত্রে জবাব দেয়।

হযরত খালিদ (রা.) যাররার বিন আযওয়ার (রা.)-কে সামনে ডেকে নেন এবং বলেন, তাদের শেষ পরিণতি দেখিয়ে দাও।

হযরত যাররার (রা.) তলোয়ার কোষমুক্ত করেন এবং উভয়ের গর্দানে এক একটি কোপ দেন। উভয়ের কর্তিত মস্তক মাটিতে গিয়ে পড়ে। তাদের কম্পিত ধরও গড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ ছটফট করে চিরতরে শান্ত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে প্রাচীরের উপর হতে তীরের ঝাঁক আসে কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) ও হযরত যাররার (রা.) ততক্ষণে নিরাপদে তীরের আওতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

রোমীয়দের ইতিহাসে দামেস্ক অবরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; শুধু ঘটনা নয়, বরং একটি মহা বিপর্যয় ও দুঃখজনক অধ্যায় ছিল। ইসলামের ইতিহাসেরও এটি একটি উল্লেখযোগ্য এবং কোনো ঐতিহাসিকের জন্য বিস্ময়কর ঘটনা ছিল। এটা রোমীয়দের জন্যও বিস্ময়কর ছিল। কেননা, রোমীয় বাহিনী তৎযুগে সর্বোন্নত বাহিনী এবং অজেয় শক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। রোমীয় বাহিনী ধ্বংস এবং ত্রাসের অপর নাম ছিল। এ বাহিনী প্রতি রণাঙ্গণে বিজয় অর্জন করত। কিসরার বাহিনীও কম ছিল না। কিন্তু রোমীয়রা তাদেরকেও পরাস্ত করে ছেড়েছিল। কিন্তু সেই অজেয় বাহিনীকেই এখন অনেক দূর-দূরান্ত থেকে আসা স্বল্প সংখ্যক মুসলমানরা একের পর এক পরাস্ত করে চলছিল। জয় করতে করতে তারা দামেস্ক এসে সে শহর অবরোধ করে রেখেছিল। দামেস্ক ছিল রোমীয়দের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান শহর। রোম সম্রাট কায়সার কখনো ভাবতেও পারেন না যে, দুনিয়ার কোনো শক্তি তার উন্নত এবং শক্তিধর বাহিনীকে এই পর্যায়ে নীত করবে যে, তাদের জন্য রোমীয় ইতিহাস এবং প্রভাব-প্রতাপ সংরক্ষণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

মুসলমানদের জন্যও সিরিয়ায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ এবং দামেস্ক অবরোধ করার ঘটনা বিরাট বড় ব্যাপার ছিল। একে তো মুজাহিদদের সংখ্যা শত্রুদের তুলনায় খুবই কম ছিল। আর যারাও ছিল তাদের সংখ্যাও শহীদ ও আহত হওয়ার কারণে হ্রাস পাচ্ছিল। দ্বিতীয়ত তারা ছিল নিজ নিজ ভূখণ্ড থেকে অনেক অনেক দূরে। পিছু হটার প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের জন্য আশ্রয় লাভের কোনো স্থান ছিল না। পরাজিত হলে তাদের জন্য পানাহারেরও কোনো সুব্যবস্থা ছিল না।

বিভিন্ন এলাকার সমর বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর স্বল্প সংখ্যক সৈন্য তাদের জন্য অতি বিস্ময়কর ছিল। যদি যুদ্ধ-দক্ষতা ও সমর নৈপুণ্যের দিক বিবেচনা করা হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তালিকার শীর্ষে ছিল দু'টি বাহিনী। রোম সম্রাটের বাহিনী ও পারস্য সম্রাটের বাহিনী। এই দুই বাহিনীর সমরীয় যোগ্যতা-দক্ষতা ও নৈপুণ্য ছিল বিশ্বখ্যাত। এ কথা সত্য যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর চৌকস নেতৃত্ব, তীব্র গতি এবং রণাঙ্গণের কৌশলী চালের মোকাবেলা খুব কম সালারই করতে পারত। কিন্তু তাই বলে আকীদা-বিশ্বাসের সত্যতা এবং ভরপুর প্রেরণার বিষয়টিও বাদ দেয়ার মত ছিল না। সাধারণত বাড়ি-ঘর ও পরিবার-পরিজন থেকে এত দীর্ঘ দিনের বিচ্ছিন্নতা সিপাহীদের জযবাকে হ্রাস করে। কিন্তু মুসলমানদের মাঝে এ ধরনের মানবিক দুর্বলতা দেখা যায় না। এ অবস্থাকে সমর বিশেষজ্ঞগণ আকীদা-বিশ্বাস এবং জযবা-প্রেরণার কারিশমা ও ফল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

"আমার প্রিয় বন্ধুগণ!" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের দামেস্ক শহরের উপকণ্ঠের কোথাও বলছিলেন "ভেবে দেখ, আমরা কোথায় ছিলাম এবং এখন কোথায় আছি। তবে কী কাফেররা এখনও এক আল্লাহকে মানবে না এবং তারা এটা মানবে না যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোত্রে রেসালাত দান করেছেন, যা ধ্রুব সত্য এবং তা অস্বীকার করার কোনো দলীল নেই? ... আর তোমরা কি আল্লাহর শোকর আদায় করবে না, যিনি তোমাদেরকে একটি শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন? তাঁর রহমতের কোনো শেষ নেই, কিন্তু এর জন্য জরুরী হলো, আল্লাহর রজ্জু মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা।"

"অবশ্যই, অবশ্যই!" সম্মিলিত আওয়াজ ওঠে।

"আর হে নাঙ্গা যোদ্ধা!" হযরত খালিদ (রা.) হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.)-কে যিনি শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও জামা খুলে নাঙ্গা হয়ে যুদ্ধ করতেন তাকে উদ্দেশ করে বলেন, "খোদার কসম! তুমি যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে না রাখ, তাহলে একদিন শুধু তুমিই নও আমাদের সকলকে আফসোস করতে হবে।"

"ওলীদের পুত্র!" হযরত যাররার (রা.) বলেন, "দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কিন্তু তাই বলে এটা আমি সবসময় মাথায় রাখি যে, আপনার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালন করা আমার উপর ফরজ।"

হযরত যাররার (রা.)-এর বলার ধরন এত সুন্দর ছিল যে, সকলেই তার কথায় হেসে দেয়। হযরত খালিদ (রা.)-এর ঠোঁটে হৃদয়কাড়া মুচকি হাসি ছিল। তিনি যখন এমন হাসি হাসতেন, তা চমৎকার দেখাত।

ইন্তাকিয়া শহরে কোনো হাসি ছিল না। পরিস্থিতি ছিল থমথমে। বর্তমানে এই শহরকে রোম সম্রাট হিরাকেল তাঁর জঙ্গি হেডকোয়ার্টার বানিয়ে ছিলেন। এখানে থেকে প্রতিদিন তিনি যে খবর পাচ্ছিলেন তাতে তার অবস্থা মাদায়েনের সম্রাট উরদুশেরের মত হয়ে গিয়েছিল। বারবার পরাজয়ের খবর শুনে শুনে তিনি অর্ধমৃত হয়ে গিয়েছিলেন। একের পর এক পরাজয়ের আঘাত তাকে শয্যাশায়ী করে দিয়েছিল। তিনি শয্যায় মৃতবৎ পড়েছিলেন।

মারজে সুফরের পরাজয় হিরাকেলকে দেউলিয়া করে দিয়েছিল। এরপর তার কাছে তার সালারদের একে একে মৃত্যুবরণ করার খবর আসছিল।

"আযাযীর জীবিত" হিরাকেল বড়ই উল্লসিত কণ্ঠে বলেন, "কুলূসও আছে। ... এই দুই বাঘ আরব ডাকুদের দামেস্ক পর্যন্ত পৌঁছতে দিবে না। আমার বাঘ তাদের খেয়ে ফেলবেই।"

"মহামান্য সম্রাট!" রণাঙ্গণ হতে আগত দূত বলে "তারা দু'জন জীবিত নেই।"

"তুমি কি আমাকে এই মিথ্যা স্বীকার করে নিতে বলছ?" হিরাকেল ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলেন, "মৃত্যুর শাস্তি কত কঠোর তুমি জাননা?"

"সব কিছু জেনেই এ খবর শুনাচ্ছি মহামান্য সম্রাট" দূত বলে, "মুসলমানরা তাদের দু'জনকে জীবন্ত গ্রেফতার করেছিল। অতঃপর তাদেরকে দামেস্কের কেল্লার কাছাকাছি নিয়ে এসে এক সঙ্গে হত্যা করেছে।"

"আর আমার কন্যার স্বামীর কী খবর?" সম্রাট হিরাকেল তাঁর জামাতা সালার তুমার ব্যাপারে দূতকে জিজ্ঞাসা করেন।

"সালার তুমা দামেস্ক শহরের অভ্যন্তরে আছেন" দূত জবাবে বলে, "এবং তিনি অবরোধ ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করছেন।"

"দামেস্কের অবরোধ আমরা ভেঙ্গে ফেলব" সম্রাট হিরাকেল বলেন। হিরাকেল ইন্তাকিয়া শহরে এইজন্য প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গেড়েছিলেন যে, প্রয়োজনীয় সৈন্য প্রস্তুত করে যেখানে যেখানে মদদ লাগে সেখানে যেন পৌঁছাতে পারেন। তিনি ইতিপূর্বেই সেনাবাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করা শুরু করেছিলেন। গির্জায় গির্জায় পাদ্রীরা শুধু এই বিষয়ে বক্তৃতা করতেন যে, সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া

অতি জরুরী। তারা এভাবে মানুষদের উদ্বুদ্ধ করতেন যে, ফৌজে নাম না লিখালে খৃষ্টধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি তারা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতেন।

হযরত খালিদ (রা.) যখন দামেস্ক অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন হিরাকেল ঘোষণা করেছিলেন, যে ফৌজ তৈরী হয়েছে দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য তাদেরকে যেন আমার সামনে উপস্থিত করা হয়। ঘোষণা মতে যখন নতুন সেনাদের সম্রাটের সামনে আনা হয়, তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে এমন প্রেরণাদায়ক কথা বলেন যে, প্রত্যেক সৈন্য জযবায় টগবগিয়ে ওঠে।

"তোমাদেরকে কোনো সম্রাট হুকুম দিচ্ছে না" সম্রাট হিরাকেল বলেন, এটা আল্লাহর পুত্রের নির্দেশ যে, তার শত্রুদের ধ্বংস করে দাও। ক্রুশের স্বার্থে জীবন কুরবানী কর। আমি সম্রাট আজ তোমাদের মতই সিপাহী।"

৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩ হিজরীর ১০ রযব। এ দিনটি ছিল দামেস্ক অবরোধের এগারতম দিন। অবরোধের দশ দিন এভাবে কাটে যে, দামেস্কের কোনো না কোনো দরজা দিয়ে এক-দুই বাহিনী বের হত এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ করত। কিন্তু তারা বেশি দূর এগুতো না। সংক্ষিপ্ত ঝটিকা আক্রমণ করেই কেল্লায় ফিরে যেত। হযরত খালিদ (রা.) তখনও কেল্লার উপর কোনো ধরনের আক্রমণ করছিলেন না।

হযরত খালিদ (রা.) গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য চতুর্দিকে গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিলেন। অবরোধের এগারতম দিনে এক গোয়েন্দা এ অবস্থায় হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে আসে যে, তার ঘোড়া ছিল সম্পূর্ণ ঘামে স্নাত এবং যখন ঘোড়া থামে তখন সে রীতিমত কাঁপছিল। আরোহীর অবস্থাও ছিল অনেকটা এমন। সে ঠিক ভাবে কথা বলতে পারছিল না। হযরত খালিদ (রা.) প্রথমে তাকে পানি পান করান এরপর জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কী খবর নিয়ে এসেছে।

"রোমীয়দের একটি বাহিনী ধেয়ে আসছে" গোয়েন্দা বলে, "সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি ছাড়া কম নয়।"

"তুমি তাদের কোথায় দেখেছ?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"হিমস ছেড়ে এসেছে" গোয়েন্দা উত্তর দেয় এবং এক স্থানের নাম নিয়ে বলে, "আমাদের একটি বহর ওখানে আছে। রোমীয় সৈন্যরা আগামী কাল যে কোনো সময় সেখানে পৌঁছে যাবে। আমাদের বাহিনীর সংখ্যা শত্রুদের মোকাবেলায় খুবই কম। এই জন্য আমি কোথাও এক মুহূর্তও থামি নি। আমাদের সৈন্যরা প্রাণ হারাবে এবং রোমীয়রা দামেস্কে এসে পড়বে।"

হযরত খালিদ (রা.) গোয়েন্দাকে বিদায় দেন। তাঁর জন্য এই খবর যেমনি বিস্ময়ের ছিল না তেমনি উদ্বেগেরও ছিল না। তাঁর জানা ছিল যে, হিরাকেল

ইন্তেকিয়ায় রয়েছেন। সেখানে তিনি অবশ্যই আয়েশের মধ্যে এবং নিশ্চিন্তে বসে নেই। বরং তিনি দামেস্ক রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। গোয়েন্দা যে রোমীয় সৈন্যদের খবর এনেছিল তাদেরকে সম্রাট হিরাকেল দামেস্কের সৈন্যদের জন্য মদদ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাদের সংখ্যা লিখেছেন ১২ হাজার।

"রোমীয়দের উদ্দেশে মদদ আসবে" এই ভাবনা থেকেই হযরত খালিদ (রা.) দামেস্কগামী সকল রাস্তা বন্ধ করতে স্বল্পমাত্রার কিছু সেনাবহর বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল, মদদ আটকে দেয়া। কিন্তু এবার যে বাহিনী আসছিল তাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তৎক্ষণাৎ সালারদের ডেকে পাঠান। তারা এলে তাদের বলেন যে, অধিক সেনা বিশিষ্ট একটি ফৌজ আসছে। তাদের প্রতিরোধের জন্য প্রেরিত বহরের সংখ্যা খুবই কম।

"রোমীয়দের এই মদদ অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এবং আমাদের যে সৈন্য পথিমধ্যে রয়েছে তাদেরকে প্রাণহানী হতে বাঁচাতে হবে। এ জন্য আমাদের অবরোধ একটু শিথিল করতে হবে।"

"এই স্বল্পতা আমরা জযবা দ্বারা পূরণ করে নিব" হযরত শুরাহবীল (রা.) বলেন, "ইবনে ওলীদ! আপনি যত সৈন্য নেয়া জরুরী মনে করেন তা এখান থেকে নিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিন।"

"পাঁচ হাজার সৈন্য যথেষ্ট হবে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "রোমীয়দের সংখ্যা ১০ হাজার থেকে বেশি।"

"যথেষ্ট" হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.) বলেন, "এবং আমার বিশ্বাস যে, আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। এই পাঁচ হাজার সৈন্যের সালার আমি হব।"

"তোমার ইচ্ছায় আমি বাধ সাধব না ইবনে আযওয়ার!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তবে সতর্কতা জরুরী, যেন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে শত্রু সারিতে ঢুকে না পড়। তবে যদি এমন করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তোমাকে পেছনে থাকতে বলব না। ... আর এটাও শুনে রাখ ইবনুল আযওয়ার! যদি তুমি দেখ যে, তুমি দুশমনদের ঠেকাতে পারছ না, তাহলে তৎক্ষণাৎ মদদ চেয়ে পাঠাবে। আমি সাহায্য পাঠিয়ে দিব। সেখানে পূর্ব হতে যে বহরটি আছে, তাদেরকে নিজের অধীন করে নিবে। এই পুরো বাহিনী তোমার অধীনে থাকবে। তোমার উপসালার তুমিই বেছে নাও।"

"রাফে ইবনে উমাইয়া!" হযরত যাররার (রা.) বলেন।

"তাকে নিয়ে যাও" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আর এত দ্রুত সেখানে পৌঁছবে যেন তুমি উড়ে গিয়েছ।"

হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.)-এর ইকাব উপত্যকার নিকটবর্তী পাহাড়ী এলাকায় পাঁচ হাজার অশ্বারোহীসহ পৌঁছার কথা ছিল। স্থানটি দামেস্ক হতে প্রায় ২০ মাইলের মত দূরে ছিল। হযরত যাররার (রা.) উড়ে উড়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে ইতিপূর্বে যে সৈন্য ছিল তাদেরকেও তিনি নিজের কমান্ডে নিয়ে নেন।

এলাকাটি পাহাড়ী হওয়ায় ওঁত পাতার জন্য মোক্ষম ছিল। রোমীয় বাহিনী তখনও সেখানে পৌঁছেনি। হযরত যাররার (রা.) অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাঁর সমস্ত সৈন্যকে ঘাঁটিতে লুকিয়ে ফেলেন। এগুলো করতেই সে দিনের সূর্য ডুবে যায়। হযরত যাররার (রা.) এই নির্দেশনা দিয়ে সান্ত্রী নিযুক্ত করেন যে, তারা পাহাড় শৃঙ্গের উপর অবস্থান করবে। এদিক-ওদিক টহল দিবে না। শত্রুরা যাতে ওঁত পেতে থাকার কথা না জানে তার জন্য পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

রাত পেরিয়ে যায়। প্রভাত হয়। এর একটু পরেই শত্রু সৈন্যদের আসতে দেখা যায়। বাস্তব অর্থে তারা সৈন্যই ছিল। সৈন্যরা সুশৃঙ্খল ও অধিক সংখ্যক। এ বাহিনীতে অসংখ্য ঘোড়ার গাড়ি ছিল, যা রসদপত্রে ভরা ছিল। উটের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এ সব উট ছিল স্বাস্থ্যবান। পরে জানা যায় যে, এগুলো ছিল আহার সামগ্রী। দামেস্কের উদ্দেশে তা যাচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা.) দামেস্কের অভ্যন্তরের এই চিত্র সম্পর্কে বেখবর ছিলেন যে, রোমীয়রা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা খুব ভাল করলেও শহরে খাদ্য-সামগ্রী এত কম ছিল যে, ১০ দিনের অবরোধেই শহরবাসী প্রত্যেক বস্তুর স্বল্পতা অনুভব করছিল। সম্রাট হিরাকেল বিষয়টি জেনেছিলেন। ফলে তিনি সৈন্য পাঠাবার সাথে সাথে খাদ্যসামগ্রীর বিশাল মজুদও পাঠিয়ে দেন।

হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.)-কে জানানো হয় যে, রোমীয় বাহিনীর সঙ্গে রসদ সামগ্রীও অগণিত আসছে। তিনি এ তথ্য জেনে দারুন পুলকিত হন এবং চিরায়ত নিয়ম অনুযায়ী বর্ম, শিরস্ত্রাণ এবং জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলেন। অর্ধনগ্ন হয়ে তিনি ঘোষণা দেন যে, দারুন শিকার আসছে।

রোমীয় বাহিনী যখন পাহাড়ের কাছে এসে যায়, তখন হযরত যাররার (রা.)-এর নারাধ্বনিতে মুজাহিদ বাহিনী ঘাঁটি থেকে বের হয়ে রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাভাবিক তো এটাই ছিল যে, রোমীয়রা আকস্মিক এ হামলায় ঘাবড়ে যাবে এবং ভীত হয়ে পলায়ন করবে। কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া মোটেও তেমন ছিল না। তারা এ চাল চালে যে, আক্রমণের মুখে পিছু হটতে থাকে এবং ইকাব উপত্যকার নিকটে ঐ স্থানে গিয়ে থামে, যা সমতল ভূমি ছিল এবং পাহাড়ের উচ্চতর স্থানও ছিল। তারা বাধা পেয়ে আহার সামগ্রীর গাড়ি পেছনে পাঠিয়ে দেয় এবং পেছনের ফৌজ সামনে চলে আসে। তাদের সংখ্যা

মুসলমানদের দ্বিগুণ ছিল। তাদের ধরন-প্রকৃতি হতে স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিল যে মুসলিম বাহিনীর এ হামলা তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল না। তারা এর জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা আকস্মিক হামলা সামলে নিয়েছিল।

হযরত যাররার (রা.) দেখেন যে, রোমীয়রা তাদের হামলা শুধু সামলেই নেয়নি; বরং তারা এর পাশাপাশি সামনে থেকে এবং ডান-বাম পার্শ্ব হতেও আক্রমণ করছে। মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও কম ছিল না। কিন্তু রোমীয়রা যেভাবে সুশৃঙ্খলভাবে লড়ছে তাতে এই আশংকা দেখা দেয় যে, এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে এক সময় তারা মুসলমানদের তাড়িয়ে ও হত্যা করে সামনে অগ্রসর হবে।

হযরত খালিদ (রা.) হযরত যাররার (রা.)-কে যে ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন তিনি তাতেই জড়িয়ে পড়েন। প্রথম দিকে তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই সুশৃঙ্খলভাবে রোমীয়দের উপর আক্রমণ করাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, রোমীয়রা পিছু হটার পরিবর্তে সামনে আরও এগিয়ে আসছে, তখন হযরত যাররার (রা.)-এর শরীরে জোশ এসে যায়। তিনি কয়েকজন মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ব্যক্তিগত বাহাদুরি ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যে সৈন্য তার সামনে আসে সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে যায়। এভাবে তলোয়ার চালাতে চালাতে তিনি রোমীয় বাহিনীর অনেক ভেতরে চলে যান।

"এই তো নাঙ্গা যোদ্ধা!" জনৈক রোমীয় সৈন্য স্লোগান দেয়। এ নিশ্চয় কোনো সালার হবে। সে উচ্চকণ্ঠে বলে, "ঘেরাও করে ফেল। তাকে জীবন্ত গ্রেফতার কর।"

অর্ধনগ্ন হয়ে যুদ্ধ করা এবং শত্রু বাহিনীকে প্রত্যেক রণাঙ্গণে অবিশ্বাস্য ক্ষতি সাধন করার ক্ষেত্রে এমন প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন যে, ইন্তেকিয়া পর্যন্ত তাঁর বীরত্বের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছিল। রোমীয়রা তাই সহজেই তাকে চিনে ফেলে। হযরত যাররার (রা.)-এর ডান বাহুতে একটি তীর লেগেছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত যাররার (রা.)-এর দেহে আরও দু'টি জখম ছিল। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তাঁর বাহুতে একটি তীর লেগেছিল। হযরত যাররার (রা.) তীর বাহু থেকে টেনে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তীর বের করা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। তীরের সঙ্গে গোশতও বেরিয়ে আসে। কিন্তু হযরত যাররার (রা.) নবী প্রেমিক ছিলেন। স্বীয় জান ও শরীরের কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে তীর তলোয়ার তাকে বিপর্যস্ত করার মত ছিল না। রোমীয়দের নিক্ষিপ্ত তীর তিনি শরীর থেকে এভাবে টেনে বের করেন যেন একটি কাটা তুলে আনেন। ডান হাতে আঘাত খেয়েও তিনি শক্ত হাতে তলোয়ার ধরে রাখেন এবং রোমীয়দের কচুকাটা কাটতে থাকেন।

রোমীয়রা তাকে জিন্দা গ্রেফতার করার বন্দোবস্ত করেছিল। তারা হযরত যাররার (রা.)-এর সঙ্গে থাকা মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত করে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং হযরত যাররার (রা.)-কে একাকী ঘেরাও করে ফেলে। এ সময়ে তিনি আরও এক বা একাধিক জখমের শিকার হন। পরিশেষে কয়েকজন রোমীয় মিলে তাকে ধরে বেঁধে ফেলে। তাকে ধরে রোমীয়রা চিৎকার করে বলতে থাকে–

"মুসলমানরা! তোমাদের সালার আমাদের হাতে বন্দী হয়ে গিয়েছেন।"

"আমরা তোমাদের নাঙ্গা সালারকে ধরে ফেলেছি।"

"তাকে নিয়ে গিয়ে রোম সম্রাট হিরাকেলকে হাদিয়া দিব।"

রোমীয়দের ধ্বনি থেকে থেকে ক্রমেই উচ্চকিত হচ্ছিল। তারা সঠিক কথাই বলছিল। সম্রাট হিরাকেলের নিকট হযরত যাররার (রা.)-এর তুলনায় অধিক মূল্যবান হাদিয়া আর কিছু ছিল না। রোমীয়রা তাকে বেঁধে পেছনে নিয়ে যায়। তার আহত স্থান থেকে তীব্র গতিতে রক্ত পড়ছিল, যার দ্বারা এই শঙ্কা জাগে যে, হিরাকেলের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি জিন্দা থাকবেন না। এই ভেবে রোমীয়রা তার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। এতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে তার জীবন মৃত্যুর শঙ্কা থেকে রক্ষা পায়।

তৎযুগে কোনো ফৌজ এভাবেও পরাজিত হত যে, যখন তাদের সেনাপতি মারা যেত আর ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত হত, তখন সৈন্যরা এক এক করে পালিয়ে যেত। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। রোমীয়দের মুখ হতে হযরত যাররার (রা.)-এর গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ শুনে মুসলিম বাহিনী হতবল হওয়ার পরিবর্তে তারা হামলার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। তারা এবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং বিজলির রূপ ধারণ করে।

হযরত রাফে বিন উমাইয়া হযরত যাররার (রা.)-এর উপসেনাপতি ছিলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দেন যে, এখন থেকে তিনিই সেনাপতি। তিনি কমান্ড হাতে নিয়ে সামনের থেকে রোমীয়দের উপর আক্রমণ করান। নিজেও আক্রমণে নেতৃত্ব দেন এবং শত্রুসারি ভেদ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু রোমীয়দের সারি মজবুত প্রাচীরে পরিণত হয়েছিল। সালার রাফে হযরত যাররার (রা.)-কে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু তার চেষ্টা সফল হচ্ছিল না।

মুসলিম বাহিনী তাদের সালারকে দুশমনদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য জীবনবাজি লাগাচ্ছিল।

✪✪✪

দ্বিপ্রহরের কিছু পর। হযরত খালিদ (রা.) দামেস্ক কেল্লার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন যে, পাঁচিল কোথাও হতে ভাঙ্গা যায় কিনা। দু'জন সালার তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

"খোদার কসম! দামেস্ক আমাদের" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "রোমীয়রা অতিরিক্ত সাহায্য পবে না। হযরত যাররার এবং রাফে এতক্ষণে রোমীয় সাহায্যকারী বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

হযরত খালিদ (রা.) কথাটি বলে দম নেন। ইত্যবসরে এক অশ্বারোহীকে তার দিকে দ্রুত আসতে দেখেন।

"মনে হচ্ছে দূত এসেছে" হযরত খালিদ (রা.) এ কথা বলে ঘোড়া হাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে যান।

"মহান সেনাপতি!" অশ্বারোহী ঘোড়া তার নিকটে থামিয়ে বলেন, "রোমীয়রা হযরত যাররার (রা.)-কে বন্দী করে ফেলেছে। এখন ইবনে উমাইয়া তার স্থানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি ইবনুল আযওয়ারকে মুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু রোমীয়দের সংখ্যা এত বেশি যে, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। ইবনে উমাইয়া আমাকে এ বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, মদদ ব্যতীত আমরা তাদের গতিরোধ করতে পারব না।"

"আমি কি তাকে বলেছিলাম না যে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে?" হযরত খালিদ (রা.) রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, "রোমীয়রা আমাদের এত মূল্যবান সালারকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

হযরত খালিদ (রা.) সকল সালারদের ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে হযরত যাররার (রা.)-এর গ্রেফতার ও রোমীয়দের মোকাবেলায় মুসলমানদের দুর্বলতার কথা ব্যক্ত করেন।

"আমি নিজে ইবনে উমাইয়ার সাহায্যে যেতে চাই" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "কিন্তু অবরোধ দুর্বল হয়ে যাবে। রোমীয়রা বাইরে বেরিয়ে এসে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। আমাদের সৈন্য পূর্ব হতেই কম। আমি যদি না যাই এবং মদদ না পাঠাই তাহলে আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্য মারা যাবে এবং রোমীয় বাহিনী সোজা এখানে এসে তোমাদের উপর চড়াও হবে। বল, এখন আমার করণীয় কী?"

"রাফেকে সাহায্য করা এবং রোমীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করা বেশি জরুরী" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "ইবনে ওলীদ! যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার যাওয়া জরুরী, তাহলে এখনই চলে যান এবং দামেস্ক অবরোধকে আল্লাহর হাওলায় ছেড়ে দিন। রোমীয়রা পারলে বাহিরে এসে হামলা করুক, তারা জীবিত ফিরে যাবে না।"

অন্যান্য সালারগণ হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কথা সমর্থন করে হযরত খালিদ (রা.)-কে আশ্বস্ত করেন যে, তাদের সৈন্য সংখ্যা কম হয়ে গেলেও তারা অবরোধ ভাঙ্গতে বা শিথিল হতে দিবে না।

"আমার যদি যেতেই হয় তাহলে আমি এখনই যাব না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমি এমন সময় এখান থেকে অশ্বারোহীদের নিয়ে যাব, যখন শত্রুরা আমাদের দেখতে পাবেনা। ... আবু উবায়দা! আপনি আমার স্থলে নেতৃত্ব দিবেন। আমি অর্ধ রাতের পর চার হাজার অশ্বারোহী নিয়ে বেরিয়ে যাব। তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রহম হোক। আল্লাহ তোমাদের সহায়ক ও সাহায্যকারী হোক। চার হাজার অশ্বারোহীকে প্রস্তুত অবস্থায় পৃথক করে দাও এবং তাদের জানিয়ে দাও যে, মধ্য রাতে রওনা হতে হবে।"

✪✪✪

দামেস্ক থেকে ইকাব উপত্যকা বিশ মাইলের মত ছিল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে রোমীয় ও মুসলমানদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত থাকে। রাফে বিন উমাইয়া সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরও মুজাহিদদের রোমীয়দের পশ্চাতে পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়ে হযরত যাররার (রা.)-কে মুক্ত করতে পাঠান। কিন্তু প্রত্যেক দল ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

"সময় যতই বাড়ছে যাররার বিন আযওয়ারের মৃত্যু ততই নিকটবর্তী হচ্ছে" রাফে কয়েকবার কথাটি বলেন, "আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন জীবিত থাকেন। আল্লাহ তাকে জীবিত রাখেন। আমরা অবশ্যই তাকে মুক্ত করে আনব।"

রাত পেরিয়ে যায়। প্রভাত রবি তখনও ভালমত উঠেনি ইতিমধ্যে হযরত খালিদ (রা.) চার হাজার সৈন্য নিয়ে রাফে এর কাছে পৌঁছে যান। হযরত খালিদ (রা.) মধ্য রাতের অনেক পরে দামেস্ক থেকে যাত্রা করেছিলেন। তিনি চার হাজার সৈন্যকে সন্ধ্যার পরে নীরবে অবরোধস্থল থেকে সরিয়ে পেছনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অশ্বারোহীরা পেছনে গিয়ে এক স্থানে সমবেত হচ্ছিল। এটি ছিল দামেস্ক হতে একটু দূরে। হযরত খালিদ (রা.) তাদের সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে যান কিন্তু শহরে অবরুদ্ধ রোমীয়রা এর কিছুই টের পায় না।

হযরত খালিদ (রা.) এবং তার বাহিনীকে দেখে রাফে এবং তার বাহিনী শ্লোগান দিতে শুরু করে। হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত শত্রুপক্ষ এবং রাফে এর বাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন। উভয় বাহিনীকে প্রয়োজন হিসেবে বিন্যস্ত করে হামলা করার নির্দেশ দেন।

হামলা তখনও শুরু হয়নি ইতিমধ্যেই এক অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনীর সামনে দিয়ে অগ্রসর হয় এবং ঘোড়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়ে হযরত খালিদ (রা.)-কেও পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যায়। তার এক হাতে তলোয়ার ও অপর হাতে বর্শা ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তার প্রতি রুষ্ট হন এবং উচ্চস্বরে তাকে ডাক দেন। কিন্তু সে ইতিমধ্যে রোমীয়দের প্রথম সারিতে পৌঁছে গিয়েছিল। দৈহিক দিক দিয়ে এ অশ্বারোহী মোটাতাজা ছিল না। তার মাথায় সবুজ রংয়ের পাগড়ী ছিল। যোদ্ধাটি মুখে কাপড় বেঁধে চেহারা ঢেকে রেখেছিল। তার চোখ দু'টি দেখা যাচ্ছিল শুধু।

"ইনি খালিদ" রাফে বিন উমাইয়া বলেন, "এমন বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা খালিদ ব্যতীত কেউ প্রদর্শন করতে পারে না।"

রাফে এক প্রান্তে ছিলেন, যেখান থেকে হযরত খালিদ (রা.)-কে দেখা যাচ্ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) হামলা করা বাদ দিয়ে রাফে এর কাছে চলে যান। রাফে তাকে দেখে হতবাক হয়ে যান।

"ইবনে ওলীদ!" রাফে হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, "রোমীয়দের উপর যিনি একাকী ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি যদি আপনি না হন তাহলে আর কে?"

"আমি এটাই তোমার কাছে জানতে এসেছি" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, আমি ইবনুল আযওয়ারকে এমন আচরণ থেকে নিষেধ করেছিলাম।"

"ঐ দেখুন ইবনে ওলীদ!" রাফে বলেন, "সে যেই হোক একটু দেখুন।"

আগন্তুক যেই হোক না কেন সে মুসলমানদের এবং রোমীয়দেরকেও হতবাক করছিল। যে রোমীয় তার সামনে আসছিল সে তার তলোয়ার বা বর্শার শিকার হচ্ছিল। এই অশ্বারোহী কোথাও থামছিল না। তার এক হাতে তলোয়ার ও অপর হাতে বর্শা থাকা সত্ত্বেও সে ঘোড়াকে ঠিকই তার কাবুতে রেখেছিল। এক রোমীয়কে ধরাশায়ী করে সে দূরে চলে যাচ্ছিল। কেউ তার পশ্চাদ্ধাবনে গেলে এই আজব যোদ্ধা তার ঘোড়া থামিয়ে কিংবা ঘুরিয়ে পশ্চাদ্ধাবনকারীকে খতম করছিল।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে হযরত খালিদ (রা.)-এর অবস্থাও শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে গিয়েছিল। একবার সে দুই রোমীয়কে ধরাশায়ী করে প্রান্ত বদল করতে ঘোড়া ছুটিয়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছ ঘেঁষে অতিবাহিত হয়। হযরত খালিদ (রা.) জোর আওয়াজে তাকে থামতে বলেন কিন্তু অশ্বারোহী থামে না। মানুষ শুধু তার দু'টি চোখ দেখতে পাচ্ছিল। সে চোখে অন্য রকম চমক ছিল। বরং তার চোখে কিছুটা আকর্ষণও ছিল। তার তলোয়ার এবং বর্শার অগ্রভাগ রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। সে আবার রোমীয়দের দিকে যাচ্ছিল।

✪✪✪

"ইবনে ওলীদ!" রাফে রাগতস্বরে বলেন, "আপনি হামলা করার নির্দেশ কেন দিচ্ছেন না? খোদার কসম! এই যুদ্ধ ঐ অশ্বারোহীর একার নয়।"

মুজাহিদ বাহিনী ঐ অশ্বারোহীর বিস্ময়কর বীরত্ব দেখে জোশে ফেটে পড়ছিল এবং তারাও হামলা করার আহ্বান জানাচ্ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) হামলা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

এবার মুজাহিদরা যে হামলা করে তা এমন প্রলয়ঙ্করী প্লাবনের মত ছিল, যা বাঁধ ভেঙ্গে আসে। ঐ আত্মগোপনকারী অশ্বারোহী পুরো বাহিনীর রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মুজাহিদ বাহিনী হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশিত বিন্যাসে হামলা করে। কিন্তু ঐ অচেনা অশ্বারোহী স্বীয় বাহিনী হতে ভিন্ন এক নিজস্ব ও স্বতন্ত্র পন্থায় লড়ে চলেছিল। হযরত খালিদ (রা.) তার পর্যন্ত পৌঁছতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সে অশ্বারোহী পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল অথবা আত্মহত্যার পন্থায় লড়ছিল।

ঐ অশ্বারোহী দ্বিতীয় বারের মত হযরত খালিদ (রা.)-এর পার্শ্ব অতিক্রম করে।

"থাম, হে জীবন নিয়ে খেলনেওয়ালা!" হযরত খালিদ (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন, "তুমি কে?"

অচেনা অশ্বারোহী ঘোড়ার গতি একটু শ্লথ করে। সে হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি তাকায়। কাপড়ের নেকাবের তলদেশ দিয়ে তার অগ্নিঝরা চোখ দেখা যায়। সে কোনো কথার জবাব না দিয়ে ঘোড়া হাকিয়ে দেয়। হযরত খালিদ (রা.) তার দুই মুহাফিজকে বলেন যে, তাকে ঘেরাও করে নিয়ে আস অন্যথায় সে মারা যাবে। দেখ, সে ক্লান্তও হয়ে পড়েছে। উভয় মুহাফিজ ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং তাকে ঘেরাও করে ফেলে।

"তুমি কি শুনছ না যে, মহান সেনাপতি তোমাকে বারবার ডাকছেন?" এক মুহাফিজ তাকে বলে।

অশ্বারোহী চুপচাপ মুহাফিজকে দেখতে থাকে।

"মহান সেনাপতি তোমার উপর রুষ্ট নন" অপর মুহাফিজ বলে, "এস এবং তার থেকে অভিনন্দন লাভ কর।"

অশ্বারোহী আবার স্বীয় ঘোড়া দুশমনমুখী করে। কিন্তু সে তার ঘোড়া হাকানোর পূর্বেই এক মুহাফিজ তার ঘোড়া অশ্বারোহীর সামনে এনে দাঁড় করায়। অপর মুহাফিজ তার লাগাম ধরে ফেলে। আজব ব্যাপার যে আরোহী কোনো কথা বলে না এবং নেকাবের ওপাশ থেকে শুধু তার চোখটি দেখা যাচ্ছিল। এটা সাধারণ কোনো চোখ ছিল না।

মুহাফিজ আজব আরোহীকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং সোজা তাকে হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আরোহী তার তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা এত রোমীয়দের খতম করেছিল যে, উভয় অস্ত্র সম্পূর্ণ লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তা হতে রক্ত টপটপ করে পড়ছিল। রক্ত আরোহীর অস্ত্র ধরা হাত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং তার কাপড়েও রক্তের ছিটা লেগেছিল। হযরত খালিদ (রা.) তার চোখে গভীর দৃষ্টি ফেললে আরোহী চোখ নামিয়ে নেয়।

"চোখ দেখে তো মনে হচ্ছে নবযুবক" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তুমি স্বীয় বীরত্বের ছাপ আমার অন্তরে অঙ্কন করে দিয়েছ। তোমার যথার্থ মূল্যায়ন আমি ছাড়া কেউ করতে পারবে না। খোদার কসম! আমি তোমার চেহারা দেখব এবং বল যে, তুমি কে?"

"আপনি আমার আমীর এবং সালার" আরোহী বলে, "এবং আপনি আমার জন্য পরপুরুষ। আমি আপনার সামনে আমার চেহারা কীভাবে খুলব? যাকে আপনি বীরত্ব বলছেন তা এমন আগুন এবং ক্রোধ, যা নিয়ন্ত্রণ করা আমার সাধ্যের বাইরে।"

"তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক" হযরত খালিদ (রা.) আরোহীর কথা শুনে বলেন, "তুমি কার কন্যা? কার বোন তুমি?"

"আমি আল-আযওয়ারের মেয়ে খাওলা।"

"যাররার বিন আযওয়ারের বোন!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

"খোদার কসম!" খাওলা বিনতে আযওয়ার বলে, "আমি আমার ভাইকে রোমীয়দের হাত থেকে মুক্ত করে তবেই ছাড়ব।"

"খোশনসীব আল-আযওয়ারের, যার ঘরে যাররারের মত পুত্র এবং খাওলার মত কন্যার জন্ম হয়েছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এই যুদ্ধ তোমার একার নয় আযওয়ার কন্যা! আমাদের সঙ্গে থাক এবং দেখ যে, আমরা তোমার ভাইকে কীভাবে মুক্ত করে আনি।"

সে যুগে মহিলারাও তাদের স্বামী ও ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধে আসত। খাওলা তার ভাই হযরত যাররার (রা.)-এর সঙ্গে এসেছিল। তিনি কীভাবে যেন জানতে পারেন যে, তার ভাইকে রোমীয়রা বন্দী করে ফেলেছে; তখন তিনি যুদ্ধকে ব্যক্তিগত যুদ্ধ মনে করেন। সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.)-এর পরোয়া করেন না এবং একাই রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মহিলা এবং শিশুরা দামেস্ক রণাঙ্গনে ছিলেন। খাওলা সেখান থেকে হযরত খালিদ (রা.)-এর চার হাজার অশ্বারোহীর পেছনে পেছনে চলে এসেছিল। যখন রোমীয় ও মুসলমানরা মুখোমুখি হওয়ার উপক্রম হয় তখন খাওলা ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং সোজা গিয়ে একাই রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

খাওলা এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা মুজাহিদ বাহিনীকে নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা জোগায়।

✪✪✪

এবার মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল আর নেতৃত্বে ছিলেন খোদ খালিদ (রা.)। হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে যে চার হাজার মুজাহিদ গিয়েছিলেন তারা ছিলেন সম্পূর্ণ তাজাদম ও চাঙ্গা। এ ছাড়া হযরত যাররার (রা.)-এর গ্রেফতারের সংবাদে প্রত্যেক সৈন্য ক্ষেভে ফুঁসছিল। রোমীয়দের পক্ষে এ হামলা বরদাশত করা অসম্ভব হয়ে যায়। তারা দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টা করে কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর সমরচাল ও তাঁর বাহিনীর ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধমূর্তির সামনে রোমীয়রা টিকতে পারে না। রোমীয়রা যেহেতু সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত সৈন্য ছিল, তাই তাদের পিছু হটাও ছিল সুবিন্যস্ত। তাদের পিছু হটাতে হযরত খালিদ (রা.)-এর অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। রোমীয়দের পিছু হটার দ্বারা একটি লাভ এই হয় যে, দামেস্কের প্রতিরোধ বাহিনী মদদ ও রসদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। রোমীয়দের বৈশিষ্ট্য বলতে হয় যে, তারা পিছু হটার সময় সাথে থাকা রসদ সামগ্রীও নিয়ে যেতে থাকে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তখনও অপূর্ণ ছিল, আর তা হলো, হযরত যাররার (রা.)-এর মুক্তি। এই উদ্দেশ্যে হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখেন। এতে করে রোমীয়রা আরও দ্রুত পিছপা হতে থাকে। হযরত খালিদ সর্বমুখী প্রচেষ্টা চালান কিন্তু রোমীয়রা তার কোনো চেষ্টা সফল হতে দেয় না। হযরত খালিদ (রা.) পশ্চাদ্ধাবনের গতি কমান না। তাঁর চেষ্টা ছিল, রোমীয়রা যেন কোথাও থামতে না পারে। হযরত খালিদ (রা.) নিজে রণাঙ্গণে অবস্থান করেন।

এটা ছিল বোনের দরদ যা আল্লাহ কবুল করেন এবং আরও ছিল হযরত যাররার (রা.)-এর ইশকে রসূল, যা আল্লাহর খুব ভাল লাগে। হযরত যাররার (রা.)-এর আত্মত্যাগ ও জীবনবাজি আল্লাহ পাক এড়িয়ে যান না। জানা যায় যে, হযরত যাররার (রা.) রোমীয়দের হাতে জীবিত অবস্থায় বন্দী আছেন। এই খবর দেয় দুই আরব, যারা ঐ এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর কয়েকজন গোয়েন্দা ছোট্ট একটি বস্তির পাশ দিয়ে গমনকালে সেখানে যাত্রাবিরতি করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পানি পান করা। বস্তির লোকেরা এ কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তারা বিজয়ী বাহিনীর সৈন্য, ফলে তারা লুটতরাজ করবে এবং যুবতী মেয়েদের প্রতি হাত বাড়াবে। সৈন্য আসায় বস্তিতে হৈ চৈ পড়ে যায়। দুই ব্যক্তি সাহস করে সৈন্যদের কাছে আসে।

"আমরাও আরবের বাসিন্দা" তারা সৈন্যদের বলে, "আমরা মুসলমান না হলেও আরবের মাটির দোহাই দিয়ে বলছি যে, আমাদের দিকে তাকিয়ে এই বস্তির ক্ষতি করবেন না।"

"তোমরা না বললেও আমরা এ বস্তির প্রতি চোখ তুলে তাকাতাম না" এক মুসলমান আরোহী বলে, "আপনাদের লোকজনদের বলুন, তারা যেন আমাদের কারণে ভীত না হয়। আমরা তোমাদের সকলের মুহাফিজ। আমরা পানি পান করে চলে যাব।"

দুই আরব বস্তির লোকদের অভয় দিয়ে বলে যে, সৈন্যদের কারণে তোমরা ভীত হয়ো না। সবাই নিজ নিজ ঘরে থাক। বস্তির লোকজন গোয়েন্দাদেরকে এবং তাদের ঘোড়াদেরকে পানি পান করায় এবং এ সময় ফাঁকে ফাঁকে তারা আলাপ করছিল। কথায় কথায় ঐ বস্তির লোক দু'জন জানায় যে, রোমীয়রা একটি ঘোড়ায় এক রোমীয়কে বেঁধে রেখেছিল। তার মাথা ছিল খোলা, তার শরীরে পোশাকও ছিল না। তার এক বাহুতে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল।

"তারা তাকে এখানে পানি পান করানোর জন্য থামিয়েছিল" এক আরব বলে, "তাকে তোমাদের সাথী বলে মনে হচ্ছে।"

মুসলিম আরোহীদের কোনো সন্দেহ থাকে না যে, বন্দী লোকটিই হযরত যাররার (রা.)। তারা আরব দু'জন থেকে আরও বিস্তারিত তথ্য জেনে নেয়। হযরত যাররার (রা.)-এর সঙ্গে প্রায় একশত রোমীয় ছিল। তারা রোমীয়দের পিছু হটার অনেক পূর্বেই সেখান থেকে রওনা দিয়েছিল এবং তারা হিমসের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

মুসলিম গোয়েন্দারা তাদের এক সাথীকে বলে যে, শীঘ্র রণাঙ্গনে গিয়ে সেনাপতিকে হযরত যাররার (রা.) সম্পর্কে এই তথ্য দিয়ে এস।

✪✪✪

"আলহামদু লিল্লাহ!" হযরত খালিদ (রা.) এই খবর শুনে বলেন, "যাররার জীবিত আছেন এবং তিনি যিন্দা থাকবেন। তারা তাকে কতল করতে চাইলে অনেক আগেই করত। তারা তাকে তাদের সম্রাটের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। ... ইবনে উমাইয়াকে ডাক।"

রাফে ইবনে উমাইয়া আসেন। হযরত খালিদ (রা.) তাকে যাররার (রা.) সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য জানান। পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে বলেন, তিনি যেন একশত জানবাজ যোদ্ধা নির্বাচন করেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হিমস অভিমুখী এমন রাস্তা ধরেন, যে রাস্তায় গেলে যাররার (রা.) পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। উদ্দেশ্য ছিল এটা বলা যে, সংক্ষিপ্ত রাস্তায় হিমস অভিমুখে গিয়ে রোমীয়দের গতিরোধ কর এবং ইবনুল আযওয়ারকে মুক্ত করে আন।

রাফে যখন ১০০ অশ্বারোহী নির্বাচন করছিলেন, তখন বিষয়টি হযরত যাররার (রা.)-এর বোন কীভাবে যেন জানতে পারেন যে, রাফে যাররার (রা.)-কে মুক্ত করার জন্য যাচ্ছেন। তিনি দৌড়ে রাফে এর কাছে যান এবং তাকে গিয়ে বলেন যে, তিনিও তাদের সঙ্গে যাবেন।

"না বিনতুল আযওয়ার!" রাফে বলেন, "খোদার কসম! যে কাজ আমাদের তা আমরা এক মহিলার দ্বারা করাতে পারি না। তুমি তো তোমার ভাই চাও, ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবে। না পেলে আমরাও ফিরে আসব না।"

"আমি সেনাপতি হতে অনুমতি নিব?"

"ইবনে ওলীদ তোমাকে অনুমতি দিবেন না আযওয়ারের কন্যা!" রাফে বলেন।

খাওলা (রা.) নিরাশ হয়ে যান।

রাফে ১০০ নির্বাচিত শাহসওয়ার নিয়ে দ্রুত বেগে বেরিয়ে পড়েন। তারা হিমসমুখী রাস্তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ছিলেন। তারা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। তারা তখনো বেশি দূর যাননি ইতিমধ্যে একদিক হতে একটি ঘোড়া দ্রুত ছুটে আসছিল। অশ্বারোহী রোমীয় হলে একাকী হত না। সে হযরত খালিদ (রা.)-এর দূত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হতে পারে সে কোনো নতুন নির্দেশ এনেছে। অশ্বারোহী নিকটে এলে তার মাথায় সবুজ পাগড়ী এবং চেহারা নেকাবে ঢাকা ছিল।

"ইবনে উমাইয়া!" অশ্বারোহী উচ্চকণ্ঠে বলে, "আমার ভাইকে মুক্ত করতে আমি চলে এসেছি"।

"সেনাপতি তোমাকে আসার অনুমতি দিয়েছেন!" রাফে জিজ্ঞাসা করেন।

"আমার ভাইকে মুক্ত করার জন্য আমার কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই" খাওলা বিনতে আযওয়ার বলেন, "যদি আপনি স্বীয় বাহিনীর সঙ্গে আমাকে যেতে না দেন, তাহলে আমি একাই যাব।"

"খোদার কসম, বিনতুল আযওয়ার!" রাফে বলেন, "আমি তোমাকে একাকী রাখব না। এসো, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চল"।

যাররার (রা.)-এর বোন তাদের সঙ্গে চলতে থাকে।

✪✪✪

একশত রোমীয় সৈন্য হযরত যাররার (রা.)-কে ঘোড়ার উপর বসিয়ে এভাবে নিয়ে যাচ্ছিল যে, তাঁর হাত রশি দ্বারা বাঁধা ছিল এবং ঘোড়ার পেটের সঙ্গে পেঁচিয়ে তার দুই পা বাঁধা ছিল। রোমীয়রা তার সঙ্গে উপহাস করতে করতে যাচ্ছিল। হযরত যাররার (রা.) সকল গ্লানি ও তিরস্কার মুখ বুজে শুনে যাচ্ছিলেন।

পথিমধ্যে একটি স্থান ছিল সবুজ-শ্যামল। তার ডান-বাম পাশের এলাকা ছিল উঁচু-নীচু। যখন রোমীয়রা ঐ সবুজ-শ্যামল এলাকায় প্রবেশ করে তখন ডান-বাম ও আগে-পিছে হতে রাফে এর বাহিনী তাদের উপর অতর্কিতভাবে চড়াও হয়। রোমীয়দের জন্য এ হামলা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তারা এভাবে যাচ্ছিল, যেন মেলায় যাচ্ছে।

হযরত যাররার (রা.)-এর বোন খাওলা তার ভাইকে দেখে রোমীয়দের উপর এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যেভাবে তিনি পুরো রোমীয় বাহিনীর উপর ইতিপূর্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রাফেও ছিলেন প্রেরণাদীপ্ত। তার বাহিনী ছিল বাছাইকৃত। তারা রোমীয়দের অবস্থা এত কাহিল করে দেয় যে, তাদের মধ্যে যারা মরেনি অথবা আহত হয়নি তারা জীবন রক্ষার্থে পালিয়ে যায়।

আশংকা ছিল যে, রোমীয়রা হযরত যাররার (রা.)-কে হারানোর পরিবর্তে হত্যা করে ফেলবে। তার বোন খাওলা তলোয়ার এবং বর্শা চালিয়ে হযরত যাররার (রা.) পর্যন্ত পৌঁছে যান। রোমীয়রা তার চেষ্টা সফল হতে দেয় না। কিন্তু রাফে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করেন যে, রোমীয় সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এরপর তারা এক এক করে পলায়ন করে। হযরত যাররার (রা.) সর্বপ্রথম রাফে এর সঙ্গে হাত মিলান। এরপরে যখন সে বোনের মুখোমুখি হয় তখন সেখানে এক বেদনাবিধুর ও আবেগঘন অবস্থা সৃষ্টি হয়। বোন ভাইয়ের ক্ষতস্থান দেখার জন্য অস্থির ছিল।

এক ঐতিহাসিক খাওলার এই শব্দ লিখেছেন "আমার প্রিয় ভাইজান! আমার দিলের অস্থিরতা দেখুন, আপনার বিচ্ছেদে তা কেমন হু হু করে জ্বলছে।"

"আপনার আহত স্থান দেখান ভাইজান!" বোনের আকুতি ঝরে পড়ে।

"খাওলা! এ ক্ষত দেখতে চেওনা" হযরত যাররার (রা.) তার বোনকে বলেন, "আর তা আমাকেও দেখতে দিও না। এখন ক্ষতস্থান দেখার সময় নয়।" হযরত যাররার (রা.) রাফে এবং তার অশ্বারোহীদের বলেন, "চল, বন্ধুগণ! রোমীয়রা কোথায়? দামেস্কের অবরোধের খবর কী?"

রোমীয়রা লড়ছিল আবার পিছুও হটছিল। এটা ছিল তাদের সুশৃঙ্খলতা এবং দুঃসাহসিকতাও যে, তারা পালিয়ে যাচ্ছিল না। তারা পিছু হটতে হটতে এমন এক স্থানে আসে যার দু'দিকে বিস্তীর্ণ পাথুরে এলাকা এবং কিছু উঁচু উঁচু টিবি ছিল। এখানে এসে রোমীয়দের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে হয়। হযরত খালিদ (রা.) তার দু'পার্শ্ব বাহিনীর সালারদের বলেন, তারা যেন বিস্তীর্ণ প্রান্তরের অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং দ্রুততার সঙ্গে রোমীয়দের পেছন দিকে চলে যায়। রোমীয়রা দেখতে পাচ্ছিল না যে, উঁচু প্রান্তরের ওপাশ হতে তাদের প্রতি বিপদ

ধেয়ে আসছে। হযরত খালিদ (রা.) পশ্চাদ্ধাবনের গতি কমিয়ে দেন। এতে রোমীয়রা বুঝে যে, মনে হয় মুসলমানরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারা পিছু টান থামিয়ে দেয়। হযরত খালিদ (রা.)ও তার বাহিনীকে থামিয়ে দেন।

কিন্তু একটু পরেই পশ্চাৎ হতে রোমীয়দের উপর আসমান ভেঙ্গে পড়ে। এ সময় সামনে হতেও হযরত খালিদ (রা.) জোরদার হামলা চালান। দ্বিমুখী আক্রমণে রোমীয়দের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তারা আত্মরক্ষার্থে ঘোড়াকে উঁচু প্রান্তরে এবং টিলার উপরে নিয়ে যায় এবং অপর দিক দিয়ে নেমে পালিয়ে যেতে থাকে। স্বাভাবিক এটাই ছিল যে, রোমীয়রা তাদের সঙ্গে যে রসদ সামগ্রী এনেছিল তা মুসলমানদের হস্তগত হবে। কিন্তু রোমীয়রা ঘোড়ার গাড়ি এবং উটসমূহ পূর্বেই হিমস পানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

হিমস অভিমুখী সড়কে রোমীয়দের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল। আহতরা ছটফট করছিল ও কাতরাচ্ছিল। তাদের আরোহী শূন্য ঘোড়া লাগামহীনভাবে ঘুরছিল। সেনাপতির পক্ষ হতে নির্দেশ পেয়েই মুজাহিদরা শহীদ সঙ্গীদের লাশ এবং আহতদের তোলা শুরু করে। মৃত রোমীয়দের হাতিয়ার জমা করা এবং তাদের ঘোড়া নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করে।

"হায়! যদি আমার পেছনে দামেস্ক না থাকত" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তাহলে আমি শত্রুদের একজনকেও হিমসে ফিরতে দিতাম না।"

হযরত খালিদ (রা.) পশ্চাদ্ধাবন ছেড়ে দেন। কিন্তু রোমীয়রা কোথাও থেমে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিংবা হিমস হতে মদদ তলব করে ফিরে আসতে পারে এই চিন্তায় সিমত বিন আসওয়াদ নামীয় এক সালারকে ডেকে পাঠান।

"এক হাজার অশ্বারোহী নাও এবং রোমীয়দের পশ্চাদ্ধাবন কর।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তাদের কোথাও সমবেত হতে দিবে না। কাউকে যুদ্ধবন্দী বানাবে না। যে-ই সামনে আসবে হত্যা করে ফেলবে। এখনি রওনা হও।"

"ওলীদের পুত্র!" হযরত খালিদ (রা.) কারো সম্বোধন শুনেন।

"আমার নাঙ্গা যোদ্ধা এসে গেছে!" হযরত খালিদ (রা.) হযরত যাররার (রা.)-কে আসতে দেখে নারাধ্বনি দেন।

নিজ জখমের বিন্দুমাত্র পরোয়া ছিল না হযরত যাররার (রা.)-এর। তিনি ঘোড়া হতে লাফিয়ে নামেন। হযরত খালিদ (রা.)-ও ঘোড়া হতে নেমে আসেন এবং ইসলামী ইতিহাসের দুই মহান মুজাহিদ একে অপরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হন। খাওলা ঘোড়ায় আরোহী ছিলেন। তার চেহারা নেকাবে ঢাকা ছিল। শুধু চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছিল। চোখ হতে আনন্দের ঝিলিক ঠিকরে পড়ছিল।

"খোদার কসম! ইবনুল আযওয়ার" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তোমার বোন তোমার জন্য আমাকেও লজ্জা দিয়েছিল। সে তোমাকে মুক্ত করতে রোমীয়দের উপর একাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম।"

"আমার বোনের উপর আল্লাহর রহম হোক" হযরত যাররার (রা.) বলেন, "এখন আমার করণীয় কী বলুন।"

"তুমি কী অনুভব করছ না যে, এখন তোমার বিশ্রাম দরকার?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "প্রথমে ডাক্তারের কাছে যাও এবং তাকে তোমার ক্ষত দেখাও।"

হযরত যাররার (রা.) ডাক্তারের কাছে গেলেও ব্যান্ডেজ বেঁধে চলে আসেন।

✪✪✪

সালার সিমত বিন আসওয়াদ রোমীয়দের পশ্চাদ্ধাবনে যান। রোমীয়রা চরমভাবে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের অর্ধেক সৈন্য যুদ্ধে এবং পলায়নের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাকী অর্ধেক যা ছিল তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। সিমত যখন হিমসের কাছাকাছি গিয়ে পৌছেন, তখন রোমীয়দেরকে হিমস দূর্গে প্রবেশ করতে দেখেন। সে যুগে হিমস ছিল কেল্লাবিশিষ্ট একটি শহর।

সিমত দূর্গের কাছাকাছি গিয়ে থেমে যান। তার জানা ছিল না যে, কেল্লার অভ্যন্তরে কত সৈন্য আছে। তারপরও তিনি তার এক হাজার অশ্বারোহীকে কেল্লার চারদিকে এইভাবে ছড়িয়ে দেন, যেন তারা অবরোধ কিংবা কেল্লার উপর হামলা করতে চান।

এক সময় কেল্লার দরজা খুলে যায় এবং তিন-চারজন অসামরিক লোক বাহিরে বেরিয়ে আসে। তারা রোমীয় সৈন্য নয়; বরং স্থানীয় বাসিন্দা ছিল। সালার সিমত তাদেরকে কাছে ডেকে পাঠান।

"কেন এসেছ?" সিমত জিজ্ঞাসা করেন।

"নিরাপত্তা ও বন্ধুত্বের পয়গাম নিয়ে এসেছি" এক আগন্তুক বলে "রোমীয়রা আর বাড়তি লড়াই চায় না।"

"তোমাদের সম্রাটও কি আর লড়াই চান না?" সিমত জিজ্ঞাসা করন।

"আমরা রোম সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করতে পারি না" হিমসের এক বাসিন্দা বলে, "আমরা এ বার্তা নিয়ে এসেছি যে, হিমসবাসী রক্তক্ষয় চায় না। আপনারা এর জন্য যত ইচ্ছা খাদ্যসামগ্রী নিতে চান নিয়ে নিন। আপনারা যত দিন ইচ্ছা এখানে থাকুন। আপনাদের ও আপনাদের ঘোড়ার দানা-পানির ব্যবস্থা আমরা করব।"

কোনো ইতিহাসে এ তথ্য লেখা হয় নি যে, সালার সিমত হিমসে কোন কোন শর্তের ভিত্তিতে চুক্তি করেছিলেন। চুক্তি সম্পাদিত হলে তিনি ফিরে

আসেন। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ (রা.) সমস্ত সৈন্য নিয়ে দামেস্ক চলে এসেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) যখন দামেস্ক পৌঁছান, তখন অভ্যন্তরে নিরাশা ও আতংকের অবস্থা বিরাজ করছিল। সর্বত্র ছিল চাপা আতঙ্ক। শহরবাসীরা ইতিপূর্বে জেনেছিল যে, ইন্তেকিয়া হতে মদদ ও রসদ আসছে। কিন্তু নতুন করে তারা জানতে পারে যে, তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মদদ ও রসদ পথিমধ্যে মুসলিম বাহিনী খতম করে দিয়েছে। দামেস্কে সালার তুমা ছিল, সে রোম সম্রাটের জামাতা ছিল। শহরের কয়েকজন বাসিন্দা প্রতিনিধিরূপে তুমার কাছে আসে।

"আপনাকে কেউ কি বলেছে শহরের লোকজন কী বলাবলি করছে?" প্রতিনিধিদের একজন বলে।

"তোমরা কি জাননা এটা কাপুরুষতা?" তুমা বলে, "আমরা তো এখনও অবরোধ ভাঙ্গতে কোনো পদক্ষেপই নিই নি। তোমরা কি আমাকে এই পরামর্শ দিতে এসেছ যে, আমি মুসলমানদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করি?"

"মহান সালারের কাছে আমরা নগরের অবস্থা তুলে ধরতে এসেছি" প্রতিনিধি দলের আরেক জন বলে, "শহরের লোকজন এটা শুনে বিরাট আতঙ্কগ্রস্ত যে, যে বাহিনী আমাদের অবরোধ করে রেখেছে তারা আমাদের মদদও শেষ করে দিয়েছে। তারা বলেছে, মুসলমানরা যদি একবার শহরে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে আমাদের ঘর-বাড়ি বিরাণ করা হবে, আমাদের শিশুরা মারা যাবে এবং যুবতী কন্যাদের তুলে নিয়ে যাবে।

"আমরা এমন অবস্থা পর্যন্ত যেতে দেব না" সালার তুমা বলে।

"মহান সালার!" আরেক প্রতিনিধি বলে, "আপনি নিশ্চয় জেনেছেন যে, পরিস্থিতি কত দূর গড়িয়ে গেছে। শহরে খাদ্যের এমন তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষ ঠিক মত দু'বেলা খাবার খেতে পারছে না। দু'তিন দিন পরে পানি ছাড়া আর কিছু থাকবে না। চিন্তা করে দেখুন, ক্ষুধায় অস্থির হয়ে জনতা বিদ্রোহও করতে পারে। এমনটি হলে তা রোম সাম্রাজ্যের জন্য ভাল হবে না।

"তোমরা কী জাননা বিদ্রোহ করার শাস্তি কী?" তুমা কণ্ঠে শাহী প্রতাপ নিয়ে বলে।

"আমরা তা জানি মহান সেনাপতি!" প্রতিনিধি দলের এক সদস্য বলে, "আমরা আপনাকে দুর্ভিক্ষ এবং তা হতে সৃষ্ট বিদ্রোহের ফল ব্যক্ত করতে এসেছি। সে ধ্বংসের শিকার এবং জনতাকে ক্ষুধায় তিলে তিলে মারার চেয়ে কি এটা উত্তম নয় যে, আপনি মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নিবেন?"

“শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করার অর্থ হয় অস্ত্র সমর্পণ করা” তুমা বলে, “আমি লড়াই ব্যতীত এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিব না, যা মহান রোম সাম্রাজ্যের অপমানের কারণ হয়। আমরা যেখানে জান-প্রাণ ক্ষয় করছি, সেখানে তোমরা এক ওয়াক্ত ক্ষুধার কষ্ট সইতে পারবে না? ... যাও, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

✪✪✪

৬৩৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের এক সকাল। রোমীয় সালার তুমা কেল্লার প্রত্যেক দরজার হেফাজতের জন্য যেসব বহর নির্ধারিত করে দিয়েছিল, তাদের থেকে বেশির ভাগ সৈন্য নিয়ে এক স্থানে সমবেত করে এবং ঐ দরজা খুলতে বলে, যা তার নামে রাখা হয়েছিল। আর তা হলো– ‘বাবে তুমা’। সে এ দরজা দিয়ে সমগ্র বাহিনী বের করে মুসলমানদের ঐ বহরের উপর হামলা চালায়, যারা ঐ দরজার সামনে অবস্থান নিয়েছিল।

মুসলমানদের এই বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৫ হাজার। যাদের সালার ছিলেন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.)। তুমার হামলা ছিল আজকালকার হামলার মত। সে পাঁচিল এবং বুর্জ হতে মুসলমানদের লক্ষ্যে তীর মারতে শুরু করে। এর সঙ্গে সঙ্গে পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র দ্বারা পাথর নিক্ষেপও করতে থাকে। তীর এবং পাথর নিক্ষেপের ছত্রছায়ায় তুমা স্বীয় বাহিনীকে আক্রমণ করতে দ্রুত সামনে পাঠায়। তার এ কৌশল ছিল কার্যকর। প্রচণ্ড তীর ও পাথর বর্ষণের মুখে মুসলিম বাহিনী পেছনে হটতে বাধ্য হয় এবং তাদের সব মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে তীর বৃষ্টি ও পাথর নিক্ষেপ হতে বাঁচার প্রতি।

“কেউ পিছু হটবে না” সালার হযরত শুরাহবীল গর্জে উঠে বলেন, “তীরন্দাযরা সামনে চলে এসো।”

মুসলিম তীরান্দাযরা জবাবী তীর নিক্ষেপ শুরু করে। রোমীয়দের তীর ও পাথর যেহেতু উপরের দিক থেকে আসছিল এবং তা সংখ্যায় প্রচুর ছিল, তাই তাতে মুসলমানদের ক্ষতি বেশি হচ্ছিল। তীর বৃষ্টির প্রথম আঘাতেই কয়েকজন মুসলমান শহীদ হয়ে যান। মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত তীরে রোমীয়দেরও কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু তা মুসলমানদের তুলনায় অনেক কম ছিল।

ঐতিহাসিক ওকিদী, তবারী এবং আবু সাঈদ একটি ঘটনা লিখেছেন। রোমীয়দের নিক্ষিপ্ত তীরে শহীদদের মধ্যে এক মুজাহিদ ছিলে আবান বিন সাঈদ। যার পূর্ণ নাম ছিল, আবান বিন সাঈদ বিন আস (রা.)। তৎক্ষণাৎ আবানের মৃত্যুর খবর পশ্চাতের ঐ তাঁবুতে গিয়ে পৌছে, যেখানে মুসলিম নারী ও বাচ্চারা ছিল।

আবান বিন সাঈদের স্ত্রীও সেখানে ছিল। তার বিবাহ হয়েছিল মাত্র কয়েকদিন আগে। এই মহিলাও আহতদের দেখা-শুনা করা এবং সৈন্যদের পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন করার জন্য এসেছিল। রণাঙ্গণে থাকতেই শহীদ আবান তাকে বিবাহ করেছিল। কোনো ঐতিহাসিক ঐ মহিলার নাম লেখেননি। মহিলাটি জানতে পারে যে, তার স্বামী শহীদ হয়ে গেছে। স্বামীর শাহাদতের সংবাদ শুনে মহিলাটি তাঁবু হতে বের হয় এবং সোজা হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর বাহিনীতে গিয়ে পৌঁছে।

"আমার স্বামীর লাশ কোথায়?" মহিলা চিৎকার করে জানতে চায়– "সাঈদের পুত্রের লাশ কোথায়?"

পাঁচ হাজার অশ্বারোহী যাদের উপর উপর্যুপরি তীর ও পাথর বর্ষিত হচ্ছিল, আবান বিন সাঈদের স্ত্রী তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তার স্বামীর লাশ খুঁজে ফিরছিল। এক সৈন্য তাকে পেছনে চলে যেতে বলে এবং জানায় যে, তার স্বামীর লাশ তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু মহিলাটি স্বামী হারানোর শোকে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

কেউ তাকে ঐ স্থান দেখিয়ে দেয় যেখানে আবানের লাশ পড়ে ছিল। কিন্তু তখনও লাশ উঠিয়ে আনার সময় হয়নি। আবান ছিল তীরন্দায। তার দেহে তিনটি তীর বিদ্ধ ছিল এবং সে ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গিয়েছিল। তার ধনুক লাশের নিকটেই পড়া ছিল। তুনীরে তখনও কয়েকটি তীর বিদ্যমান ছিল। তার স্ত্রী ধনুক ও তুনীর উঠিয়ে নেয় এবং দৌড়ে তীরন্দাযদের সারিতে গিয়ে শামিল হয়।

সামনে পাঁচিলের উপর এক পাদ্রী দাঁড়ানো ছিল। তার হাতে বড় সাইজের একটি ক্রুশ ছিল, যা সে উপর পানে তুলে ধরে রেখেছিল। ঐ যুগের রীতি ছিল যে, ক্রুশ সৈন্যদের সঙ্গে রাখা হত, যাতে সৈন্যদের মাঝে এই চেতনা বলবৎ থাকে যে, তারা ক্রুশের মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়ছে।

শহীদ আবানের স্ত্রী মুসলিম তীরন্দাযদের ছাড়িয়ে আগে চলে যায়। তার আশেপাশে এবং মাটিতে তীর এসে বিদ্ধ হতে থাকে। মুসলিম তীরন্দাযরা তাকে পেছনে সরে আসতে বলে কিন্তু সে কারো কথা মানছিল না। তার নির্ভীকতা ছিল অনেকটা খাওলার মত। সে যতই অগ্রসর হচ্ছিল রোমীয়দের নিক্ষিপ্ত তীর ততই অধিক হারে তার আশেপাশে এসে পড়ছিল। এমনকি একটি তীর তার পার্শ্বদেশে কাপড়ে এসে লাগে এবং সেখানেই ঝুলতে থাকে। এতেও তার অগ্রযাত্রা থামে না।

এক স্থানে গিয়ে মেয়েটি থেমে যায়। সে ধনুকে তীর সংযোজন করে। ধনুক মাটিতে রেখে প্রস্তুত করতে কিছুটা সময় চলে যায়। সে ধনুক এত জোরে টানে যতটুকু একজন সবল পুরুষ টানতে পারে। এরপর সে তীর ছুঁড়ে মারে। তার

নিক্ষিপ্ত তীর রোমীয়দের তীরবৃষ্টি ভেদ করে ঐ পাদ্রীর গলায় গিয়ে বিদ্ধ হয়, যে বড় সাইজের ক্রুশ আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তীরের আঘাতে প্রথমে পাদ্রীর হাত হতে ক্রুশ পড়ে যায় এবং তা গড়িয়ে গড়িয়ে বাইরে এসে পড়ে। পাদ্রীও পেছনে বা ডানে-বামে গড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে পাঁচিলের উপর আছড়ে পড়ে এবং ক্রুশের সাথে সাথে সেও বাইরে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

ক্রুশসহ পাদ্রীকে এভাবে ভূপতিত করে শহীদ আবানের স্ত্রী নারাধ্বনি দেয় এবং পেছনে চলে আসে– "আমি প্রতিশোধ নিয়ে ছেড়েছি ... স্বামীর বদলে ক্রুশ ভূপাতিত করেছি"– সে তীরন্দাযদের সঙ্গে এসে মিলিত হয় এবং তীর চালাতে থাকে। ক্রুশ এবং পাদ্রীর ভূপতিতের প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের মধ্যে এই হয় যে, এতে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে যায়। তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হলো, পাদ্রীকে লক্ষ্য করে তীরটি মেরেছিল এক মহিলা। ওদিকে ক্রুশ গুড়িয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া রোমীয়দের মাঝে যা হয়, তা তাদের অনুকূলে ছিল না। তারা এটাকে তাদের জন্য অশনি সংকেত ধরে নিয়েছিল। কেননা তারা ক্রুশকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিত।

✪✪✪

'বাবে তুমা' দরজা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তুমা দেখেছিল যে, তার তীরন্দাযদের তীর ও পাথর বৃষ্টি মুসলমানদের অবস্থা নাজুক করে ফেলেছে। এটাকে সে মোক্ষম সুযোগ মনে করে। ফলে সে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সালার তুমা মুসলিম অশ্বারোহীদের মোকাবেলায় অশ্ববাহিনী বের করে না। সে পদাতিক বাহিনী দ্বারা হামলা পরিচালনা করে এবং যুদ্ধের কমান্ড নিজের হাতে রাখে। সালার তুমা নিজেও সাধারণ সৈনিকের মত লড়ছিল। ঐতিহাসিক ওকিদী এবং বালাজুরী লিখেন যে, তুমার আওয়াজ এমন ছিল, যেমন উট পাগল হয়ে গেলে তার থেকে উচ্চ আওয়াজ এবং ক্ষুব্ধ গর্জন বের হয়।

তুমার নেতৃত্বে পদাতিক বাহিনী বের হলে মুসলিম সালার হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.) মুসলিম বাহিনীকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধ বিন্যাসে বিন্যস্ত করেন। তুমা এই চাল চালে যে, তার বাহিনীকে ছড়িয়ে দেয়। তার সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় বেশি ছিল। তার পদাতিক সৈন্যরা মুসলিম অশ্বারোহীদের মোকাবেলা অত্যন্ত বীরত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে করছিল। শহরের অন্যান্য দরজায় যেসব মুসলিম বহর ছিল তারা হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর মদদে এই জন্য আসতে পারছিল না যে, এমন হামলা অন্যান্য দরজা থেকেও আসার সম্ভাবনা ছিল।

তুমা গর্জন ও হুঙ্কার করে ফিরছিল। সে মুসলমানদের ঝাণ্ডা দেখতে পেয়েছিল। এর মানে এই ছিল যে, মুসলমানদের সালার ওখানে। সে পতাকাকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়। হযরত শুরাহ্‌বীল (রা.) তাকে আসতে দেখে তলোয়ার উঁচিয়ে তার সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। উভয় একে অপরকে হুঙ্কার দিয়ে ডাকে। তাদের মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র ১০/১২ কদমের, ইত্যবসরে এক তীর এসে তুমার ডান চোখে বিদ্ধ হয়। তুমা চোখে আঘাত খেয়ে চোখ ধরে বসে পড়ে। হযরত শুরাহ্‌বীল (রা.) সুযোগ পেয়েও তার উপর আক্রমণ করেন না। তুমার বডিগার্ডরা তার চারপারে মানব প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয় অতঃপর তাকে ধরে নিয়ে যায়।

ঐতিহাসিকগণ সকলেই এ কথা লিখেছেন যে, এই তীর শহীদ আবান বিন সাঈদের স্ত্রী মেরেছিল।

সালারের পরাভূত অবস্থা দেখে রোমীয়দের উৎসাহেও ভাটা পড়ে যায় এবং তারা পেছনে হটতে থাকে। হযরত শুরাহ্‌বীল (রা.)-এর তীরন্দাযগণ তীর বৃষ্টি শুরু করে দেয়। রোমীয়রা দ্রুতবেগে পিছু হটতে এবং কেল্লার দরজা দিয়ে গায়েব হতে থাকে। তারা পশ্চাতে যে লাশ ফেলে যায় তার কোনো হিসাব ছিল না।

"রোমীয়দের সিপাহ্‌সালার মারা গেছে" মুসলিম বাহিনী নারাধ্বনি দিতে থাকে "আমরা রোমীয়দের হত্যাকারী। ... রোমীয় সালারকে এক মহিলা মেরে ফেলেছে। ... সালার তুমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। ... বাইরে বেরিয়ে আস রোমীয়রা তোমাদের নিহত পাদ্রী ও ভূপতিত ক্রুশ উঠিয়ে নিয়ে যাও।"

পাঁচিলে অবস্থানরত রোমীয়রা তাদের নারাধ্বনি শুনছিল এবং এই নারাধ্বনি শহরের অভ্যন্তরেও শোনা যাচ্ছিল। এই নারাধ্বনি রোমীয় সৈন্য এবং দামেস্ক শহরবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য তীরের মত ধ্বংসকারী ছিল।

মুসলমানদের প্রাণহানীও কম ছিল না। অনেক মুসলমান রোমীয়দের তীর ও পাথরের আঘাতে শহীদ কিংবা আহত হয়ে গিয়েছিল। পরের যুদ্ধেও অনেকে শহীদ হয়। এত প্রাণহানীতে হযরত শুরাহ্‌বীল (রা.) পেরেশান হন এবং সোজা হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে চলে যান।

✪✪✪

হযরত শুরাহ্‌বীল (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ শোনান এবং এ কথাও বলেন যে, রোমীয় সালার মারা না গেলেও যুদ্ধের অযোগ্য হয়ে গেছে। তিনি এটাও জানান যে, তার অনেক সৈন্য শহীদ ও আহত হয়ে গেছে।

"যদি রোমীয়রা আরেকবার এমন হামলা করে তাহলে হয়তবা আমরা তা রুখতে পারব না" হযরত শুরাহবীল (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, "আমার আরো সাহায্যের প্রয়োজন।"

"হাসানার পুত্র!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এমন হামলা যে কোনো দরজা দিয়ে আমাদের যে কারো উপর হতে পারে। কারো সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা যাবে না। ... ইবনে হাসানা! খোদার কসম! তুমি তো হিম্মতহারা ছিলে না। তবে কী এত বেশি সঙ্গীর খুন তোমার উৎসাহ কমিয়ে দিয়েছে?"

"না, ইবনে ওলীদ!" হযরত শুরাহবীল (রা.) বলেন, "যদি অসম্ভব হয় তাহলে আমি একজনও সাহায্য চাব না।"

"আমি তোমাকে একাকী ছাড়ব না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তোমার প্রতি হামলা হলে আমি পর্যবেক্ষণে থাকব। যদি হামলা তোমার সহ্যের বাইরে হয়, তাহলে হযরত যাররার (রা.) তোমার সাহায্যে পৌঁছে যাবে। এরপরও প্রয়োজন দেখা দিলে আমি নিজেই চলে আসব। ... তোমার কাছে যত সৈন্য রয়েছে, তাদের প্রস্তুত রাখবে। রোমীয়দের সালারের চোখে যদি তীর লাগে, তাহলে এক-দুই দিন রোমীয়রা হামলা করবে না।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর মত সঠিক ছিল না। তুমা একটি মোজেযা দেখিয়ে ছিল। সে বাস্তব অর্থে যোদ্ধা ছিল। যেহেতু সে শাহী খান্দানের সদস্য ছিল, তাই রোম সাম্রাজ্যের যে মহব্বত তার মধ্যে ছিল তা ছিল কুদরতী। পরে জানা গিয়েছিল যে, তুমার চোখে তীর লাগলে তাকে তুলে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার দেখে যে, তীর এত বেশি গভীরে প্রবেশ করেনি যে, তা তুমার জীবনাবসানের কারণ হবে। চোখের খুপড়ির হাড় তীর আহত করেনি। তীর শুধু চোখে লাগে কিন্তু তা বের করা যাচ্ছিল না।

"তীর কেটে ফেল!" তুমা ডাক্তারকে বলে, "তীরের বাকী অংশ ভেতরেই রেখে দাও এবং আহত চোখের উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও। অপর চোখে যেন ব্যান্ডেজ না পড়ে। আমি আজ রাতে এমন হামলা আরেক বার করব।"

"মহান সেনাপতি!" ডাক্তার আঁৎকে উঠে বলে, "আপনি একী বলছেন? আপনি যুদ্ধ করার যোগ্য নন। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।"

"এই এক চোখের বদলে আমি মুসলমানদের এক হাজার চোখ নষ্ট করব" তুমা বলে, "আমি তাদের কেবল পরাজিতই করবনা। আমি তাদের দেশ আরব পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করব। আমি আমার কাজ তখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বুঝব যখন তাদের দেশকে এমন স্তরে পৌঁছে ছাড়ব যে, সেখানে শুধু জন্তু-জানোয়ার থাকবে; কোনো মানুষ থাকবে না।"

তুমার এই শব্দ একাধিক ঐতিহাসিক লিখেছেন এবং ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক হেনরী স্মিথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের সকলের বর্ণনা মতে তুমার নির্দেশে ডাক্তার তীর নিকট থেকে কেটে চোখের উপরে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। এটা প্রেরণা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের কারিশমা ছিল যে, তুমা চোখের এই মারাত্মক ক্ষত সহ্য করে নেয় এবং নির্দেশ দেয় যে, আজই রাতে বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করা হবে।

"তত সৈন্য বাবে তুমার সামনে জড়ো করা হোক, যত সৈন্যকে হামলা করার জন্য আমি দিনে নিয়ে গিয়েছিলাম" তুমা নির্দেশ দেয় এবং উঠে দাঁড়ায়।

চলতে চলতে সে মদ পান করে এবং অস্ত্র বেঁধে নিয়ে বাইরে বের হয়।

✪✪✪

রাতে পূর্ণ চাঁদ উঠেছিল। চাঁদের আলোয় জমিন ছিল আলোকিত। তুমা যুৎসই পন্থা অবলম্বন করে। সে তার সকল বাহিনীর কমান্ডারদের নির্দেশ দেয় যে, অপর তিন দরজা– বাবে সগীর, বাবে শারক এবং বাবে যাবিয়াহ হতে বাইরে গিয়ে মুসলমানদের উপর এভাবে হামলা করবে যে, যুদ্ধে নিজেদেরকে বেশি জড়াবে না; বরং তাদেরকে লড়াইয়ে ব্যতিব্যস্ত রাখবে। সে নিজে বাবে তুমা হতে বড় মাপের হামলা করবে। অন্যান্য দরজা দিয়ে হামলা করানোর দ্বারা তার উদ্দেশ্য এই ছিল, যেন কোনো দিক হতে শুরাহবীল সাহায্য না পায়।

"তোমাদের শত্রুরা এ সময় যুদ্ধের চিন্তা মাথায় রাখবে না" তুমা তার নায়েব সালারদের বলে, তোমরা তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘিরে ফেলবে।"

তুমার সৈন্যরা দরজা দিয়ে বের হয়। সময়টা ছিল মধ্যরাত। আকাশ এত পরিষ্কার ছিল যে, কেউ এলে তাকে পুরোপুরি চেনা যাচ্ছিল। মুসলমানদের উপর চার দরজা হতেই হামলা হয়। এক দরজার সামনে সালার হযরত আবু উবায়দা (রা.) ছিলেন। দ্বিতীয় দরজার সামনে হযরত ইয়াযিদ বিন সুফিয়ান (রা.) ছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) রোমীয়দেরকে খুব জলদিই ভাগিয়ে দেন এবং রোমীয়রা তাড়া খেয়ে কেল্লার অভ্যন্তরে ফিরে যায়।

হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর অবস্থা কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়। রোমীয়রা তাদের উপর বড়ই জোরালোভাবে চড়াও হয়েছিল। হযরত ইয়াযিদ (রা.) তাদের উপর হামলা করলেও রোমীয়রা তাদের উপর প্রবল হতে চলেছিল। হযরত যাররার (রা.) রিজার্ভ ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল সময়মত মদদ পৌছানো। যাররার (রা.) জানতে পারেন যে, হযরত ইয়াযিদ (রা.)-এর সাহায্য প্রয়োজন। তিনি তৎক্ষণাৎ দুই হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক মুজাহিদদের নিয়ে হযরত ইয়াযিদের কাছে পৌছে যান। হযরত যাররার (রা.)-

এর দৈহিক অবস্থা যুদ্ধের যোগ্য ছিল না। তার হাতে তীর লেগেছিল। এ ছাড়া শরীরের অন্যান্য স্থানে আরও দু'টি গভীর ক্ষত ছিল। তারপরেও তিনি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন এবং তার বর্শা পুরোদমে কাজ করছিল।

হযরত যাররার (রা.) নিজের সৈন্য ও ইয়াযিদ (রা.)-এর সৈন্যদেরকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণের নির্দেশ দেন। হামলাটি ছিল মারাত্মক। এতে রোমীয়দের উপর এমন ত্রাস সৃষ্টি হয় যে, তারা যুদ্ধ ফেলে কেল্লায় চলে যায়। তাদের মৃতদেহ ও আহতরা ময়দানে রয়ে যায়।

তৃতীয় দরজার সামনে রাফে ইবনে উমাইয়ার বাহিনী ছিল। তার উপরেও রোমীয়রা প্রচণ্ড আক্রমণ করে এবং রাফে এর পা উপড়ে দেয়। মুসলমানরা অত্যন্ত নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু রোমীয়দের হামলা বড়ই কঠিন ছিল। ঘটনাক্রমে রাফের হিমশিম অবস্থা হযরত খালিদ (রা.)-এর চোখে পড়ে। তিনি চারশত অশ্বারোহী নিয়ে রাফে এর কাছে পৌঁছে যান।

"আমি ভয়ঙ্কর যোদ্ধা"‚ হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমি খালিদ বিন ওলীদ"।

হযরত খালিদ (রা.) মাত্র চারশত অশ্বারোহী দ্বারা আক্রমণ করান। এদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে ইতিপূর্বে যে রোমীয়রা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তারা দৌড়ে পালায় এবং সোজা কেল্লার মধ্যে গিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচে। কেল্লার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রকৃত যুদ্ধ চলছিল বাবে তুমার সামনে। সালার তুমা নিজেই সেখানে আক্রমণ করেছিল। হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর সৈন্য খুব কম ছিল। মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল এবং তারা দিনের বেলা লড়াই করে ক্লান্তও হয়ে গিয়েছিল। হযরত শুরাহবীল (রা.) এবারও তীরন্দাযদের ব্যবহার করেন। রোমীয়রা তীরাহত হয়ে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ছিল কিন্তু তারপরেও তারা ছুটে আসছিল। হযরত শুরাহবীল (রা.) দিনের বেলায় তুমার গর্জন শুনেছিল। তিনি রাতেও সেই আওয়াজ শুনেন। এতে তিনি এই ভেবে হতবাক হয়ে যান যে, মারাত্মক আহত হয়েও সালার তুমা নেতৃত্ব দিচ্ছে। বস্তুত এ কারণেই রোমীয়রা তীর বৃষ্টির মুখেও অগ্রসর হচ্ছিল।

চাঁদনী রাতে উভয় বাহিনীর মাঝে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর মুজাহিদ বাহিনী হামলা প্রতিহত করে এবং দীর্ঘক্ষণ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে থাকে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই লড়াই প্রায় দু'ঘণ্টা যাবত অব্যাহত থাকে এবং উভয় বাহিনীর সৈন্য মারা যেতে থাকে। কোনো দিক হতে সাহায্য আসার সম্ভাবনা হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর ছিল না।

✪✪✪

যুদ্ধ ক্রমে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। সালার তুমার আওয়াজ হযরত শুরাহবীল (রা.)-কে হয়রান করছিল। ওদিকে তুমা হযরত শুরাহবীল (রা.)-কে খুঁজছিল। তার বীরত্ব ছিল অস্বাভাবিক। সে চাঁদের আলোয় মুসলমানদের পতাকা দেখেছিল। তখন সে হযরত শুরাহবীল (রা)-কে আহ্বান জানিয়ে তার দিকে অগ্রসর হয়। হযরত শুরাহবীল (রা.) তুমাকে গর্জে আসতে দেখে তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হন।

"এক চোখের বদলে এক হাজার চোখ নিব" তুমা বলে।

"খোদার কসম! তুমি দ্বিতীয় চক্ষুও খোয়াতে এসেছ" হযরত শুরাহবীল (রা.) বলেন।

উভয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয় এবং উভয়ে ঘোড়ার পিঠ হতে নিচে নেমে আসে। দু'জনের হাতেই তলোয়ার এবং ঢাল ছিল এবং উভয়ে তলোয়ার চালনায় পারদর্শী ছিল। হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর ধারণা ছিল যেহেতু সালার তুমার এক চক্ষু আহত হওয়ায় এখন সে এক চক্ষুর অধিকারী, তাই ভাল করে লড়তে পারবে না। কিন্তু তুমা হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে লড়ছিল। হযরত শুরাহবীল (রা.) জানতেন না যে, তীরের ফলা তখনও তুমার চোখে গেঁথে আছে।

হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর প্রতিটি আঘাত তুমা ফিরিয়ে দিচ্ছিল আর তুমার আঘাত হযরত শুরাহবীল (রা.) প্রতিহত করছিলেন। এক সময় হযরত শুরাহবীল (রা.) তুমার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। তার তলোয়ার প্রথমে তুমার শিরস্ত্রাণে গিয়ে লাগে, সেখান থেকে পিছলে কাঁধের উপর গিয়ে পড়ে, যেখানে লোহার বর্ম ছিল। জোরালো আঘাত কাঁধের উপর গিয়ে পড়ায় তলোয়ার ভেঙ্গে যায়। এ সুযোগে তুমা গর্জে উঠে আক্রমণ করে, যা হযরত শুরাহবীল (রা.) ঢাল দ্বারা প্রতিহত করেন। তিনি তলোয়ারহীন ছিলেন। তলোয়ারহীন অবস্থায় তিনি শুধু আক্রমণ ঠেকাতে পারছিলেন, আক্রমণ করতে পারছিলেন না। তুমা এগিয়ে এগিয়ে আক্রমণ করছিল।

হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর দুই মুজাহিদ দেখতে পেয়েছিলেন যে, তিনি তলোয়ারহীন অবস্থায় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। তখন তারা হযরত শুরাহবীল ও সালার তুমার মধ্যখানে চলে আসে। হযরত শুরাহবীল (রা.) এদিক-ওদিক তাকান। তিনি কারো তলোয়ারে খুঁজছিলেন। কিছু দূরে এক মুজাহিদের লাশের পাশে তার তলোয়ার পড়ে থাকতে দেখেন। দৌড়ে গিয়ে তিনি তলোয়ার উঠিয়ে নেন এবং ফিরে আসেন। কিন্তু তুমা সেখানে ছিল না। হযরত শুরাহবীল (রা.) দুই মুজাহিদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, রোমীয় সালার কোথায়? তারা জানায়

যে, সে পিছু হটতে হটতে রণাঙ্গনের মাঝে হারিয়ে গেছে। তারা তাকে ঘোড়ায় উঠতে দেখেছিল।

হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর বাহিনীর উপর রোমীয়রা বিরাট চাপ সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না যে, তিনি রোমীয়দের পরাস্ত করতে পারবেন। লড়াইয়ে হযরত শুরাহবীল (রা.) এবং তার বাহিনী কোনো ত্রুটি করেনি। তিনি কিছু অশ্বারোহীকে পৃথক করে পার্শ্ব দিক হতে রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে কিছু কাজ হয় আর কিছু হয় রোমীয়দের নিরাশা হতে। এ দুয়ে মিলে এক সময় রোমীয়রা পিছু হটতে থাকে। রোমীয়দের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল না; বরং নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটছিল।

হযরত শুরাহবীল (রা.) রোমীয়দের পিছু হটতে দেখে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন না। কেননা মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প হয়ে গিয়েছিল। তিনি বেশি ঝুঁকি নিতে চান না। পশ্চাদ্ধাবনের পরিবর্তে তিনি তীরন্দাযদের সামনে পাঠিয়ে দিয়ে পিছু হটা রোমীয়দের উপর তীর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করেন। রোমীয়রা সঙ্গীদের লাশ এবং আহতদের পশ্চাতে ফেলে কেল্লার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গায়েব হয়ে যায়।

✪✪✪

রোমীয় সৈন্যরা যে দরজা দিয়েই বের হয়েছিল, তারা অগণিত লাশ ও আহত সৈন্যদের ফেলে সে দরজা দিয়ে আবার ভেতরে চলে যায়। সবচেয়ে জোরদার হামলা তুমা করেছিল। কিন্তু সেও ব্যর্থ হয়। যদি ব্যর্থ হওয়ার মধ্যেই বিষয়টি সীমিত হত, তাহলে রোমীয়রা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু তাদের যে হারে প্রাণহানী ঘটেছিল, তা ছিল তাদের সহ্যের বাইরে। তাদের সৈন্য পূর্বেও তেমন বেশি ছিল না। তারপরেও যা ছিল তা এবারের যুদ্ধে অর্ধেকে নেমে এসেছিল। তুমার জন্য আরেকটি সংকট এভাবে সৃষ্টি হয় যে, যখন রোমীয়রা ভেতরে ঢুকে এবং কেল্লার দরজা বন্ধ হয়ে যায় তখন এ শহরের একটি প্রতিনিধি দল তার চারপাশে এসে জড়ো হয়।

"মহামান্য সালার!" প্রতিনিধি দলের একজন বলে, "আমরা রোম সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত প্রজা। আমরা চাই না যে, রোম সাম্রাজ্যের ক্ষতির পর ক্ষতি হোক। এই জন্য আমরা ইতিপূর্বেই আপনাকে জানিয়েছি যে, মুসলমানদের সঙ্গে আর যুদ্ধে না জড়িয়ে সন্ধি করা হোক।"

"শহরের অভ্যন্তরে যে অশান্ত পরিস্থিতি ও নিরাপত্তাহীনতা প্রসার লাভ করেছে তা আপনি দেখেন নি" প্রতিনিধি দলের আরেক সদস্য বলে, "ফৌজী যে

ক্ষতি হয়েছে তা আপনার সামনে আছে এবং আপনি নিজেও আহত। আশঙ্কা রয়েছে যে, শহরবাসী যদি একটানা অনাহারী থাকে, তখন তারা নিজেরাই সৈন্যদের বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিবে।"

তুমা পরাক্রমশালী সালার ছিল। তার বীরত্ব ও সংকল্পের দৃঢ়তায় কোনো সন্দেহ ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে তার অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, শহরের যে লোক তার সঙ্গে কথা বলত, সে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। অথচ এ ছিল সেই তুমা, যে কারো কথা সহ্য করত না। তার চেহারায় পরাজয়ের ছাপ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সে তার ঐ চোখে হাত রাখে, যার ভেতরে তীরের একটি অংশ বিদ্যমান ছিল এবং তার উপরে পট্টি বাঁধা ছিল। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, চোখের জখম তাকে কষ্ট দিচ্ছিল।

"আমাকে ভাবতে দাও" তুমা ধরা কণ্ঠে বলে, "আমি সন্ধি করব, তবে এমন কোনো শর্ত মানব না, যা রোম সাম্রাজ্যের অপমানের কারণ হয়।"

মূলত তুমা নীতিগতভাবে পরাজয় মেনে নিয়েছিল। সে মনে-প্রাণে এই সুযোগ খুঁজে ফিরছিল যে, এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক, যাতে মুসলমানদের সঙ্গে সম্মানজনক সমঝোতা হয়ে যায়।

ঐতিহাসিকদের বিবরণ মতে, তাকে কেউ এ তথ্য জানিয়েছিল যে, মুসলমানদের নায়েব সালার হযরত আবু উবায়দা (রা.) নরম প্রকৃতির এবং সন্ধি প্রিয় লোক। যদি তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, তাহলে সম্মানজনক সমঝোতা হতে পারে। হযরত খালিদ (রা.)-এর সম্পর্কে তুমার জানা ছিল যে, তিনি পূর্ণাঙ্গ পরাজয় এবং অস্ত্র সমর্পণ ছাড়া অন্য কোনো শর্তে সমঝোতা করবেন না। তুমা এক সময় তার উপদেষ্টাদের ডেকে পাঠায়।

কেল্লার বাইরে মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল যে, তাদের স্পৃহা বেড়ে গিয়েছিল এবং তারা বারবার আহ্বান জানাচ্ছিল যে, রোমীয়রা! শহর আমাদের হাতে তুলে দাও। কিন্তু শহরের ভেতরে প্রবেশের কোনো উপায় বের হচ্ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মুজাহিদ বাহিনীকে এক-দুই দিন বিশ্রাম দিয়ে শহরের দরজা ভাঙ্গার অথবা দেয়াল টপকানোর চেষ্টা চালানো হবে।

পর দিন প্রভাতে আল্লাহ তা'আলা হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে একজন অমুসলিমকে এনে দাঁড় করান। লোকটি ছিল ইউনানী, নাম ইউনুস বিন মারকিস। রাতে রোমীয় সৈন্যরা যখন কেল্লার ভেতরে থেকে নিজেদের হতাহত হওয়া সম্পর্কে আলাপ করছিল, তখন ঐ লোকটি দূর্গের প্রাচীর হতে একটি রশির মাধ্যমে নীচে নেমে এসেছিল। লোকটি জানায় যে, সে একটি মেয়েকে

পেতে নিজের জীবন বিপর্যয়ের মুখে ফেলে এখানে এসেছে। ঐ মেয়েটিও ছিল ইউনানী। এটা ছিল ৬৩৪ খৃস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩ হিজরীর ১৯ রযবের একটি ঘটনা।

✪✪✪

৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বরের গভীর রাত। হযরত খালিদ (রা.)-কে জানানো হয় যে, কেল্লার অভ্যন্তর হতে একজন লোক এসেছে। লোকটি নিজের নাম বলেছে ইউনুস বিন মারকিস।

"সে কেল্লা হতে আসেনি" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "যদি কেল্লার অভ্যন্তর হতেও এসে থাকে, তবে ভাল নিয়তে আসেনি। যদি বাইরে কোথাও হতে এসে থাকে তবুও তার নিয়ত ভাল নয়। সে রোমীয়দের গুপ্তচর হবে। ... তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

লোকটি ছিল যুবক শ্রেণীর। সাধাসিধা এবং স্বাভাবিক ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর দুই মুহাফিজ তাকে চেক করে। তার কোমরে একটি খঞ্জর ছিল, যা সে লুকিয়ে রাখেনি। খঞ্জর রেখে দিয়ে তাকে হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবুতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হযরত খালিদ (রা.) তাকে পা হতে মাথা পর্যন্ত দেখেন। এরপর তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

"মহান সালার আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে পারেন" ঐ যুবা লোকটি বলে, "আমি আপনার শত্রুকেল্লা হতে এসেছি। আমার প্রতি আপনার সন্দেহ করাটাই যথার্থ। ... আমার নাম ইউনুস বিন মারকিস এবং আমি ইউনানী। আপনার ও রোমীয়দের যুদ্ধের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।"

"ইউনানী যুবক!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এটা কি ভাল হয় না যে, তুমি তোমার আগমনের উদ্দেশ্য এখানেই বলবে?"

"আমার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত" ইউনুস বিন মারকিস বলে, "আপনি আমার সে উদ্দেশ্য পূরণ করলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

"তুমি আমাকে কী সাহায্য করতে পার?"

"আমি আপনাকে কেল্লার ভেতরে পৌঁছে দিতে পারি" ইউনুস বিন মারকিস বলে "এরপর দামেস্ক হবে আপনার।"

"তুমি কেল্লা হতে কীভাবে বের হয়েছ?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন। "আমি কীভাবে বিশ্বাস করব যে, তুমি মিথ্যা বলছ না?"

"আমি পূর্ব দিকের নিকটবর্তী দেয়ালে রশি বেঁধে নেমেছি" ইউনুস বিন মারকিস বলে, "আমার আগমনের উদ্দেশ্যও শুনুন মহামান্য সেনাপতি! দামেস্কে তিন-চার হাজার ইউনানী বসবাস করে। এক ইউনানী মেয়েকে আমি ভালবাসি।

আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না যে, আমরা একে অপরকে কেমন ভালবাসি। আপনার সৈন্যরা দামেস্ক অবরোধ করার কিছুক্ষণ পূর্বে ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। ইতিমধ্যে শহরে শোরগোল ওঠে যে, মুসলমানরা শহর অবরোধ করেছে। এতে করে মেয়েটির পিতামাতা মেয়েটিকে আমার কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, আগে অবরোধ উঠে যাক, এরপর তোমার হাতে তোমার স্ত্রীকে তুলে দেয়া হবে। ...

মহামান্য সেনাপতি! আমি মেয়েটিকে পেতে এত উদগ্রীব যে, আমার তর সইছে না। আসল কথা হলো, মেয়েটির মায়ের নিয়ত ভাল নয়। সে তার মেয়ের বিবাহ এক বিরাট সওদাগরের সঙ্গে দিতে চায় কিন্তু তার মেয়ে আমার মহব্বতের কারণে তাকে এ বিয়েতে রাজি হতে বাধ্য করে। আপনার সৈন্যরা শহর অবরোধ করলে সে এক মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। সে এই বাহানা দেখিয়ে বলে যে, এখন সবাই শহর রক্ষায় ব্যস্ত। এ সময় ভাল দেখায় না যে, তোমরা বিপদের এ মুহূর্তে আনন্দ উদযাপন করবে।"

"কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমি কি এখানে প্রেমকাহিনী শুনতে এসেছি? তুমি সেকথা এখনই কেন বলছ না যা মূলত বলতে এসেছ? তুমি যদি অন্য কোনো নিয়তে এসে থাক, তাহলে এখান থেকে জিন্দা ফিরে যেতে পারবে না।"

"উহ্ ইবনে ওলীদ!" ইউনুস বিন মারকিস দীর্ঘশ্বাসভরা কণ্ঠে বলে, "এমন বুকের পাটা কার, যে অসৎ উদ্দেশ্যে আপনার তাঁবুতে আসার দুঃসাহস দেখাতে পারে, যিনি রোমের মত বিশাল ও শক্তিধর সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়বড়ে করে দিয়েছেন। এমন ব্যক্তির পক্ষে আমার মত সাধারণ লোককে ভয় করা মানায় না। এখানে এটাও লক্ষণীয় যে, আমি রোমীয় নই; বরং ইউনানী। আমার শুধু আমার স্ত্রী চাই, আর আপনার চাই দামেস্ক। ... ভেদের কথা হলো, আগামী তিন-চার দিন লড়াই হবে না।

"কেন হবে না?"

"দামেস্কের সালার তুমা আহত" ইউনুস বিন মারকিস জবাবে বলে "কিন্তু লড়াই না হওয়ার কারণ শুধু এটা নয়। আরেকটি কারণ হলো, শহরের লোকজন সালার তুমার পেছনে এই উদ্দেশ্যে লেগে আছে যে, সে যেন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ এবং সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করে। শহরে তরিতরকারির আকাল লেগেছে। লড়াই না হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ যেটা তা হলো, আগামীকাল রাতে দামেস্কের লোকজনের একটি অনুষ্ঠান আছে, যাতে রোমীয় সৈন্যরাও অংশগ্রহণ করবে। সে অনুষ্ঠানে সবাই এমনভাবে মজে যাবে যে, কারোর কোন কিছুর হুঁশ থাকবে না। আমি আপনাকে এই সাহায্য করব যে,

দূর্গের দেয়ালে রশি স্থাপনের মোক্ষম স্থানের কথা আপনাকে বলে দিব। এভাবে আপনার কয়েকজন লোক কেল্লার উপরে উঠে পড়বে এবং ভেতরে নেমে একটি দরজা খুলে দিবে। তখন আপনার সৈন্যরা বাধভাঙ্গা স্রোতের মত কেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে।"

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, দামেস্কবাসী তাদের বাৎসরিক নির্ধারিত কোনো অনুষ্ঠান করছিল। এমন অনুষ্ঠানে তারা এত বেশি মদ পান করত এবং হাসি-তামাশা ও ফুর্তিতে এত বেশি মগ্ন হত যে, তাদের উপরে কেউ এসে পতিত হলেও তারা তা ঠাওর করতে পারত না। সৈন্যরাও এমন অনুষ্ঠানে শরীক হত। কিন্তু এবারের অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকেও দামেস্কবাসী যে এমন অনুষ্ঠানে হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে মগ্ন হতে পারে, তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না। দামেস্কের ভেতরগত অবস্থা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। শহরের ভেতরে তো দুর্ভিক্ষ এবং ভয়-ত্রাসের অবস্থা বিদ্যমান ছিল। রোমীয়দের বহু সংখ্যক সৈন্য মরে গিয়েছিল। অজস্র লাশ কেল্লার বাইরে পড়ে থেকে পচে-গলে যাচ্ছিল। ভেতরে আহতরা রোনাজারি করছিল। এই অবস্থায় আনন্দানুষ্ঠানের কল্পনায় বিবেক সায় দেয় না।

এক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক হেনরী স্মিথ ঘটনাটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেটাই বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। তিনি সিরিয়া হতে রোমীয়দের পিছপা হওয়ার বর্ণনায় লিখেছেন, দামেস্ক অবরোধে শহরবাসীর অবস্থা এত করুণ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা অস্ত্র সমর্পণের কথা ভাবছিল। তাদের ধর্মীয় গুরুরা সালার তুমাকে বলেছিল যে, তার প্রতি খোদা নারাজ। খোদাকে রাজি করতে এক ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দামেস্কে অন্য আকিদা-বিশ্বাসেরও লোক ছিল, যারা নিজ নিজ ধর্মের আদলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন করেছিল। যেহেতু এটা ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বিজয়ের জন্য এক ধরনের প্রার্থনার মত, তাই তাতে সকলের অংশগ্রহণ অনিবার্য ছিল। সৈন্যদেরও এতে শামিল করা হয়েছিল।

ঐ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক একথাও লিখেছেন যে, দামেস্কবাসীদের সামনে এমন কোনো আশঙ্কা ছিল না যে, মুসলিম বাহিনী কেল্লার সুউচ্চ প্রাচীর টপকে শহরের মধ্যে এসে পড়বে। একে তো কেল্লাও ছিল অনেক উঁচু, দ্বিতীয়ত প্রাচীর টপকানো কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মুসলমানদের অবস্থাও এত মজবুত ছিল না যে, তারা এখনই আবার যুদ্ধে নেমে পড়বে। এটা তো ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর সুদৃঢ় ইচ্ছা এবং তাঁর সকল সালারদের ভরপুর সাহায্য যে, দামেস্ককে যে কোনো মূল্যে অতিসত্বর পদানত করতে হবে। ইউনুস বিন মারকিসের ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, সে হযরত খালিদ (রা.)-কে

এতে রাজি করিয়ে ফেলে যে, সে তাকে কেল্লার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিবে আর তার বিনিময়ে শুধু এতটুকু চায় যে, তার স্ত্রীকে তাকে পাইয়ে দিবে। সব কিছু শুনে হযরত খালিদ (রা.) ঐ ইউনানীর উপর আস্থা রাখেন এবং তাকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দেন।

"আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি" ইউনুস বিন মারকিস বলে, "কিন্তু আমাকে হাত ধরে এগিয়ে নেয়ার কেউ ছিল না। আমাকে আপনি আপনার সঙ্গেই রাখুন। আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছি। আমাকে কী স্বীয় নাম পাল্টাতে হবে?

"না!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তোমার নাম পূর্ব হতেই ইসলামী আছে।"

হযরত খালিদ (রা.) তাকে মুসলমান বানান এবং তার কাছে জানতে চান যে, রশির ফাঁদ কোথায় এবং কীভাবে লাগানো হবে? ভেতর থেকে দরজা হেফাজতের ব্যবস্থা কেমন?

ইউনুস বিন মারকিস হযরত খালিদ (রা.)-কে সব কিছু খুলে খুলে বলে।

✪✪✪

ইউনুস বিন মারকিস শুধু এতটুকুই জানত যে, সামনের দুই-তিন দিন যুদ্ধ হবে না এবং আগামী রাতে লোকজন আনন্দানুষ্ঠান উদযাপন করবে। তার এই তথ্য জানা ছিল না যে, রোমীয় সালার তুমা হিম্মত হারিয়ে বসেছে এবং সে পর্দার অন্তরালে অন্য কোনো চাল চালতে তৎপর। এই গোপন চাল তুমা নিজে এবং তার উপদেষ্টারা মিলে তৈরী করেছিল। যেভাবে মুসলমানদের কাছে অত্র এলাকার গুপ্তচরেরা ছিল, তেমনি রোমীয়দের কাছেও এমন গুপ্তচর ছিল, যারা হযরত খালিদ (রা.) এবং তাঁর সকল সালারদের কৃতিত্ব এবং রুচি-অভ্যাস সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখত। তারা ছিল আরব ঈসায়ী। মক্কা-মদীনা এবং সেই এলাকায় বসবাসকারী ইহুদীও ছিল। তারা কেবল গুপ্তচরই ছিল না; বরং তাদের মধ্যে দু'-চারজন সালার তুমার উপদেষ্টাও ছিল।

তুমা কেল্লা থেকে বাইরে এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল। সে জোরদার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতে অজস্র প্রাণহানী ছাড়া তার আর কিছুই লাভ হয়নি। শহরবাসীরাও তাকে পেরেশান করে তুলেছিল। শহরে খাদ্যের সংকট ছিল। তার নিজের অবস্থাও এমন ছিল যে, একটি তীরের ফলা তার এক চোখে গেঁথে ছিল আর তার উপরে ব্যান্ডেজ লাগানো ছিল।

"এত কিছুর পরও আমি শহরকে ধ্বংস, লুটপাট এবং মানুষদের গণহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে চাই" তুমা তার সালার এবং উপদেষ্টাদের ডেকে উদ্ভূত

পরিস্থিতি তুলে ধরে এবং বলে, "আমরা এখন আর লড়াই করার উপযুক্ত নই। মুসলমানরাও সহজে কেল্লার ভেতরে আসতে পারবে না। কিন্তু খাদ্য ও রসদের যে সংকট দেখা দিয়েছে তা আপনারা সকলেই জানেন। মুসলমানরা যদি শুধু অবরোধ চালিয়ে যায় তথাপি শহরবাসী না খেয়ে মারা যাবে।

"এবং তারা বিদ্রোহও করতে পারে" এক উপদেষ্টা বলে।

"বিদ্রোহ করুক বা না করুক" তুমা বলে, "এটা আমার দায়িত্ব যে, শহরবাসীকে সব ধরনের কষ্ট থেকে রক্ষা করা। আপনাদের পরামর্শ আমার খুবই প্রয়োজন। এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যে, আমরা শহর ছেড়ে যেতে চাইলে মুসলমানরা আমাদের চলে যেতে অনুমতি দিবে এবং তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না?"

"খালিদ বিন ওলীদ বড় জাদরেল সালার" এক ইহুদী উপদেষ্টা বলে, "তিনি আমাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদে বের হতে দিবেন না। ইতিমধ্যে যুদ্ধে তাঁর সৈন্যদের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করবেন না। আমাদের বলবেন যে, তোমরা ইসলাম কবুল কর।"

"এটা আমি কখনও করব না" তুমা বলে।

"যদি আপনি এমনটি না করেন, তাহলে তিনি আপনার থেকে এত অর্থ উসুল করবে যে, আপনার সমুদয় অর্থ-সম্পদ এবং জনগণের অর্থ-সম্পদ দিয়েও তা পূর্ণ হবার নয়" ইহুদী উপদেষ্টা বলে।

তুমা গভীর চিন্তায় ডুব দেয়।

"তাদের মাঝে এমন কোনো সালার আছে, যিনি নরম মেজাযের?" তুমা জিজ্ঞাসা করে।

"আবু উবায়দা!" ইহুদী জবাবে বলে, "সুযোগ্য ও বাহাদুর সালার বটে কিন্তু দয়াশীল।"

"মুসলিম বাহিনীতে তার মর্যাদাগত অবস্থান কী?" তুমা জানতে চায়।

"ইবনে ওলীদের পরেই তার স্থান" অপর ইহুদী বলে, "ইসলামী রাষ্ট্রে আবু উবায়দার যে অবস্থান, তা ইবনে ওলীদের নেই। ইবনে ওলীদের স্থান তাঁর পরে। সমস্ত মুসলমান, বিশেষত খলীফা স্বয়ং এবং ইবনে ওলীদ আবু উবায়দাকে সম্মান করেন।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর পরিচিতি ও মর্যাদাগত অবস্থান শুনে তুমার মাথায় একটি চালাকী খেলে যায়। সে মনে মনে একটি ফন্দি আঁটে। ইহুদী, আরব ঈসায়ী উপদেষ্টারা এবং অন্যান্য জ্ঞানীজনেরা তুমাকে সাহায্য করে। সকলের সহযোগিতায় ধূর্তামিপূর্ণ একটি পরিকল্পনা তৈরী হয়। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল এরূপ—

তুমা আবু উবায়দার কাছে এই শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করবে যে, তাকে সহ তার সৈন্যদের এবং যেসব শহরবাসী শহর ছেড়ে যেতে চায় তাদেরকে তাদের মালসামগ্রী এবং স্ত্রী সন্তানসহ নিরাপদে বেরিয়ে যেতে দিবে। শহরে লুটপাট করা হবে না। তুমা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সে কর আদায় করবে। সেখানে এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, বিষয়টি গোপন রাখা হবে। খালিদ বিন ওলীদ যেন সন্ধির পূর্বে এ সম্পর্কে জানতে না পারে।

এই পরিকল্পনা এর উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছিল যে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) শহরের হাবিয়া দরজার সামনে স্বীয় বাহিনী নিয়ে অপেক্ষমাণ ছিলেন, যারা অবস্থানগতভাবে শারাক দরজার বিপরীতমুখী ছিলেন। দুই দরজার মাঝে পূর্ণ শহর অন্তরায় ছিল। দূরত্ব ছিল এক মাইলের কিছু বেশি। হযরত খালিদ (রা.)-এর অবস্থান হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর অবস্থান স্থলের অনেক দূরে হওয়ায় তুমা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাড়তি সুযোগ পেয়ে যায়।

তুমা তার সমমনা সাথীদের নিয়ে এই পরিকল্পনা ঐ রাতের দুই-তিন দিন পূর্বে করেছিল, যে রাতে ইউনানী যুবক ইউনুস বিন মারকিস হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে এসেছিল।

✪✪✪

পরের রাতের ঘটনা। হযরত খালিদ (রা.) হযরত কা'কা' (রা.) এবং আরেক বড় মুজাহিদ মাজউর বিন আদী শহর প্রাচীরের 'বাবুশ শারাক' দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের হাতে ছিল রশি। কেল্লার প্রাচীরের সাথে মিশে দাঁড়িয়েছিল একশত মুজাহিদ। তারা ছিল নির্বাচিত, নির্ভীক ও চৌকস মুজাহিদ। ইউনানী যুবক ইউনুস বিন মারকিস হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। সে-ই হযরত খালিদ (রা.)-কে এই স্থানটির কথা বলেছিল। সে রশির সাহায্যে এ স্থান হতে নেমেছিল।

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর জীবনের একটি বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক। কিছুতেই তার কেল্লার উপরে উঠা উচিত ছিল না। ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। মারা যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এই বিপদে তিনি অপর কাউকে ফেলতে চাচ্ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাঁর অবর্তমানে মুজাহিদ বাহিনীতে হতাশা ছড়াবে না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর স্থলবর্তী হবেন। এই সিদ্ধান্ত তাদের মাঝে পূর্ব হতে নেওয়া ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হবেন সর্বাধিনায়ক।

হযরত খালিদ (রা.) নিজ হাতে রশির ফাঁদ উপরে ছুঁড়ে মারেন। প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ১৩/১৪ গজ। রশির ফাঁদ উপরে গিয়ে আটকে যায়। তিনি কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করেন। কিন্তু প্রাচীরের উপরে কোনো রকম তৎপরতা দেখা যায় না, যার স্পষ্ট বার্তা হলো, উপরে কেউ নেই। আর কেউ থাকলেও বুঝতে পারে না যে, প্রাচীরে রশির ফাঁদ ছোঁড়া হয়েছে।

হযরত খালিদ (রা.) নিজেকে নিজে আরও বেশি শঙ্কার মধ্যে এভাবে নিক্ষেপ করেন যে, তিনি সকলের পূর্বে রশি বেয়ে উপরে উঠে যান। তার পিছু পিছু হযরত কা'কা' এবং মাজউর উপরে উঠে যান। উপরে কেউ ছিল না। দেয়ালের এই অংশ শহর থেকে কিছুটা দূরে ছিল। শহর হতে আসা আওয়াজ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষজন জেগে আছে এবং কোনো অনুষ্ঠানে লিপ্ত। এতটুকুতেই হযরত খালিদ (রা.)-এর পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ইউনানী যুবক ইউনুস বিন মারকিস তাকে ধোঁকা দেয়নি। তারা প্রাচীরের দেয়ালের সঙ্গে তিন-চারটি রশি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেয়। যা তারা এই উদ্দেশ্যেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

নির্বাচিত একশত মুজাহিদের মধ্যে পঞ্চাশজন তাঁদের দেয়া রশি বেয়ে উপরে উঠে আসে। ইউনুস বিন মারকিসও তাদের সঙ্গে ছিল। সে ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর গাইড। হযরত খালিদ (রা.) এই জানবাযদের কয়েকজনকে এই দায়িত্ব দিয়ে দেয়ালের উপরে বসিয়ে দেন যে, রোমীয় সৈন্যরা যদি উপরে আসে তাহলে তারা তাদেরকে শেষ করে দিবে। তবে নীরবতার সঙ্গে, যেন শহরের কেউ বিষয়টি না জানতে পারে। তিনি তাদেরকে সাবধান করে বলেন, প্রত্যেক কাজ নীরবে করবে।

হযরত খালিদ (রা.) হযরত কা'কা' ও মাজউরকে নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখেন এবং পঞ্চাশ জানবাযদের মধ্য হতে অবশিষ্টদেরকে নিজের সঙ্গে নিয়ে প্রাচীর থেকে নিচে নেমে আসেন। যেই তারা নিচে নেমেছেন, অমনি কয়েকজনের আওয়াজ তাদের কানে ভেসে আসে।

"রোমীয় সৈন্য!" ইউনুস বিন মারকিস হযরত খালিদ (রা.)-এর কানে কানে বলে, "আমি তাদের ভাষা বুঝি।"

"তাদেরকে তাদের ভাষায় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বল যে, দ্রুত চল" হযরত খালিদ (রা.) ইউনুস বিন মারকিসকে বলেন এবং তার জানবায বাহিনীকে বলেন, "তলোয়ার ধারণ কর এবং এত দ্রুত কোপ মারবে, যেন রোমীয়দের কণ্ঠ হতে কোনো আওয়াজ বের হওয়ার সুযোগ না মিলে।"

ইউনুস বিন মারকিস সামরিক অফিসারের মত বড় গম্ভীর কণ্ঠে রোমীয় সিপাহীদের ডাকে। তারা আসতেই হযরত খালিদ (রা.)-এর জানবায বাহিনী তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে নেয়। রোমীয়রা প্রায় চল্লিশ জনের মত ছিল। তারা দৌড়ে আসে। তখন ছিল রাত। মধ্যরাতে চাঁদ আকাশে ওঠার কথা ছিল। যখন রোমীয় সৈন্যরা ইউনুসের ডাকে এগিয়ে আসে, তখন চাঁদ শহর প্রাচীরের

উপরে চলে এসেছিল। রোমীয় সৈন্যরা আবছা আবছা আলোয় হযরত খালিদ (রা.)-এর জানবাযদেরকে নিজেদের লোক বলে মনে করে। তারা এগিয়ে এলেই মুসলিম জানবাযরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ৭/৮ জন তলোয়ার বের করে এবং মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু সবাই মারা যায়। তবে নীরবতা ভেঙ্গে যায়। দুই-তিন রোমীয় আহত হয়েই অত্যন্ত জোরালো আওয়াজে চিৎকার করে বলে, মুসলমানরা কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

✪✪✪

"এখনিই দরজা খুলতে হবে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "রোমীয় সৈন্যদের আসতে বেশিক্ষণ লাগবে না। ... আমার পেছনে পেছনে এসো।"

যেখানে দরজা ছিল যেখানে একটি সেনাচৌকিও ছিল। হযরত খালিদ (রা.) জানবায বাহিনীর আগে আগে ছিলেন। তিনি দৌড় কদমে দরজা সংলগ্ন চৌকিতে যান। সেখানে মাত্র দু'জন সৈন্য ছিল। তাদের হাতে বর্শা ছিল মাত্র। তারাও শোরগোল শুনেছিল। তাই মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে মোকাবেলা করার বেশি সুযোগ দেন না। একজনকে হযরত খালিদ (রা.) আর অপর জনকে হযরত কা'কা' (রা.) হত্যা করেন।

"দরজা খোলো" হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন– "এবং বেশির থেকে বেশি মানুষ বাইরে তৈরী থেকো। রোমীয়রা আসছে।"

ভেতর দিক হতে দরজায় বড় ভারী তালা লাগানো ছিল এবং লম্বা শিকলে বেঁধে দরজাকে মজবুত করে রাখা হয়েছিল। অনেক চেষ্টার পর তালা ভাঙ্গা হয় এবং শিকলও খুলে ফেলা হয়। হযরত খালিদ (রা.) দরজা খুলে বাইরে যান। তার বাকী পঞ্চাশজন জানবায মুজাহিদ বাইরে অপেক্ষমান ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে ভেতরে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তারা যেন দরজার বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থেকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে। রোমীয় সৈন্যরা আসছে। এর সঙ্গে সঙ্গে হযরত খালিদ (রা.) ঐ দরজার সামনে অবরোধ করে অবস্থানরত বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন। তাদের এ নির্দেশও দেন যে, দরজা খুলতেই তুফানের বেগে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

দরজা খুলতেই এই বাহিনী তুফানের মত দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে থাকে। ততক্ষণে চাঁদ আরও উপরে এসেছিল। ফলে কেউ প্রতিরোধে এগিয়ে এলে তাদের সনাক্ত করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। ওদিক হতে এক দল রোমীয় সৈন্য বাবে শারাকের দিকে আসছিল। এই দলটি মুহূর্তে মুসলমানদের তুফানের মুখে এসে পড়ে এবং সামান্য সময়ের ব্যবধানে পুরো দলটি লাশে পরিণত হয়ে যায়।

দামেস্কের সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের অভিমুখে ছুটে আসে এবং যে বাহিনীকে যে দরজায় দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তারা বিভক্ত হয়ে সে দরজায় চলে যায়। সারা শহরে হুলস্থুল পড়ে যায়। শহরবাসী পূর্ব হতেই ভীত ছিল। তাদের পলায়নের সুযোগ ছিল না। দরজা ছিল বন্ধ। তারা তাদের দামী দামী বস্তু এখানে-ওখানে লুকাচ্ছিল। মহিলারা চিৎকার করে ফিরছিল।

"আমাদের লোকজন ভীরু-কাপুরুষ" মহিলাদের ভয়ার্ত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসে "আমাদের লোকজন আমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। ... আমাদের সৈন্যরা সব কাপুরুষ। তারা নিজেদের জীবন রক্ষার্থে প্রতিযোগিতা করছে।"

মহিলাদের এই খোঁচা দামেস্কের যুবকদের কলজে গিয়ে লাগে। তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এভাবে রোমীয় সৈন্যদের সাহায্যকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী রোমীয়দের উপর প্রতাপ ও প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিলেন। মুসলমানরা রোমীয় ও শহরবাসীদের বেষ্টনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও তারা দামেস্ক বিজয় করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র ও কঠোরভাবে আক্রমণ করে চলছিল।

✪✪✪

প্রায় সকল ঐতিহাসিক লিখেন যে, এভাবে একাই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত তিনি জেনে-শুনেই নিয়েছিলেন অথবা তিনি এমনটি না চাইলেও তার কাছে এতটুকু সময় ছিল না যে, তিনি অন্যান্য দরজায় নিয়োজিত সালারদের জানাবেন যে, আজ রাতে তিনি কী করতে চান এবং কী কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। হযরত খালিদ (রা.) সময়ের অভাবে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে পর্যন্ত জানাতে পারেন না যে, তিনি আজ বিরাট ঝুঁকি নিতে চলেছেন। কোনো ইতিহাসে এই প্রশ্নের জবাব মিলে না যে, হযরত খালিদ (রা.) এমন ভুল কেন করেছিলেন।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি শহরের মধ্যে শোরগোল শুনে বলেন, হয়ত রোমীয়রা কোনো দরজা হতে বের হয়ে সে দরজায় অবস্থানরত মুসলমানদের উপর হামলা চালিয়েছে। রোমীয়রা এমন হামলা পূর্বেও কয়েকবার করেছিল। অন্যান্য দরজায় অবস্থানরত মুসলিম সালাররাও বিভ্রান্তিতে থাকেন। হযরত খালিদ (রা.) শহরের মধ্যে যুদ্ধে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, অন্যান্য সালারদের ভেতরে আসার সংবাদ দিতে পারেন না। হয়তবা তিনি এটাও ভেবে থাকবেন যে, অন্যান্য সালাররা

নিজ নিজ বাহিনীকে যেন প্রস্তুত অবস্থায় রাখেন, যাতে রোমীয়রা কোনো দরজা দিয়ে পালাতে না পারে।

এটাও মনে রাখতে হবে যে, মুসলিম বাহিনী শহর প্রাচীরের একেবারে সন্নিকটে ছিলেন না। তারা কেল্লার প্রাচীর হতে কমপক্ষে এক মাইল দূরে ছিলেন। নিকটে থাকলে রোমীয়দের তীরের নাগালে চলে আসার সম্ভাবনা ছিল। এত দূর থেকে শহরের ভেতরকার শোরগোল ভালভাবে শোনার উপায় ছিল না। আর শোনা গেলে মূল কারণ জানা বা নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না।

তুমা যখন জানতে পারে যে, মুসলমানরা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তখন সে উপদেষ্টাদের তলব করে।

"কোন কোন দরজা দিয়ে মুসলমানরা ভেতরে এসেছে?" তুমা জিজ্ঞাসা করে।

"শুধু একটি দরজা দিয়ে" একজন জবাবে বলে, "শারকী দরজা দিয়ে, অন্যান্য দরজাগুলো পূর্ববৎ বন্ধ আছে।"

"কেউ কী প্রাচীরে উঠে দেখেছে?" তুমা জানতে চায় "মুসলমানদের বাকী সৈন্যরাও কী প্রাচীরের নিকটে এসে গেছে?"

"দেখেছে" সে জবাব পায় "মুসলমানদের বাকী সৈন্যরা পূর্বে যেখানে ছিল এখনও সেখানে আছে।"

"বাবে যাবিয়াকে দেখেছ?" তুমা জিজ্ঞাসা করে "আবু উবায়দার বাহিনীও কী এগিয়ে আসেনি?"

"না" তাকে জানানো হয় "সে বাহিনীও এগিয়ে আসেনি। ... এরা শুধুমাত্র তাদের সিপাহসালার খালিদ বিন ওলীদের বাহিনী।"

ইতিমধ্যে তুমার উপদেষ্টা ও সালাররা চলে আসে।

"আমরা শহর রক্ষা করতে পারব না" তুমা তাদের বলে, "আমাকে এখন পর্যন্ত কেউ জানায়নি যে, মুসলমানরা কীভাবে দরজা খুলে ভেতরে এল? ভেতর হতে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা পাবার সুযোগ ছিল না।"

"এখন এ কথা ভেবে লাভ কী যে, মুসলমানরা শহরে কীভাবে ঢুকল" এক উপদেষ্টা বলে, "যেভাবে হোক তারা ভেতরে চলে এসেছে। এখন ভাবার বিষয় হলো, এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী?"

"ঐ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা যা আমরা ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছিলাম" আরেক উপদেষ্টা বলে, "আবু উবায়দাহকে সন্ধির পয়গাম পাঠানো হোক।" আলোচ্য প্রস্তাবের উপর পক্ষে-বিপক্ষে মুক্ত আলোচনা হতে থাকে। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, আবু উবায়দা (রা.)-এর বরাবরে একজন দূত পাঠানো হবে।

"আর আমি যে বাহিনী রিজার্ভ রেখেছিলাম তাদেরকে সেদিকে পাঠানো হোক, যেদিক থেকে মুসলমানরা ভেতরে ঢুকেছে।" তুমা নির্দেশ দেয় "তাদেরকে আমার এই বার্তা জানিয়ে দেয়া হোক যে, দামেস্ক শহরের নয়; বরং আজ রোম সাম্রাজ্যের ইজ্জত তাদের হাতে। এর জন্য তারা জীবন কুরবানী করুক এবং মুসলমানদের সালার ইবনে ওলীদকে জীবন্ত অথবা মৃত আমার কাছে নিয়ে আসুক।"

হেনরী স্মিথ, আবু সাঈদ, ওকীদী এবং আল্লামা তবারী (রহ.) লিখেন, তুমা নীতিগতভাবে অস্ত্র সমর্পণ করে ফেলেছিল। কিন্তু তারপরেও সে তার রিজার্ভ বাহিনীকে এই জন্য যুদ্ধের প্রতি এগিয়ে দেয়, যাতে প্রতারণামূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যন্ত হযরত খালিদ (রা.)-কে ঠেকিয়ে রাখা যায়। তার ইহুদী ও খৃষ্টান উপদেষ্টারা সাধারণ জ্ঞানের মানুষ ছিল না। তারা ছিল যেমনি ধূর্ত তেমনি কুটবাজ।

✪✪✪

রাত যতই বাড়তে থাকে শহরের ভেতরে লড়াই ততই ব্যাপক হতে থাকে। শহরের অলি-গলিতে লড়াই চলছিল। এ লড়াইয়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর পাল্লা ভারী ছিল। রোমীয়দের রিজার্ভ বাহিনী হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য সংকট সৃষ্টি করে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) হিম্মত হারাবার মত সালার ছিলেন না। তবে নতুন সৈন্য আসায় তার অগ্রগামিতার গতি হ্রাস পেয়েছিল এই যা। এর বেশি কিছু নয়।

ওদিকে হযরত আবু উবায়দা (রা.) ফজরের নামায শেষ করলে তাকে জানানো হয় যে, রোমীয় সালারের পক্ষ হতে দুইজন দূত এসেছে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাদের ডেকে পাঠান।

"তোমাদের সালারের কী বুদ্ধি-জ্ঞান এখনও ফেরেনি?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) দূতদের বলেন, "বল, তোমরা কেন এসেছ?"

"সালার তুমার বার্তা নিয়ে এসেছি" একজন দূত বলে।

"যতক্ষণ অস্ত্র সমর্পণ না করবে আমি সন্ধি করব না" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন।

"হে আরবের দয়াবান সালার!" অপর দূত বলে, "আমরা যুদ্ধ এবং রক্তক্ষয় শেষ করার জন্য এসেছি। সিপাহসালার তুমা আমাদের এই বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, তিনি অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজি। আমরা শুধু এটুকু চাই যে, আমাদেরকে নিরাপদে শহর ত্যাগ করার সুযোগ দিবেন। শহরে লুটপাট হবে না। কাউকে হত্যা করা হবে না। প্রত্যেক শহরবাসী এবং সৈন্য নিজের সঙ্গে যে মাল-সম্পদ নিয়ে যেতে চায় তা নেয়ার অনুমতি দিবেন।"

“রোমীয়! আমরা অন্যায় রক্তপাত ঘটাতে আসিনি” হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, “খোদার কসম! আমরা আমাদের ঐ সাথীবৃন্দের রক্ত মাফ করতে পারি না, যাদের তোমরা শহীদ করেছ।”

“সম্রাট হিরাকেলের জামাতা সালার তুমা বলেছেন যে, তিনি শহীদদের খুনের বদলা আদায় করবেন” একজন দূত বলে, “আপনারা হয়ত তাকে জিযিয়া বলুন অথবা অন্য যা কিছুই বলুন না কেন।”

“আমাদের সম্রাট আল্লাহ!” হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, “তোমরা হিরাকেলকে এভাবে সম্রাট বলছ যে, যেন তিনি আমাদেরও সম্রাট আর তিনি আমাদের খয়রাত দিচ্ছেন।”

“হিরাকেল অস্ত্র সমর্পণ করলেও আমরা তাকে সম্রাটই বলব” দূত বলে “আমরা তার চাকর এবং তার নির্দেশ পালনকারী। ... আপনি কি আমাদের এবং দামেস্কের মহিলা-বাচ্চাদের উপর রহম করবেন না?”

“হে মদীনার সালার!” অপর দূত বলে, “দামেস্কের শহরবাসী প্রথম থেকে যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী ছিল। তারা অনেক আগে থেকেই সালার তুমাকে অনুরোধ জানিয়ে আসছিল যে, আপনি মদীনাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করে নিন। ইসলাম সম্পর্কে আমরা যা শুনেছি তা যদি সত্য হয় তাহলে আপনার জন্য বেশি ভাবনার প্রয়োজন নেই।”

“খোদার কসম!” হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, “যদি তোমরা আমাদের সিপাহসালার হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে যেতে, তবে তিনিও তাই বলতেন যা আমি বলছি। আমাদের কাছে যে নতি স্বীকার করে এবং আমাদের কাছে যারা সন্ধি ভিক্ষা চায়, তাদেরকে আমরা ক্ষমা করে দিই। ইসলামের নির্দেশ এমনই। যদি কেউ শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ করে এবং আমরা অস্ত্রের মুখে তাদের অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য করি, তাহলে আমরা তাকে আর ক্ষমার যোগ্য বলে মনে করি না।”

সে সময় হযরত খালিদ (রা.) শহরের পূর্ব পার্শ্বে চরম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি রোমীয় সৈন্যদের এবং ঐ যুবকদের যারা সৈন্যদের সামনে রেখে লড়ছিল তাদেরকে কচুকাটা কাটতে থাকেন। রোমীয় সৈন্যরা অন্যান্য দরজার সামনেও চলে গিয়েছিল। ফলে এভাবে বিভক্ত হওয়ার তারা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এতে করে হযরত খালিদ (রা.) অনেক লাভবান হন।

ওদিকে বাবে যাবিয়া খুলে যায় এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.) স্বীয় বাহিনীসহ তুমার দূতদের তত্ত্বাবধানে শহরের মধ্যে প্রবেশ করেন। তুমা অপর তিন দরজায় ঘোষণা করিয়ে দেন যে, সন্ধি হয়ে গেছে। রোমীয়রা যার যার মত

শহর ছেড়ে চলে যাবে। শহরে কোনো লুটতরাজ হবে না। মুসলমানরা কোনো শহরবাসীকে হত্যা করবে না। কোনো মেয়ের গায়ে কোনো মুসলমান হাত তুলবে না।

সূর্যাস্তের তখনও কিছু সময় বাকী ছিল এমন সময় হযরত আবু উবায়দা (রা.) শহরে প্রবেশ করেছিলেন। স্বয়ং তুমা সামনে এগিয়ে এসে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে স্বাগত জানায়। তুমার সঙ্গে হারবীস নামে এক সালারও ছিল। দামেস্কের প্রধান পাদ্রীও ছিল।

"হে রোমীয়রা!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) তুমা এবং হারবিসকে বলেন,

"তোমরা সৌভাগ্যবান যে, তোমরা নিজেরাই শহরকে আমাদের হাওলা করে দিয়েছ। এতে করে তোমরা নিজেদেরকে, নিজেদের সৈন্য এবং শহরবাসীকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছ। তোমরা তোমাদের মাল-সম্পদও রক্ষা করেছ। ... আর এই শোরগোল কীসের? কোথাও লড়াই চলছে কী?

"জনতা সন্ধির খুশিতে হৈ চৈ করছে" তুমা মিথ্যা বানিয়ে বলে, "ঐ দেখুন, আমার সৈন্যরা দেয়ালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের অস্ত্র মাটিতে রাখা।"

ততক্ষণে হযরত খালিদ (রা.) শহরের ঐ অংশের উপর বিজয় লাভ করেন, যেখানে রোমীয়রা দুই-তিন দল সৈন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত গতিতে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না পেয়ে বিস্মিত হন যে, শহরের অন্য সৈন্যরা তাদের মোকাবেলায় কেন আসছে না! এটাকে হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের পাতা ফাঁদ বলে মনে করেন। এই চিন্তায় তিনি সতর্ক ও সংযতভাবে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। বাইরের মুজাহিদদের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার এই ধারণা ছিল না যে, দরজা খুলে যাবে এবং তার বাকী সৈন্যরা ভেতরে চলে আসবে। হযরত খালিদ (রা.) নিজেকে নিজে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ফাঁদে আটকে পড়া অনুভব করতে থাকেন।

✪✪✪

দামেস্কের মধ্যস্থলে শহরের সবচেয়ে বড় গির্জা ছিল। তার নাম ছিল মারয়াম গির্জা। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ওদিক থেকে হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় মুহাফিজদের নিয়ে আসেন। তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে অত্যন্ত শান্ত ভাবে তুমা প্রমুখের সঙ্গে দেখে এবং তাদের তলোয়ার খাপবদ্ধ দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.) এবং তাঁর মুহাফিজদের দেখেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে ঢাল-তলোয়ার ছিল। তলোয়ার ছিল রক্তে লাল। হাতের বাট পর্যন্ত রক্তে ভরা ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ঘর্মস্নাত হয়ে গিয়েছিলেন। তার পোশাকে রক্তের অসংখ্য ছিটা এবং দাগ ছিল। তার শ্বাস ছিল ফোলা। হযরত খালিদ (রা.)-এর মুহাফিজদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। তার অবস্থাই জানান দেয় যে, তিনি লড়তে লড়তে এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন। মুহাফিজদের হাতে বর্শা ছিল, যা ছিল রক্তস্নাত, যেন তা সদ্য রক্তের মধ্য হতে উঠানো হয়েছে।

হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.) অবাক বিস্ময়ে একে অপরকে দেখতে থাকেন।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) পরিশেষে নীরবতা ভাঙ্গেন এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, "তুমি কি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে না যে, তিনি এই শহর আমাদেরকে প্রদান করেছেন? আল্লাহ তা'আলা সন্ধি বাস্তবায়ন করার তাওফিক আমাকে প্রদান করেছেন। এরা কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই আমাদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেছে। তারপরেও তুমি রক্ত নির্গত তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘুরছ! আমি তাদেরকে শহর থেকে নিজেদের মাল-সম্পদ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছি।"

"আবু উবায়দা!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "কোন সন্ধির কথা বলছ? তুমি কী দেখছ না যে, আমি লড়াই করে এই শহর জয় করেছি? খোদার কসম! রোমীয়রা আমাকে নিরাপত্তা ও সন্ধির বার্তা দিয়ে ভেতরে আসার আহ্বান জানায় নি। আমার জন্য তারা দরজা খুলেনি। আমি নিজেই সুকৌশলে ভেতরে প্রবেশ করেছি। আমি রক্ত প্রবাহিত করেছি। আমার দলের লোকদেরও রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে। আমি রোমীয়দের এই অধিকার দিতে পারি না যে, তারা নিরাপদে শহর থেকে বেরিয়ে যাবে। এই শহরে যত ধন-সম্পদ রয়েছে তা আমাদের মালে গণীমত। ... আমার মোটেও বুঝে আসছে না যে, এই সন্ধি কে করেছে এবং কেন করেছে।"

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমি এবং আমার সমুদয় সৈন্য অতি নিরাপদে শহরে প্রবেশ করেছি। দেখ, শহরের দরজা খোলা। যদি তুমি আমার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে চাও তাহলে কর কিন্তু এটা ভাব যে, আমি শত্রুদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করার শর্তে তাদের ক্ষমা করার ওয়াদা দিয়েছি। যদি এই ওয়াদা পূরণ না হয়, তাহলে রোমীয়রা বলবে যে, মুসলমানরা ওয়াদা রক্ষা করে না। এর প্রভাব ইসলামের উপরেও পড়বে।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, রাগে তাঁর ঠোঁট স্পষ্ট কাঁপছিল। তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না যে, সিপাহসালার তিনি আর সন্ধি করবে অপর কেউ। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তার কথার উপর এভাবে জিদ ধরে থাকেন যে, তিনি এর কোনো পরোয়া করেন না যে, হযরত খালিদ (রা.) খলীফার পক্ষ হতে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত ছিলেন। তুমা, তার সহকারী সালার হারবীস, পাদ্রী এবং উপদেষ্টারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। তাদের কাছে তাদের চাল সফল বলে মনে হচ্ছিল। বরং চাল আশাতীত সফল হয়েছিল। আর তা এভাবে যে, মুসলমানদের সিপাহসালার এবং তার স্থলবর্তী সালার পরস্পরে মুখোমুখী হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর স্থলে অন্য কোনো সালার হলে হযরত খালিদ (রা.) তাকে বরখাস্ত করে সাধারণ সিপাহী বানিয়ে দিতেন অথবা তাকে মদীনায় পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু এখানে ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.) যাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আমীনুল উম্মত' উপাধি দিয়েছিলেন। তাকে আল-আছরামও বলা হত। কেননা তাঁর সামনের দাঁত উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কুতাইবা এবং ওকীদী লিখেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। এটাও লেখা আছে যে, দাঁতবিহীন আবু উবায়দাকে দাঁতওয়ালা লোকদের থেকেও সুদর্শন লাগত। তাঁর যুহদ এবং তাকওয়া ছিল সর্বজনখ্যাত ও প্রবাদতুল্য। খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। মুহাজিদরা তাঁর ইশারায় জীবন কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকত। হযরত খালিদ (রা.)-এর অন্তরে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সম্মান-ভক্তি-শ্রদ্ধা এত বেশি ছিল যে, যুদ্ধের ময়দানে দু'জনের প্রথম সাক্ষাত হওয়ার সময় হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ায় আসীন ছিলেন না কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়ায় আসীন ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) যেহেতু সর্বাধিনায়ক ছিলেন, তাই হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) তাঁকে নামতে বারণ করেন এবং বলেন যে, আমার অন্তরে আপনার ভক্তি-শ্রদ্ধা বলবৎ রাখুন।

সেই হযরত আবু উবায়দা (রা.) আজ হযরত খালিদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই শত্রুদের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা বদলাতে রাজি হচ্ছেন না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সমস্ত গুণ এবং ইসলামী সমাজে তার মর্যাদাগত অবস্থান মেনে নিয়ে তৎযুগে ঘটনা বর্ণনাকারী এবং ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, সামরিক বিষয়ে তাঁর বুদ্ধি-জ্ঞান প্রখর ছিল না। সূক্ষ্ম

সূক্ষ্ম বিষয় তিনি বুঝতেন না, যদিও আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণে তিনি বিরাট যোগ্যতা ও দক্ষতা রাখতেন।

"আমি তোমাকে আমীর মানি আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "কিন্তু এটা চিন্তা কর যে, স্বীয় সৈন্যসহ আমাকে নিরাপদে শহরে আনা হয়েছে।"

"ইবনুল যাররাহ!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আসুন, আমি আপনাকে দেখাব যে, আমি কীভাবে শহরে প্রবেশ করেছি এবং রাত হতে এতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে কেমন যুদ্ধ করতে হয়েছে। এই রোমীয়রা যখন দেখেছে যে, তারা লড়াই করার মত যোগ্যতা ও শক্তি রাখে না এবং ওদিকে আমি শহরের একেকটি ইট খুলে ফেলছি, তখন তারা আপনার নিকট গেছে। আমি তাদেরকে ক্ষমা করব না।"

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "তুমি কী আল্লাহকে ভয় কর না? আমি তাদেরকে আমার নিরাপত্তায় আশ্রয় দিয়েছি। তাদের হেফাজতের ওয়াদা করেছি।"

কিন্তু তারপরেও হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু ওবায়দা (রা.)-এর কথা মানতে রাজি ছিলেন না।

"আহ্ আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) আফসুসের সঙ্গে বলেন,

"আমি যখন তাদের শর্ত শুনে তাদেরকে নিরাপত্তার ওয়াদা দিয়েছিলাম, তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না যে, তুমি আমার সিদ্ধান্ত মানবে না। আর আমার এটাও জানা ছিল না যে, তুমি যুদ্ধে লিপ্ত। আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানের আলোকে রোমীয়দের ক্ষমা করে দিয়েছি। ... বুঝ, আবু সুলাইমান! আমার কথা বুঝার চেষ্টা কর। আমাকে ওয়াদা ভঙ্গকারী বানিও না।"

উভয়ের মাঝে আলোচনা চলতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.)-এর মুহাফিজদের রাগ চড়ে যায়। তারা তলোয়ার ধারণ করে তুমা এবং তার সাথীদের দিকে তেড়ে যায়। তারা তাদেরকে হত্যা করতে চাচ্ছিল। তারা টের পেয়েছিল যে, যা কিছু হয়েছে তার সবই হলো রোমীয়দের কারসাজি। তারাই কারসাজি করে দুই সালারের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করিয়ে দিয়েছে। মুহাফিজরা তুমা ও তার সাথীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে হযরত আবু উবায়দা (রা.) দৌড়ে তাদের সামনে চলে যান।

"খবরদার!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দাও। এরা এখনও আমার আশ্রয়ে। যতক্ষণ তোমাদের নির্দেশ না দেয়া হয় তোমরা কোনো তৎপরতা চালাবে না।"

হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর এই নির্দেশও সহ্য করেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর উপস্থিতিতে হযরত আবু উবায়দা (রা.) কোনো নির্দেশ দিতে পারেন না। উদ্ভূত পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য ভাল ছিল না। একটি ভুল তো হযরত খালিদ (রা.)-এর থেকে হয়েছিল যে, তিনি রশির ফাঁদের সাহায্যে দেয়ালে উঠার মত মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেননি। অথচ তিনি ছিলেন হযরত খালিদ (রা.)-এর স্থলাভিষিক্ত সালার। হযরত খালিদ (রা.) তার এই অপারেশনের কথা অন্যান্য দরজায় অবস্থানরত সালারদেরও বলেননি। পরের ভুলটি করেছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.)। তিনি শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা ছিল একমাত্র সর্বাধিনায়কের অধিকার। সিপাহসালারের অগোচরে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অন্যান্য সালাররা নিতে পারে না।

হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর মধ্যকার এ বিবাদ তাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে যে কোনো অনাকাংখিত পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারত কিন্তু এটা ছিল তৎযুগের ঘটনা, যখন মুসলমানরা পরস্পরের কোনো ঝগড়া-বিবাদকে 'ব্যক্তিগত' রূপ দিতেন না। তাই হযরত খালিদ (রা.) পরিস্থিতির যবনিকা টানতে অন্যান্য সালারদের ডেকে পাঠান। ততক্ষণ অন্যান্য সালারের বাহিনীও শহরে এসে পৌঁছেছিল। সালাররা এলে হযরত খালিদ (রা.) নিজের এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর বিবাদের বিষয়টি তাদের সামনে পেশ করেন।

"ইবনে ওলীদ!" সালাররা পরস্পরে মত বিনিময় করে হযরত খালিদ (রা.)-কে বলে, "আবু উবায়দার এমনটি করা ঠিক হয়নি। তথাপিও তিনি যেহেতু তা করে ফেলেছেন তাই এখন আমাদের সকলের তা মান্য করা উচিত। অন্যথায় দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, মুসলমানরা ধোঁকাবাজ। সন্ধি এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেও আবার হত্যা ও লুটতরাজ চালায়।"

"ইবনে ওলীদ!" সালার হযরত শোরাহবীল বিন হাসানাহ (রা.) বলেন, "আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, কোনো কোনো শহর বিনা যুদ্ধে আমাদের হস্তগত হয়েছে। এর কারণ এই ছিল যে, সেসব শহরে আমাদের প্রবেশের পূর্বে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মুসলমানদের শর্ত কঠোর হয় না। তারা যে কোনো মূল্যে শর্ত পালন করে। তারা মহানুভবতার পরিচয় দেয়। ... ইবনে ওলীদ! আমাদের এই সুনাম ধরে রাখতে হবে। অন্যথায় এর পরে আর কোনো শহর সহজে আমাদের করতলগত হবে না।"

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.) রাগ দমন করে বলেন, "তোমরা সকলে মিলে আমাকে বাধ্য করে দিয়েছ।"

রোমীয় সালার তুমা এবং হারবীস একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা কী হয় তার অপেক্ষায় ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদের দিকে তাকালে তার রাগ আবার বেড়ে যায়।

"আমি তোমাদের সকলের ফায়সালা মেনে নিলাম" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "কিন্তু এই দুই রোমীয় সালারকে ছাড়ব না। আমি তাদের বেঁচে থাকার অধিকার দিতে পারি না।"

"তোমার উপর আল্লাহর রহম হোক ওলীদের পুত্র!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "এই দুইজনের সঙ্গেই তো আমার ওয়াদা হয়েছে এবং তাদেরকেই আমি হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছি। আমার ফায়সালা যখন তুমি মেনে নিয়েছ তখন এই দুইজনকেও যেতে দাও।"

"আপনার ওয়াদা তাদেরকে আমার হাত হতে বাঁচিয়ে দিয়েছে" হযরত খালিদ (রা.) ক্রোধকণ্ঠে বলেন, "কিন্তু এই দুইজন আল্লাহর লানত হতে বাঁচবে না।"

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন, তুমা এবং হারবীসের কাছে এক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে আরবী বুঝত এবং বলতে পারত। সে মুসলমান সালারদের কথা ও আলোচনা শুনে তা তুমা ও হারবীসকে রোমীয় ভাষায় বলে দিচ্ছিল। সর্বশেষ তাদেরকে সাধারণ ক্ষমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

"আপনারা সকলে আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন" তুমা হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, "আমাদের অনুমতি হোক যেন আমরা যেখানে ইচ্ছা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে যেতে পারি।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে তাকান, যাতে তিনি জবাব দেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) মুখ ফিরিয়ে নেন।

"তোমাদের অনুমতি দেওয়া হলো" হযরত আবু উবায়দা (রা.) তুমার জবাবে বলেন, "যে রাস্তা দিয়ে ইচ্ছা যেতে পার। কিন্তু এ কথাও শুনে রাখ যে, তোমরা যেখানে থামবে বা যেখানে অবস্থান করবে যদি সে স্থানও আমরা দখল করে নিই তাহলে আমাদের থেকে আর নিরাপত্তার আশা রাখবে না। তোমাদের সঙ্গে চুক্তি ঠিক এতটুকুই যে, তোমরা শুধু ঐ স্থান পর্যন্ত যেতে নিরাপত্তা পাবে, যেখানে তোমরা যাচ্ছ। এটা মিত্রতার চুক্তি নয়।"

"যদি চুক্তি সাময়িক হয়, তাহলে আমার আরেকটি আবেদন আছে" তুমা বলে,

"আমাদেরকে তিন দিনের সুযোগ দেওয়া হোক, যাতে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। তিন দিন পরে আমাদের মাঝে আর কোনো চুক্তি থাকবে না।"

"এরপর আমরা তোমাদের সঙ্গে যা ইচ্ছা করার অধিকার রাখব" হযরত খালিদ (রা.) গর্জে উঠে বলেন।

"আপনারা আমাদের কতলও করতে পারেন" তুমা বলে "এবং আমাদেরকে ধরে গোলামও বানাতে পারেন।"

"এটাও মঞ্জুর করা হলো" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তিন দিনের মধ্যেই কোথাও গায়েব হয়ে যেতে হবে। সেখান পর্যন্ত চলে যাবার চেষ্টা করবে, যেখানে আমরা পৌঁছব না। ... এবার আমার একটি শর্ত শোনো। ... তোমরা নিজেদের সঙ্গে মাত্র কয়েক দিনের খাদ্য-পানীয় নিতে পারবে। এর থেকে বেশি কিছু সঙ্গে নিতে পারবে না। কোনো ব্যক্তি সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাবে না।"

"না আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, "তোমার এই শর্ত ঐ চুক্তির বিরোধী যা আমি তাদের সঙ্গে করেছি। এরা সঙ্গে যত ইচ্ছা, যা ইচ্ছা মাল-সম্পদ নিয়ে যাওয়ার অধিকার আমি তাদের দিয়ে দিয়েছি।"

হযরত খালিদ (রা.) গত রাতে নিজেকে তার গোটা জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন যে, কেল্লার দেয়ালে রশির ফাঁদের সাহায্যে উপরে উঠেছিলেন। এবার হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাকে আরেকটি কঠিন পরীক্ষার মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের উপর যে কোনো শর্ত আরোপ করতে চাইলেই হযরত আবু উবায়দা (রা.) তা এই বলে বাতিল করে দিতে থাকেন যে, তিনি তুমার সঙ্গে এক বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেছেন, যা এই শর্তের বিরোধী। হযরত খালিদ (রা.)-কে বারংবার রাগ সামলাতে হচ্ছিল। এটা খুব জটিল বিষয় ছিল।

"নিয়ে যাক" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "যা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাক কিন্তু তাদের কেউ কোনো অস্ত্র নিতে পারবে না।"

"আমাদের উপর এই জুলুম করবেন না" তুমা বলে, "আমরা দীর্ঘ সফরের মুসাফির। পথিমধ্যে অন্য কোনো দুশমনও হামলা চালাতে পারে। আমাদেরকে নিরস্ত্র দেখে ডাকাতরাই আমাদের সর্বস্ব লুটে নিবে। যদি আপনারা আমাদেরকে নিরস্ত্রভাবে বের করে দিতে চান, তাহলে আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন এবং আমাদের সঙ্গে যেমন ইচ্ছা আচরণ করুন। এক দিকে যখন আমাদের প্রতি আপনাদের অনুগ্রহ সীমাহীন, অন্যদিকে এই নির্দেশ আমাদের জন্য গণহত্যার সমতুল্য যে, আমরা নিরস্ত্র হয়ে চলে যাব।"

হযরত খালিদ (রা.) দীর্ঘক্ষণ তুমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তার চেহারা বলে দিচ্ছিল যে, তিনি নিজের উপর জুলুম করছেন।

"হে রোমীয় সালার!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, সন্ধি করার জন্য তুমি আমার কাছে আসনি। ... আমি তোমাকে অস্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ারও অনুমতি দিচ্ছি কিন্তু শর্ত হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্র একটি করে অস্ত্র নিয়ে যেতে পারবে। একটি তলোয়ার অথবা একটি বর্শা অথবা একটি তীর-তূনীর অথবা একটি খঞ্জর।"

এরপরে চুক্তিনামা লেখা হয়, যার কথাগুলো ছিল নিম্নরূপ–

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম

মহামান্য মদীনার সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর তরফ হতে দামেস্কবাসীদের সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদিত হলো। এই চুক্তিবলে মুসলমানরা দামেস্ক শহরে প্রবেশ করবে। তারা এর জিম্মাদার হবে যে, শহরের লোকদের জান-মাল ও তাদের ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ করবে। এর মধ্যে তাদের ইবাদত কেন্দ্র এবং শহরের কেল্লাও অন্তর্গত। শহরবাসীকে আল্লাহ, তাঁর রসূল, সমস্ত মুসলমান এবং খলীফাতুল মুসলিমীনের পক্ষ হতে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়া হচ্ছে। তাদের সঙ্গে মুসলমানরা ততদিন সহমর্মিতা ও দয়াসুলভ আচরণ অব্যাহত রাখবে, যতদিন দামেস্কবাসী জিযিয়া দিতে থাকবে।"

জিযিয়ার পরিমাণ মাথা পিছু এক দীনার নির্ধারিত হয় এবং এর সাথে সাথে কিছু তরি-তরকারীও নির্ধারিত হয়, যা দামেস্কবাসী মুসলমানদেরকে প্রদান করবে।

✪✪✪

ঐ দৃশ্যটি মুজাহিদদের জন্য বড়ই কষ্টদায়ক ছিল যখন রোমীয় সৈন্যরা দামেস্ক ছেড়ে রওনা হয়। যেসব শহরবাসী দামেস্কে থাকতে ইচ্ছুক ছিল না, তারাও সৈন্যদের সঙ্গে চলে যাচ্ছিল। তাদের সৈন্যরা শহরবাসীদের আগলে রেখে চলছিল, যেন মুসলমানরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। রোমীয় সালার তুমাও যাচ্ছিল। তার ঐ চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল, যে চোখে তীরের অংশ বিশেষ তখনও গেঁথে ছিল। তাঁর সঙ্গে তার স্ত্রীও ছিল, যে রোম সম্রাটের কন্যা ছিল। তখনও সে অত্যন্ত সুদর্শন এবং যুবতী নারী ছিল। শাহী মাল-সম্পদ অসংখ্য ঘোড়াগাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। স্পষ্ট এটাই যে, ঐসব গাড়িতে স্বর্ণ-রৌপ্য ও অর্থের ভাণ্ডারও যাচ্ছিল।

দামেস্কের যেসব বাসিন্দারা দামেস্কে থাকা পছন্দ করছিল না, তারা নিজেদের মাল-সম্পদ ঘোড়ার গাড়ি এবং অন্যান্য গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল, যা খচ্চর টেনে নিয়ে চলছিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাজারী পণ্য এবং

বাণিজ্যিক জিনিসপত্রও যাচ্ছিল। ঐতিহাসিক বালাজুরি এবং আল্লামা ওকীদী (রহ.) লিখেন, স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতিরেকেই যে অর্থ-সম্পদ ও গৃহসামগ্রী যাচ্ছিল, তা বিশাল বিশাল ওজনের তিনশতেরও বেশি বড় বড় বাক্স ছিল। জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, এসব সম্পদ সবই ছিল হিরাকেলের। আর কেউ কেউ লিখেছেন, এগুলো ছিল বাজারী পণ্য। মানুষ দুধাল পশুও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল। সারকথা হলো, মানুষের সাথে সাথে দামেস্কের সমস্ত সম্পদ যাচ্ছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর মুজাহিদরা নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এগুলো ছিল তাদেরই মালে গণীমত; যা তাদের প্রাপ্য ও বৈধ অধিকার ছিল। বেশি আফসোস তাদের হচ্ছিল, যারা পাঁচিল টপকে ভেতরে গিয়ে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল। তাদেরও আফসোস কম ছিল না, যারা শহরের দরজা খোলার অপেক্ষায় ছিল এবং শহরে দরজা খুলতেই তাতে ঢুকে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর নিজের অবস্থা এই ছিল যে, দামেস্ক হতে রওনা হওয়া মাল-সামগ্রীর বহর দেখে রাগে-ক্ষোভে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি সাথী মুজাহিদদের দিকে তাকান। তাদের চেহারাতেও আক্ষেপ-আফসোস আর ক্ষোভের ছায়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। অনেকের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা দামেস্ক থেকে বিদায় গ্রহণকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের প্রাপ্য উদ্ধার করার জন্য ছটফট করছিল।

ঐতিহাসিক ওকীদী এবং ইবনে কুতাইবা লিখেছেন, রোমীয়দের এভাবে সব কিছু নিয়ে যেতে দেখে হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। পরিশেষে তিনি দু'হাত উপরে তুলে আকাশ পানে তাকান এবং কিছুটা উচ্চস্বরে বলেন, "হে আল্লাহ! এই মাল-সামগ্রী তোমার মুজাহিদদের ছিল। এটা তাদেরকে আবার ফিরিয়ে দিন।" এ সময় হযরত খালিদ (রা.)-এর মধ্যে প্রচণ্ড আবেগ কাজ করছিল।

✪✪✪

"মহামান্য সালার!" হযরত খালিদ (রা.) অতি নিকট হতে একটি আওয়াজ শুনতে পান– "দামেস্ক অধিকারভুক্ত হওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ।"

হযরত খালিদ (রা.) চকিত ফিরে তাকান, দেখেন ইউনুস বিন মারকিস দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে পড়ে যে, এই ব্যক্তি ঐ মেয়ের কারণে দামেস্ক বিজয় করিয়ে দিয়েছে, যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটির পিতামাতা তাকে তার সঙ্গে যেতে দেয় না।

"ইবনে মারকিস" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "দামেস্ক জয়ে তোমাকে মুবারকবাদ। এর সমুদয় কৃতিত্ব তোমার। তুমি না হলে আমরা শহরে ঢুকতে পারতাম না।"

"তবে আমি যে জন্যে নিজেকে হুমকির সম্মুখীন করেছি তা আমার ভাগ্যে জুটেনি।" ইবনে মারকিস অসহায় কণ্ঠে বলে।

"তবে কী ঐ মেয়ের পিতামাতা এখানে নেই?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"তারা চলে গেছে" ইউনুস বিন মারকিস জবাবে বলে, "আমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাকে অনুরোধ করেছিলাম যে, তোমার পিতাকে না জানিয়ে চলে এসো। আমার মহব্বত তার হৃদয়ের গভীরে ছিল। সে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু বলে, মুসলমানরা এসে গেছে যদি তারা আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, তবে তুমি কী করবে? আমি তাকে বলি, আমিও মুসলমান হয়ে গেছি। তুমি এখন নিরাপদ ...।

"মেয়েটি তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এটা কী বললে? আমি বলি, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমার এ কথা শুনতেই সে সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং সে আমাকে পূর্বের ধর্মে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। আমি তার সামনে ইসলামের ভাল দিকগুলো তুলে ধরি। তখন সে বলে, যদি তুমি পূর্বের ধর্মে ফিরে না আস, তাহলে আমার ভালবাসা ঘৃণায় বদলে যাবে। আমি বলি, ভালবাসা ধর্ম দেখে না। আমি তাকে এ কথাও বলি যে, আমি ইসলামের উপরেই থাকব। তখন মেয়েটি বলে, আমি কসম খেয়ে বলছি যে, এরপর আর কখনো আমি তোমার চেহারা দেখব না। আমি দামেস্ক থেকে চলে যাচ্ছি। এ কথা বলে সে চলে যায়।"

"তুমিও কী তার ভালবাসা ঘৃণার দ্বারা বদলে ফেলতে পার না?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"না, সম্মানিত সালার!" ইউনুস বিন মারকিস বলে "আমার মহব্বত এত ঠুনকো নয়। এই মেয়েটিকে জীবনে না পেলে আমি পাগলও হয়ে যেতে পারি। আমি আপনাকে একটি শহর উপহার দিয়েছি। এর বদলে আপনি আমাকে একটি মেয়ে দিতে পারেন না? সে আমার স্ত্রী। আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন। আপনি ইচ্ছা করলে এক প্লাটুন সৈন্য পাঠিয়ে মেয়েটিকে উঠিয়ে আনতে পারেন। আপনি বিজয়ী সালার।"

"ইবনে মারকিস!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আমরা শহর ত্যাগকারীদের থেকে একটি চুলও জোরপূর্বক নিতে পারি না।"

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন, ইউনুস ইবনে মারকিস বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের বিচারে সাধারণ কোনো লোক ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) স্বয়ং তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞও ছিলেন। এই ইউনানী যুবকের সাহায্য

না পেলে দামেস্ক বিজয় অসম্ভব না হলেও কষ্টকর ছিল অবশ্যই। এই লোকটি হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রিয়ভাজন এ কারণেও ছিল যে, সে ইসলাম কবুল করেছিল এবং যে মেয়ের ভালবাসা তাকে পাগল বানিয়ে ফেলেছিল তার আহ্বানেও সে ইসলাম ত্যাগ করেনি।

"আমি শুনেছি" ইউনুস বিন মারকিস বলে "আপনি দামেস্ক ত্যাগকারীদের তিন দিনের জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই তিন দিনের মধ্যে আপনি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারেন না?"

"না ইবনে মারকিস!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "এটা সন্ধি চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।"

"তাহলে তিন দিন পরে তো আপনি তাদের উপর আক্রমণ করতে পারেন।" ইউনুস বিন মারকিস বলে।

"তিন দিনে তারা অনেক অনেক দূর চলে যাবে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "এই দলটি খুবই দ্রুত যাবে। কেননা, তাদের কাছে ধনভাণ্ডার এবং অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদও আছে। পথিমধ্যে রোমীয়দের কেল্লা পড়বে। তারা কোনো কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে নিবে। আমি কোনো কেল্লায় এত দ্রুত হামলা করতে পারব না।"

"হে ইসলামের মহান সেনাপতি!" ইউনুস বিন মারকিস বলে "তারা সে পথে যাচ্ছে না যে পথে কেল্লা রয়েছে। আমি তাদের কেল্লা সম্পর্কে অবগত। ... আর তা হলো বাআলাবাক্ক, হিমস এবং তরাবীস। ... এই কাফেলা ইন্তেকিয়া যাচ্ছে। আমি জানি, কাফেলার সঙ্গে সালার তুমা রয়েছে। সে শহুরে লোকজন এবং সৈন্যদেরকে ইন্তেকিয়া নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তার শ্বশুর সম্রাট হিরাকেল রয়েছে। আমি সমস্ত এলাকা সম্পর্কে অবগত। ইন্তেকিয়া পৌঁছতে তিন দিনের চেয়ে বেশি সফর করতে হয়। আমি আপনাকে এমন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে পারি, যে রাস্তায় আপনার অশ্বারোহীরা দ্রুত চললে চতুর্থ দিন সকালেই ঐ কাফেলার দেখা পেয়ে যাবে।"

হযরত খালিদ (রা.) এই তথ্য পেলে তার চোখ আনন্দে ঝলমলিয়ে ওঠে। তিনি তো এমনই চাচ্ছিলেন। তার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, মুজাহিদ বাহিনীকে গণীমতের মাল ফিরিয়ে এনে দিবেন। ঐ দামেস্কবাসীদের প্রতি তার ক্ষোভ ছিল, যারা দামেস্ক হতে নিজেদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে চলে গিয়েছিল।

"আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব" ইউনুস বিন মারকিস বলে, "আমি আপনার থেকে কিছু নিব না। আমাকে শুধু আমার স্ত্রীকে পাইয়ে দিলেই হবে।"

✪✪✪

চতুর্থ দিনের প্রভাত হয়। কিন্তু তুমার কাফেলা তখনও ইন্তেকিয়া হতে অনেক দূরে ছিল। তুমার পরাজয়ের আফসোস থাকলেও পাশাপাশি সে এই কারণে খুশি ছিল যে, তার চাল সফল হয়েছে এবং সে এর সুবাদে দামেস্কবাসীকে সহায়-সম্পদসহ নিজের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। সে দিন তার কাফেলা একটি দীর্ঘ পাহাড়ী এলাকায় যাত্রা বিরতি করেছিল এবং তারা পুনরায় যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ এক দিক থেকে হাজারো অশ্বারোহী মরুঝড়ের মত আসে এবং রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এর কিছু পূর্বে রোমীয়দের উপর আরেকটি বিপদ আপতিত হয়েছিল তা ছিল প্রবল বৃষ্টি। বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল পুরো এলাকা। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে রোমীয় কাফেলার জন্য কোনো আশ্রয়স্থল ছিল না। এই বৃষ্টি ছিল আসমানী গযব। এই গযবের রেশ কাটতে না কাটতেই হাজারো অশ্বারোহীর সুরতে আরেকটি গযবের শিকার হয় তারা। সে সময় কাফেলার লোকজন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। তারা নিজ নিজ আসবাবপত্র সংগ্রহ ও তার হেফাজতে ব্যস্ত ছিল। বিশাল বিশাল ওজনের তিনশতেরও অধিক বাক্সভর্তি মাল-সম্পদ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিল। কোনো কোনো বাক্স খুলে গিয়েছিল আর তার মধ্যেকার বস্ত্র বের হয়ে পড়েছিল।

বস্ত্রপণ্য এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সে স্থানটির নাম হয়ে গিয়েছিল মারজুদ দীবাস তথা রেশমী উপত্যকা। এখানে যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় সকল ইতিহাসবিদ তার নাম দিয়েছেন 'মারজুদ দীবায যুদ্ধ'।

যে অশ্বারোহী বাহিনী ঘূর্ণিঝড় হয়ে রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। তারা ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রেরীত বাহিনী। এই হামলার বিস্তারিত বিবরণ হলো—

ইউনুস বিন মারকিস যখন হযরত খালিদ (রা.)-কে জানায় যে, সে তাদেরকে একটি সংক্ষিপ্ত পথে রোমীয়দের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, তখন হযরত খালিদ (রা.) চোখে আশার আলো দেখেন। ইউনুস বিন মারকিস এই জন্য পশ্চাদ্ধাবন ও হামলা করার জন্য উৎসাহিত করছিল যে, সে তার স্ত্রীকে বলপূর্বক হলেও নিজের সঙ্গে আনতে চাচ্ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর চিন্তা ছিল ভিন্ন। তিনি স্বীয় বাহিনীর নৈরাশ্য দেখেছিলেন, দেখেছিলেন শত্রুদেরকে নিজেদের সঙ্গে সমুদয় মালে গনীমত নিয়ে যাবার দৃশ্য।

তুমা কৌশলে তার বাহিনীর জন্য তিন দিনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়েছিল। এই তিন দিনের মধ্যে তাদের উপর আক্রমণ করার উপায় ছিল না। তিন দিনে রোমীয়দের জন্য দূরের কোনো আশ্রয়স্থলে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু ইউনুস বিন মারকিস বলে যে, কাফেলা ইন্তেকিয়া যাচ্ছে সে পথিমধ্যে তাদেরকে ধরিয়ে

দিতে পারে। তীব্র ক্ষোভ ও আফসোস হযরত খালিদ (রা.)-কে পেরেশান করেছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর ভুলের কারণে শত্রুরা সহায়-সম্পদসহ নিরাপদে চলে যাচ্ছিল। ইউনুস বিন মারকিসের নিশ্চয়তা দেয়ায় হযরত খালিদ (রা.) কাফেলার উপর হামলার প্ল্যান তৈরী করেন।

সে পরিকল্পনার অংশ হিসেবে হযরত খালিদ (রা.) সেই বাহিনীকে নির্বাচন করেন, চোরাগুপ্তা ও গেরিলা হামলার জন্য যাদের প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরা ছিল চার হাজারের এক নির্বাচিত অশ্বারোহী ইউনিট। তাদের প্রত্যেকেই ছিল জানবায এবং নির্ভীক যোদ্ধা। এই বাহিনীর পথ প্রদর্শক ছিল ইউনুস বিন মারকিস। সে এই ভেবে প্রসন্ন ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.) তার স্ত্রীকে পাইয়ে দিতে এত বড় বিশাল সমরায়োজন করছেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে ছিল অন্য বিষয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তিনি চাচ্ছিলেন, যেভাবেই হোক গনীমতের মাল ছিনিয়ে এনে মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে বন্টন করে দেওয়া।

হযরত খালিদ (রা.) তার পুরো বাহিনীকে চার অংশে ভাগ করেন। চার দলই রওনা হয়ে যায়। তাদের গতি ছিল ঝড়ের মত দ্রুত। হযরত খালিদ (রা.) চার দলের সালার এবং অশ্বারোহীদের বলে দিয়েছিলেন যে, যেই কাফেলার উপর হামলা করতে তোমরা চলেছ তা কেবল কাফেলাই নয়; বরং তারা সবাই অস্ত্রে সুসজ্জিত ও সশস্ত্র। তাদের কাছে ঘোড়া আছে। আরও আছে নিয়মিত সৈন্য, যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করতে জানে এবং তারা পিছু হটলেও সুবিন্যস্তভাবে পিছপা হয়। রণাঙ্গন হতে পলায়ন করে না।

✪✪✪

চতুর্থ দিন রোমীয় সৈন্য এবং দামেস্কবাসীদের কাফেলাটি ইস্তেকিয়া হতে কিছু দূরে থাকতেই মুষরধারার বৃষ্টি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। বৃষ্টির বিপদ যেতে না যেতেই আরেক বিপদ তাদেরকে ঘিরে ধরে। হযরত খালিদ (রা.) কর্তৃক প্রেরিত এক হাজার অশ্বারোহী তাদের উপর হামলা করে। রোমীয়রা এই দৃশ্য দেখে হয়রান হয়ে যায় যে, আক্রমণকারী এ বাহিনীর আগে আগে হযরত যাররার বিন আযওয়ার ছিলেন, যিনি পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন না এবং তার শরীরের পোশাকও খোলা ছিল। কোমর পর্যন্ত সম্পূর্ণ উলঙ্গ বা বস্ত্রহীন ছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, অতর্কিত আক্রমণে রোমীয় সালার তুমা এবং হারবীস এটা ভেবে কূল পায় না যে, মুসলমানরা এত দ্রুত কোত্থেকে এল! তাদের এ তথ্য জানা ছিল না যে, মুসলমানরা দামেস্কেরই এক লোককে গাইড হিসেবে পেয়েছিল, যে গাইডম্যান তাদেরকে এক সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত পথে নিয়ে গিয়েছিল।

'হারবীস!' তুমা বলে, "সকলকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত কর। মুসলমানরা আমাদেরকে তিন দিনের নিরাপত্তা দিয়েছিল। এই তিন দিন শেষ হয়ে গেছে।"

"দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ কর" হারবীস উচ্চস্বরে বলে, "মুসলমানদের সংখ্যা একেবারে কম। তাদের কচুকাটা করো।"

অল্প সময়ে রোমীয় সৈন্যরা বিন্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে যায়। দামেস্কবাসীদের মধ্য হতে যারা যুদ্ধ পারত তারাও মুসলমানদের রুখে দাঁড়ায়। রোমীয় সৈন্য এবং দামেস্কবাসীরা প্রবল বৃষ্টির কারণে ছত্রভঙ্গ ছিল। তাদের মাল-পত্রও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়ে ছিল। রোমীয়রা কাফেলার মহিলা ও বাচ্চাদেরকে পেছনে পাঠিয়ে দেয় এবং দেড়-দুইশতের মত লোক তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে তাদের হেফাজত করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়।

রোমীয়রা উচ্চধ্বনি দিয়ে দিয়ে লড়ছিল। নাঙ্গা যোদ্ধা হিসেবে প্রসিদ্ধ হযরত যাররার (রা.) চিরাচরিত শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করে লড়ছিলেন। যে-ই সামনে আসছিল তিনি তাকে কচুকাটা করছিলেন। কিন্তু তারপরেও রোমীয়রা যেভাবে বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিল, তাতে এই দিকটাই প্রাধান্য পাচ্ছিল যে, তারা মুসলিম অশ্বারোহীদের সমূলে বিনাশ করে ফেলবে।

ঘোরতর লড়াই জমে ওঠে। প্রায় অর্ধদিবস যাবত চলছিল ঢাল-তলোয়ারের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ইত্যবসরে এক দিক হতে হযরত খালিদ (রা.) কর্তৃক প্রেরিত এক হাজার অতিরিক্ত সৈন্য এসে যুদ্ধে যোগ দেয়। এবারের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত রাফে (রা.)। রোমীয় সালার মুসলমানদের নতুন সৈন্য এসে যোগ দেয়ায় তাদের সৈন্যদের বিন্যাস পাল্টে ফেলে। সালার চিৎকার করে করে তার সৈন্যদের বলছিল, তারা যেন নতুন বাহিনীর আক্রমণও রুখে দেয়। রোমীয়দের রণভঙ্গি এমন দূর্দান্ত ছিল যে, তার চাইলে নতুন বাহিনীর হামলাও রুখে দিতে পারত। তারা যুদ্ধের গতি বাড়িয়ে দেয়। ফলে যুদ্ধ আরও মারাত্মক রূপ নেয়। রক্তক্ষয়ও বাড়তে থাকে।

এভাবে আরও আধা ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। ইত্যবসরে আরও এক হাজার নয়া মুজাহিদ মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে এসে যোগ দেয়। এরা আসে উত্তর দিক হতে। এ বাহিনীর সালার ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুর রহমান (রা.)। এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নতুনভাবে এসে যোগ দিলে রোমীয়দের মনোবলে ভাটা পড়া শুরু করে। এই এক হাজার অশ্বারোহী যে দিক হতে আসে তা ছিল রোমীয়দের পিছু হটার রাস্তা। সেদিকে ইন্তেকিয়া শহর ছিল। মুসলমানরা এ পথও আটকে দিয়েছিল।

মসলিম বাহিনীর সংখ্যা তিন হাজারে পৌঁছে। এতে যুদ্ধের পাল্লা মুসলমানদের দিকে ঝুঁকে যায়। মুসলমানরা সর্বশক্তি দিয়ে রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। কিন্তু রোমীয়রাও ছিল নাছোড় বান্দা। তারা আক্রমণের গতি আবারো বৃদ্ধি করে। এ যুদ্ধ তাদের জন্য জীবন-মরণ যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। তাদের সমস্ত মূল্যবান সম্পদ, তাদের সন্তান, সুন্দরী যুবতী কন্যা, বোন ও স্ত্রী তাদের সঙ্গেই ছিল। এদের রেখে তারা পালানোর চিন্তাও করে না। যার ফলে তারা মরণপন লড়াই করছিল।

রোমীয়রা প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত মুসলমানদের চাপের মুখে রাখে। তাদের সালার তুমা, যার এক চোখে তীরবিদ্ধ ছিল, সেও সিপাহীদের মত লড়ছিল। হঠাৎ আরেক হাজার অশ্বারোহী বাহিনী এক দিক হতে এসে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেয়। এ বাহিনীর সালার তলোয়ার উঁচু করে নারাধ্বনি দিয়ে বলছিলেন :

انا فارس الضديد

انا خالد بن وليد

আমি পারস্য বাহিনীর মৃত্যুদূত
আমি হলাম খালিদ বিন ওলীদ।

রোমীয়রা এই নারাধ্বনি সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞাত ছিল। এই নয়া হাজারী বাহিনীর সালার ছিলেন খোদ হযরত খালিদ (রা.)। এটা ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর রণকৌশল। তিনি দূর থেকে পর্যায়ক্রমে এক হাজার করে অশ্বারোহী পাঠাতে থাকেন এবং অবশেষে নিজেই এক হাজার অশ্বারোহী নিয়ে ময়দানে আসেন। ময়দানে এসেই হযরত খালিদ খুঁজতে থাকেন রোমীয় সালার তুমা ও হারবীসকে।

কোথায় এক চক্ষুমান রোমীয়?" হযরত খালিদ (রা.) ময়দান কাঁপিয়ে বলেন, "কোথায় সে লোক যার এক চোখে মুমিনের একটি তীর গেঁথে রয়েছে?

রোমীয় সালারদের খোঁজে হযরত খালিদ (রা.) শত্রু বাহিনীর অনেক ভেতরে চলে যান। তিনি ছিলেন একাকী। তাঁর মুহাফিজদেরও খবর ছিল না যে, তিনি কোথায় হাওয়া হয়ে গেছেন।

"ইবনে আবু বকর!" হযরত খালিদ (রা.)-এর এক মুহাফিজ সালার হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-কে দেখে তাঁর কাছে যান এবং যুদ্ধের শোরগোলের মধ্যে চিৎকার করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "সর্বাধিনায়কের কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। একাই শত্রুবাহিনীর দিকে এগিয়ে গেছেন।"

"না, না" হযরত আব্দুর রহমান (রা.) উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, "ইবনে ওলীদ লাপাত্তা হতে পারেন না। আল্লাহর তলোয়ার ভূপতিত হতে পারে না।"

হযরত আব্দুর রহমান (রা.) তৎক্ষণাৎ কিছু শাহসওয়ারকে যুদ্ধ হতে বের করে আনেন এবং মুহূর্ত কালক্ষেপণ না করে ঐদিকে পা বাড়ান যেদিকে হযরত খালিদ (রা.) গিয়েছিলেন। লড়াই চলছিল ঘোরতর। দু'পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল কঠিনভাবে। এমতাবস্থায় কাউকে খুঁজে বের করা সম্ভব ছিল না। তারপরেও হযরত আব্দুর রহমান (রা.) অতিকষ্টে যুদ্ধ সারি ভেদ করে করে ভেতরে গিয়ে হযরত খালিদ (রা.)-কে খুঁজতে থাকেন। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর দেখেন যে, হযরত খালিদ (রা.) শত্রু বাহিনীর মূল অংশের মাঝে পৌঁছে গেছেন এবং তুমা ও অপর রোমীয় সালার হারবীসকে হত্যা করে ফেলেছেন। এখন চতুর্দিক হতে তাঁকে ঘিরে ফেলা রোমীয় সৈন্যদের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফলতার মুখ দেখা সম্ভবপর ছিলনা। কেননা তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা আর ওদিকে রোমীয়রা ছিল অসংখ্য। সালার হত্যার প্রতিশোধের আগুন সকলের চোখে-মুখে জ্বলছিল। যদিও হযরত খালিদ (রা.) চতুর্মুখী আক্রমণ রুখে চলছিলেন এবং রোমীয়দের যে কোনো হামলা হতে নিজেকে হিফাজত করছিলেন কিন্তু শেষমেষ রোমীয়দের হাতে তাঁর শাহাদাত বরণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। রোমীয়রা মৌমাছির মত তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। তিনি তাদের আক্রমণ রুখে দিলেও তাদের কঠিন বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না। এভাবে হযরত খালিদ (রা.) যখন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে ঠিক তখনি সেখানে পৌঁছে যান হযরত আব্দুর রহমান (রা.) তার বাহিনী নিয়ে। তারা একযোগে রোমীয়দের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে তাদের কতককে হত্যা করে হযরত খালিদ (রা.)-কে জিন্দা উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

এক পর্যায়ে যুদ্ধ এমন রূপ নেয় যে, সৈন্যবিন্যাস বহাল ছিল না। উন্মুক্ত লড়াই চলছিল, যেখানে যে যেভাবে পারছিল একাকী লড়ছিল। মুসলিম বাহিনীর দুর্বলতা বলতে এই ছিল যে, তাদের সংখ্যা কম ছিল। যার দরুন তারা রোমীয় ও দামেস্কবাসীদের বিশাল বাহিনীকে ঘেরাওয়ের আওতায় আনতে পারছিল না। তারপরেও হযরত খালিদ (রা.) কর্তৃক রোমীয়দের সালাররা নিহত হলে এতে তাদের মানসিকতার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। তাদের উচ্চাভিলাসী মনোবল ভেঙ্গে যায়। ফলে একজন দুইজন করে সৈন্যরা রণাঙ্গন হতে পালাতে শুরু করে। এলাকাটি ছিল যেমনি পাহাড়ী তেমনি দুর্গম। ফলে রোমীয়রা সহজে তার মধ্যে উধাও হয়ে যেতে থাকে এবং সকলে ইন্তেকিয়ার পথ ধরে। এভাবে আস্তে আস্তে রণাঙ্গন খালি হয়ে যায়।

হযরত খালিদ (রা.) এর নির্দেশে মহিলাদেরকে ঘেরাও করা হয়। কিছু মহিলা পালিয়ে গিয়েছিল। মহিলাদের সঙ্গে কিছু পুরুষদেরও যুদ্ধবন্দী করা হয়।

কাফেলার সঙ্গে যে মাল-সম্পদ, ধনভাণ্ডারসহ অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ ছিল তা সেখানেই পড়েছিল। এসব ছিল মুজাহিদদের মালে গনীমত।

এ সময়ে একটি দুর্ঘটনা এই ঘটে যে, ইউনুস বিন মারকিস তার স্ত্রীকে মহিলাদের মাঝে খুঁজছিল। এক সময় সে তাকে পেয়ে যায়। স্ত্রীকে দেখে সে তার কাছে ছুটে আসে। মেয়েটি পালিয়ে যেতে চায় কিন্তু পালানোর কোনো উপায় ছিল না। কেননা মেয়েদের সকলেই মুসলিম অশ্বারোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল। মেয়েটি যখন দেখে যে, তার পালানোর কোনো উপায় নেই এবং ওদিকে ইউনুস বিন মারকিস মুসলমান হয়ে গেছে; সে তাকে পেলে ধরে নিয়ে যাবে, তখন সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। বস্ত্রের অভ্যন্তরে লুকানো খঞ্জর বের করে হাতে রাখে। যখনই ইউনুস তার কাছে যায়, তখন মেয়েটি হাতের খঞ্জর তার বক্ষে আমূল বসিয়ে দেয়। মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং ইউনুস দ্রুত তার কাছে গিয়ে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

"যাও ইবনে মারকিস!" মেয়েটি বলে "আমার স্বামী মুসলমান হতে পারে না।" অতঃপর এ কথা বলেই সে মারা যায়।

মেয়েটি মারা গেলে ইউনুস ইবনে মারকিস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কেননা, সে এই মেয়েকে পাবার জন্য দামেস্ক শহরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছিল। অতঃপর এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি আত্মহত্যা করে তার মহব্বতকে খুন করে দেয়।

যুদ্ধ শেষে মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের শহীদদের লাশ এবং আহতদের উদ্ধার করে। গনীমতের মাল রোমীয়দের ঘোড়ার গাড়িতে উঠায়। মহিলা ও বাচ্চাদেরকে মৃত রোমীয়দের ঘোড়ায় চড়িয়ে দামেস্ক অভিমুখে রওনা দেয়। এটা ছিল পরের দিন সকালের ঘটনা।

যখন গনীমতের মাল জমা করা হচ্ছিল, তখন হযরত খালিদ (রা.) ধৃত মহিলাদের কাছে গিয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। এ সময়ে তিনি দেখতে পান যে, তার দিকে ইউনুস বিন মারকিস আসছে। হযরত খালিদ (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করে করেন, তোমার স্ত্রীর খোঁজ পেয়েছ?

" পেয়েছি" ইউনুস কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে "তবে জীবিত নয়। সে নিজের বুকে নিজে খঞ্জর চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে।"

"দুঃখ করো না ইবনে মারকিস!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, তুমি তার চেয়েও বেশি মূল্যবান পুরস্কারের যোগ্য। এসো, আমি তোমায় তার চেয়ে অধিক সুন্দরী স্ত্রী দিব।"

হযরত খালিদ (রা.) তাকে এক রোমীয় মহিলা দেখান। মহিলা যেমনি যুবতী ছিল, তেমনি তার সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়। তার পোশাক ছিল রেশমী এবং তার গলায় শোভা পাচ্ছিল মূল্যবান হার।

"এটা তোমার মালে গনীমত।" হযরত খালিদ (রা.) তাকে সুন্দরী এক রমণীকে দেখিয়ে বলেন, "আমি তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে দিব।"

"না মহামান্য সেনাপতি!" ইউনুস বিন মারকিস কণ্ঠে উদ্বেগ নিয়ে বলেন, "আমি তাকে বিবাহ করতে পারি না। আপনি হয়ত জানেন না যে, এই মেয়েটি হলো রোম সম্রাট হিরাকেলের কন্যা। সে তাদের সালার তুমার স্ত্রী ছিল।

"বর্তমানে সে কোনো সম্রাটের মেয়ে নয়" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এখন সে তোমার স্ত্রী হবে।"

"একে আমার অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে" ইউনুস বিন মারকিস বলে, "হিরাকেল তার মেয়েকে উদ্ধারের জন্য তার সম্রাজ্যের সকল সৈন্য সমবেত করে দামেস্কে আক্রমণ করবে। আর তা না করলেও মুক্তিপণ দিয়ে তাকে নিয়ে যাবে।"

হযরত খালিদ (রা.) নীরব হয়ে যান।

✪✪✪

পরের দিন সকালে হযরত খালিদ (রা.) দামেস্ক ফিরতে রওনা হন। তিনি খুব খুশি ছিলেন। তিনি কোনো চুক্তিভঙ্গ করা ছাড়াই স্বীয় টার্গেট পূরণ করেছিলেন।

হযরত খালেদ (রা.) দামেস্কগামী রাস্তা অর্ধেক পেরিয়ে আসতে না আসতেই ইন্তেকিয়া হতে বার-চৌদ্দ অশ্বারোহী আসে। সকলেই ছিল রোমীয়। তাদের একজনকে পদস্থ কর্মকর্তা মনে হচ্ছিল। সে লোকটি হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তাকে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

"আমি রোম সম্রাট হিরাকেলের দূত" লোকটি বলে, "আর এরা আমার বডিগার্ড। আমি নিরাপত্তার সঙ্গে এসেছি এবং এই আশা রাখি যে, আপনার পক্ষ হতেও নিরাপত্তা ও বন্ধুত্ব লাভ করব।"

"কী বার্তা এনেছ?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"রোম সম্রাট জানতে পেরেছেন যে, আপনি আমাদের সৈন্য ও দা[illegible]
হিজরতকারী কাফেলার উপর আক্রমণ করেছেন" হিরাকেলের দ[illegible]
আপনার হামলা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি [illegible]
চেয়েছেন মাত্র এবং বলেছেন, আপনি এর জন্য যত [illegible]
তা দেওয়া হবে। সম্রাট এ কথাও বলেছেন
দয়াপরবশ। আপনি যদি মুক্তিপণ না নিতে চান
এমনি এমনি দান করবেন।"

রোম সম্রাট হযরত খালিদ (রা.)-কে মহানুভব ও দয়াপরবশ শুধু খোশামোদ ও ফুলানোর জন্য বলেনি। বরং আসল কথা হলো, হযরত খালিদ (রা.) যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর জন্য মহাত্রাস হলেও যুদ্ধের বাইরের জীবনে তিনি অত্যন্ত উদার মনের অধিকারী ও মহানুভব ছিলেন।

"যদি তোমাদের সম্রাট তার মেয়েকে দান হিসেবে চায়, তাহলে তাকে দান হিসেবেই নিয়ে যাও' হযরত খালিদ (রা.) দূতকে বলেন এবং ঘোড়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন, "রোমীয়দের সম্রাট হিরাকেলের কন্যাকে তার দূতের হাতে তুলে দাও। খোদার কসম! আমি তোমাদের সকলের পক্ষ হতে তাকে দান হিসেবে ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের দরকার হিরাকেলের রাজত্ব; তার মেয়ে নয়।"

হিরাকেলের কন্যা তার পিতার দূতের সঙ্গে চলে যায়।

ইউনুস বিন মারকিস ঠিকই বলেছিল যে, হিরাকেল যে কোনো মূল্যে তার মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। হযরত খালিদ (রা.) ইউনুসকে তার নিজের অংশের মালে গণীমত হতে অগনিত পুরস্কার দিতে চান। কিন্তু ইউনুস এ প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, সে জীবনে আর বিবাহ করবে না। পরে সে নিজের জীবন ইসলাম ও জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিল। কিন্তু তার বাকী জীবন ছিল মাত্র দু'বছরের। সে ইয়ারমুক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিল।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.) মালে গণীমতসহ দামেস্ক পৌঁছলে তাঁর বাহিনী তাকে ব্যাপক গণসংবর্ধনা দেয় এবং উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তিনি সফল ও বিজয়ী বেশে ফিরে এসেছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) ফিরে এসে প্রথম কাজ এই করেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.)-এর নামে এক দীর্ঘ পত্র লিখেন। এ পত্রে তিনি তাকে দামেস্কের বিজয়ের কথা শোনান। তিনি পত্রে এ কথাও লিখেন যে, তিনি দামেস্কে কীভাবে প্রবেশ করেছিলেন এবং আবু উবায়দা কী ভুল করেছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) পত্রে বিস্তারিত লিখেন যে, তিনি কীভাবে রোমীয় কাফেলার পশ্চাতে যান এবং কীভাবে তাদের সালার তুমা ও হারবীসকে হত্যা করেন। হিরাকেলের কন্যাকে কীভাবে ফিরিয়ে দেন তাও তিনি লিখেন। মালে গণীমত সম্পর্কে লিখেন যে, এর এক পঞ্চমাংশ অচিরেই খেলাফতের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হবে।

হযরত খালিদ (রা.) বার্তাটি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩ হিজরীর ২ শা'বান আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.)-এর উদ্দেশে দূত মারফত পাঠিয়ে দেন।

দূত পত্র নিয়ে রওনা হয়ে যায়। দূত বিদায় নেয়ার কয়েক ঘন্টার মাথায় হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবুতে প্রবেশ করেন। এ

সময় তিনি ভারাক্রান্ত ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর মলিন চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করেন, কী ব্যাপার! আপনার চেহারা এমন মলিন কেন? গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে কী?

"ইবন ওলীদ?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) ধরা কণ্ঠে বলেন, "খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেছেন। বর্তমানে খলীফা হয়েছেন হযরত উমর (রা.)।"

হযরত খালিদ (রা.) হতবাক হয়ে যান এবং কিছুক্ষণ যাবত অপলক থেকে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর মুখ পানে চেয়ে থাকেন।

"কবে ইন্তেকাল করেছেন" হযরত খালিদ (রা.) ছোট আওয়াজে এভাবে জিজ্ঞাসা করেন, যেন তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

"২২ জুমাদাল উখরা!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জবাবে বলেন।

ইংরেজি তারিখ হিসেবে দিনটি ছিল ২২ আগস্ট, ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। এ হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকাল এ সময় হতে এক মাস আট দিন পূর্বে হয়েছিল।

"খবর এত দেরীতে এল কেন?" হযরত খালিদ (রা.) ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেন।

"খবর আগেই এসেছিল" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জবাবে বলেন,

"মদীনার দূত এখানে এসে দেখে যে, আমরা দামেস্ক অবরোধ করে রেখেছি। আমাদের এ অবস্থা দেখে দূত চিন্তা করেন যে, অবরোধ চলাকালে ইন্তেকালের খবরটি দেয়া হলে সৈন্যদের মাঝে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়বে এবং এতে অবরোধ কার্যক্রম শিথিল হয়ে যাবে। মদীনার দূত আমাকে শুধু এ কথা জানান যে, মদীনার সংবাদ ভাল এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে অচিরেই সাহায্য আসছে। মাত্র এক-দুইদিন থেকে দূত চলে যান এবং যাবার সময় আমাকে একটি পত্র দিয়ে যান। আমি পত্রটি পড়ি এবং ভাল মনে করি যে, আগে দামেস্ক করায়ত্ত হোক এরপর আপনাকে এবং সৈন্যদের বিষয়টি জানাব।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর উদ্দেশে লেখা নতুন খলীফার পত্রটি হযরত খালিদ (রা.)-কে দিয়ে বলেন, "এই সেই খবর, লড়াই শেষ হওয়ার আগে যা আমি আপনাকে দেয়া ভাল মনে করিনি।"

হযরত খালিদ (রা.) পত্রটি পড়তে থাকেন। হযরত উমর (রা.) কর্তৃক হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর প্রতি লেখা ছিল :

খলীফাতুল মুসলিমীন উমরের পক্ষ হতে আবু উবাইদার নামে–

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আমি তোমাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলার উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ চিরন্তন। তিনিই আমাদেরকে গোমরাহী হতে বাঁচান এবং অন্ধকারে আলোর দিশা দেখান। আমি তোমাকে খালিদ বিন ওলীদের স্থলে ওখানে থাকা সকল মুসলিম সৈন্যের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করছি। দ্রুত দায়িত্ব বুঝে নিবে। ব্যক্তিগত স্বার্থে মুসলমানদেরকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখী করবে না। সৈন্যদের সেখানে অবস্থান করাবে না, যার সম্পর্কে পূর্ব হতে খোঁজ-খবর নেয়া হয়নি। যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের কেবল তখনই পাঠাবে যখন তারা পূর্ণ সংগঠিত ও বিন্যস্ত হবে। এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিবে না যা মুমিনদের জন্য আত্মঘাতী হয়। আল্লাহপাক তোমাকে আমার পরীক্ষা এবং আমাকে তোমার পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছেন। পার্থিব লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকবে। যেন এমন না হয় যে, যে কারণে তোমার পূর্বের জন ধ্বংস হয়েছে লোভ-লালসায় পড়ে তুমিও সে কারণে ধ্বংসের সম্মুখীন হও। তুমি ভাল করেই জান যে, সে কোন কারণে তার পদমর্যাদা হারিয়েছে।"

এই পত্রের বার্তা স্পষ্ট ছিল যে, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে সর্বাধিনায়কের পদ থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন। বর্তমানে সর্বাধিনায়ক হলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.)। বরং এক মাস আট দিন পূর্ব হতেই তিনি সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন।

"আবু বকর (রা.)-এর প্রতি আল্লাহর রহমত হোক! হযরত খালিদ (রা.) পত্রটি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে ফেরত দিতে দিতে বলেন, "তিনি জীবিত থাকলে আমার পরিণতি এমন হত না!"

ঐতিহাসিক ইয়াকুবী এবং আল্লামা ওকীদী (রহ.) লিখেছেন, পত্রের বার্তায় আল্লাহর তরবারী নিম্নগামী হয়ে গিয়েছিল। সেদিন রাতে হযরত খালিদ (রা.) ঘুমুতে পারেন না। হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্মৃতি ও কথা স্মরণ করতে থাকেন এবং অশ্রু ঝরাতে থাকেন।

✪✪✪

মদীনা হতে বহু দূর দামেস্কে হযরত খালিদ (রা.) প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকালে যে রাতে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলেন তার দেড়-দুই মাস পূর্বে মদীনার আকাশে শোক ও মাতমের মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল। এর সূত্রপাত হয়েছিল এক গোসল হতে। হযরত আবু বকর (রা.) একদিন এমন অবস্থায় ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করেন, যখন তার শরীর গরম ছিল এবং ঘামে সারা দেহ সিক্ত ছিল। এ অবস্থায় গোসল করা মাত্রই তার জ্বর এসে যায়।

চিকিৎসা চলে। কিন্তু জ্বর তার শরীর কুরে কুরে খেতে থাকে। যদি এ অবস্থায় আমীরুল মুমিনীন বিশ্রাম নিতেন তাহলে হয়তবা তার জ্বরের মাত্রা কমে যেত। কিন্তু অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে লিপ্ত থাকেন।

এক বর্ণনায় এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর তাপমাত্রা অনেক বেড়ে গেলেও তিনি চিকিৎসা করান না। একবার তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাকে অনুরোধ করেন যে, ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করান।

"আমি ডাক্তারকে ডেকেছিলাম" আমীরুল মুমিনীন বলেন, "ডাক্তার বলেছিলেন, চিকিৎসা এবং বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি তাকে বলেছিলাম যে, আমি বিশ্রামে যেতে পারব না। আমাকে আমার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। অতঃপর এ কথা বলে আমি ডাক্তারকে বিদায় দিয়েছি।"

"চিকিৎসা কেন করালেন না আমীরুল মুমিনীন?"

"জীবনের শেষ স্টেশনে এসে পৌঁছে গেছি আমার বন্ধুগণ!" খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যে দায়িত্ব আমার জিম্মায় অর্পণ করেছিলেন, তার সব যদিও পূর্ণতা পায় নি, তবুও এটা আমার জন্য কম সান্ত্বনার নয় যে, আমি সেসব জিম্মাদারী আদায়ে ক্রটি করিনি। ... আমি আল্লাহর কাছে চলে যাচ্ছি।"

ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত আবু বকর (রা.) তার দুই বছর তিন মাসের খেলাফতকালে অবিশ্বাস্য কাজ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরপরই দানা বেঁধে ওঠা ধর্মান্তরিতের ফেৎনা সারা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে এটা শুধু ধর্মান্তরিতের ফেৎনা থাকলেও পরে এটা সমরশক্তির রূপ নিয়েছিল, যার মূলোৎপাটনের জন্য তার চেয়ে অধিক শক্তিধর সমরশক্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) সুচারু পরিকল্পনা এবং চৌকস রণপ্রজ্ঞার আলোকে স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদ বাহিনীকে ব্যবহার করেন এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ধর্মান্তরিতের ফেৎনা এবং এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমরশক্তিকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেন। এর ফলে যেসব গোত্র ধর্মান্তরিতের শিকার হয়েছিল তারা আবার ইসলাম গ্রহণ করে।

হযরত আবু বকর (রা.) ভবিষ্যত মুসলিম শাসক, নেতৃবৃন্দ এবং দায়িত্বশীলদের জন্য এই শিক্ষা রেখে যান যে, যদি তাদের মাঝে সত্যিকার প্রেরণা থাকে, নেতৃত্ব সঠিক হয়, ব্যক্তিস্বার্থ না থাকে এবং অপরদিকে মুজাহিদ বাহিনী যদি ময়দানে তাদের সেরা যোগ্যতাটা প্রদর্শন করতে পারে, তাহলে সৈন্যরা সংখ্যায় কম হলেও তারা কুফরী শক্তির হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে সমূলে বিনাশ করতে পারে।

ধর্মান্তরিতের ফেৎনা ছাড়াও স্থানে স্থানে বিদ্রোহ ও গোলযোগের ঘটনাও ঘটেছিল। হযরত আবু বকর (রা.) সকল নষ্টামীর মূল উৎখাত করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করেছিলেন। কোথাও গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা থাকে না। থাকে না বিদ্রোহ ও অস্থিরতার পরিবেশ। শুধু এটাই নয়, তিনি এসব পেশীশক্তি শক্ত হাতে দমন করে নজর দেন বহির্বিশ্বের দিকে। প্রবল আপত্তি ও বাধার মুখেও তিনি এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি এক সঙ্গে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি ইরান ও রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি দু'টি বাহিনীকে দুই সাম্রাজ্যের সঙ্গে টক্কর দিতে পাঠিয়ে দেন। মুজাহিদ বাহিনী ইরান শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পারস্য সাম্রাজ্যের অনেক এলাকা ও ভূখণ্ড ইসলামী সাম্রাজ্যের আওতায় এনে দেয়। ইরান সাম্রাজ্যকে তছনছ করে মুজাহিদ বাহিনী রোম সাম্রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুজাহিদ বাহিনী রোমীয় সৈন্যদের জন্য ত্রাসে পরিণত হয়। ফলে এখানেও মুজাহিদ বাহিনী রোমীয়দের হাত থেকে অনেক এলাকা ছিনিয়ে নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে দেয়।

তৎকালে ইরান সম্রাট কিসরা এবং রোম সম্রাট কায়সার নিজেদেরকে অপরাজেয় মনে করতো। মুসলিম বাহিনী প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশনা অনুসরণ করে ইসলামের উভয় দুশমনের অহংকার ধূলোয় মিশিয়ে দেয় এবং ইসলামী বাহিনীকে এক নয়াশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করে। এসব যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়মিত সৈন্যের রূপে ঢেলে সাজানো হয়।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল যে, ইসলাম এক নয়া ধর্মমতের রূপে আরব হতে সুদূর ইরান এবং সিরিয়ায় শুধু ছড়িয়ে পড়েছিল না; বরং এর সাথে সাথে এসব অঞ্চলে ইসলামী তাহযীব-তমাদ্দুন ও কৃষ্টি-কালচারও ছড়িয়ে পড়েছিল। বরং এমনটি বলাই যথার্থ যে, বিশ্বে একটি নয়া দর্শনের জন্মলাভ হয়, যাকে মানুষ 'ইসলাম' নাম দেয় এবং সে অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তোলে। ইতোপূর্বে মানুষ পারস্য ও রোমের দর্শনকেই একমাত্র তাহযীব-তমাদ্দুন মনে করত এবং সে তাহযীব ফলো করত। তাদের দর্শনের বাইরে আর কোনো দর্শন হতে পারে, তাদের কৃষ্টি-কালচারের মোকাবেলায় নতুন কোনো কালচার হতে পারে– এটা মানুষের কাছে অসম্ভব ছিল। কিন্তু ইসলাম নতুন দর্শন ও কালচার পেশ করে মানুষের ধারণাকে মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রমাণিত করে। শুধু তাই নয়, সকল ধর্মমত, কৃষ্টি-কালচার দর্শনের মোকাবিলায় ইসলামী দর্শন, ধর্মমত এবং কৃষ্টি-কালচারই হয় সর্বসেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

✪✪✪

প্রথম খলীফা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই আল্লাহর দরবারে চলে যাচ্ছেন। তৎযুগের নথিপত্র এবং ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় যে, মৃত্যুকালে শুধু একটি বিষয় তাকে পেরেশান করছিল। আর তা ছিল তার উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন। তিনি তার বন্ধু মহলের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

"মৃত্যু আমার নবীজীকে এই সুযোগ দেয় নি যে, তিনি নিজে কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে যাবেন" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "এর ফলে এটা ঘটেছিল যে, সাকীফায়ে বনূ মায়েদায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে মতান্তরের ভিত্তিতে ফেৎনা-ফাসাদের সূচনা হয়েছিল। যেহেতু আল্লাহ পাকের এটা মঞ্জুরি ছিল না নবীজীর অসংখ্য উম্মত এখনই গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাক, তাই আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর ঐক্যকে আমার হাতে কায়েম রাখেন। আল্লাহর কসম! আমি নবীজীর উম্মতকে এই ফেৎনায় লিপ্ত রেখে মরব না যে, তারা আমার পরে কে খলীফা হবে এই প্রশ্নে বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং মুসলিম ঐক্যে ফাটল ও অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। আমি খলীফা নিজেই নিযুক্ত করে জনগণকে আল্লাহর হাতে সোর্পদ করব।"

মুসলিম জাতির জন্য এটা বড় কল্যাণকামিতা ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফার বিষয়ে আগেই চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক এবং জ্ঞানীজনেরা লিখেন, প্রথম খলীফা চিন্তা করেছিলেন যে, গোত্রগত ও ব্যক্তিগতভাবে যখন কারো মধ্যে নেতৃত্বের স্পৃহা জাগে, তখন জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরে। সৈন্যদের অগ্রগামিতা পশ্চাদমুখিতায় রূপ নেয়। পলায়নপর শত্রু ঘুরে দাঁড়ায়। তখন সৈন্যরা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে ব্যবহৃত হয় এবং কমাণ্ডাররা বাদশাহগিরির স্বপ্ন দেখতে থাকে।

মুসলমানরা সে যুগে একের পর এক বিজয় লাভ করে চলছিল এবং তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পূর্ণতা লাভ করেছিল। পুরাতন ইতিহাস ভেঙ্গে নতুন ইতিহাস গড়ছিল। এসব বিষয় ইসলামী ইতিহাসের ভিত্তিরূপ পরিগ্রহ করেছিল। হযরত আবু বকর (রা.) দূরদর্শীতার দ্বারা দেখেছিলেন, যে কিসরা ও কায়সার পিছপা এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে তারা মুসলমানদের অনৈক্য দ্বারা ফায়দা হাসিল করবে এবং দানবের রূপ ধারণ করে ইসলামকে গিলে ফেলবে।

"জনগণ উমরকে মেনে নিবে কি?" হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের বলেন, "হয়ত মেনে না নিতেও পারে। কেননা উমর অত্যন্ত কঠোর মেজাজের লোক! ... তাই এ ব্যাপারে বন্ধু মহলের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।"

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)-কে তলব করেন এবং তাঁর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন।

"ইবনে আউফ!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "তুমি কি আমাকে তোমার মনের সঠিক কথাটা বলবে যে, উমর বিন খাত্তাব কেমন লোক?

আমি জানি না।"

"তুমি যতটুকু জান, বল" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন।

"রসূলের খলীফা!" হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) বলেন, "আমাদের মধ্যে সব থেকে ভাল হলেন উমর বিন খাত্তাব এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কথা হচ্ছে, তার মেজাজ একটু গরম। এমন গরম মেজাজী আমাদের মধ্যে আর কেউ নেই।"

"আমারও মত তাই ইবনে আউফ!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "উমরের কঠোরতা তোমাদের এই কারণে বেশি অনুভূত হয় যে, আমার মেজাজটা অনেক নরম তাই। এমন কী হবে না যে, যদি আমি তার কাঁধে খেলাফতের দায়িত্ব তুলে দিই তাহলে তার কঠোরতা কমে যাবে? ... আমার ধারণা, এমনটিই হবে। তুমি কী খেয়াল করনি যে, আমি কারো ব্যাপারে কঠোরতা করলে উমর তার সঙ্গে নম্র আচরণ করে? এমনিভাবে ভুলে অথবা ত্রুটি হেতু আমি কারো সঙ্গে নম্র আচরণ করলে উমর তার উপর কঠোরতা করে? এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সে বোঝে যে, কখন কঠোরতা করতে হয় আর কখন নরম হতে হয়।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, ঘটনা এমনই হয়" হযরত ইবনে আউফ (রা.) বলেন, "রসূলের খলীফা! আপন একশত ভাগ ঠিকই বলেছেন।"

সতর্ক থাকবে আবু মুহাম্মাদ (আব্দুর রহমান বিন আউফ)!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "আমার ও তোমার মাঝে যেসব কথাবার্তা হলো, তা যেন আর কেউ না জানে।"

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) চলে গেলে আমীরুল মুমিনীন তাঁর আরেক বন্ধু ও পরামর্শদাতা হযরত উসমান (রা.)-কে ডেকে পাঠান।

"আবু আব্দুল্লাহ!" আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, "তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তুমি কী বলতে পার উমর বিন খাত্তাব কেমন লোক?

"আমীরুল মুমিনীন!" হযরত উসমান (রা.) জবাবে বলেন, "খোদার কসম! ইবনে খাত্তাবকে তো আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন, তারপরেও আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"এই জন্য যে, আমি স্বীয় মত নবীজীর উম্মতের উপর চাপিয়ে দিতে চাই না" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "আমি তোমার মতামত অবশ্যই নিব।"

"আমীরুল মুমিনীন!" হযরত উসমান (রা.) বলেন, "উমরের ভেতরটা বাহির থেকে অনেক ভাল এবং যে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা তার মাঝে আছে তা আমাদের আর কারো মধ্যে নেই।"

"আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দাও আবু আব্দুল্লাহ!" হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, "যদি আমি আমার পরে খেলাফতের দায়িত্ব উমরের কাঁধে সোপর্দ করি, তবুও কী তুমি মনে কর যে, সে তোমাদের উপর কঠোরতা করবে?"

"ইবনে খাত্তাব যা কিছুই করুক না কেন আমরা তার আনুগত্যে ভাটা পড়তে দিব না" হযরত উসমান (রা.) বলেন।

"আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তোমার উপর রহম ও করম করুন!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "আমি তোমাকে যা বললাম এবং তুমি আমাকে যা বলেছ তা তৃতীয় অপর কাউকে জানাবে না।"

✪✪✪

হযরত আবু বকর (রা.) এভাবে আরও কয়েকজন সাহাবী হতে হযরত উমর (রা.)-এর ব্যাপারে পরামর্শ ও অভিমত চান। তাদের মধ্যে মুহাজিরও ছিলেন, আনসারও ছিলেন। আবু বকর (রা.) প্রত্যেককে অনুরোধ করেছিলেন, যেন বিষয়টি কাউকে না বলেন। কিন্তু বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনের সঙ্গে আলাপ করেন। বিষয়টি ছিল পরবর্তী খলীফা নির্বাচন সম্পর্কীয় আর সাহাবায়ে কেরামের জন্য কৌতুহলের বিষয় ছিল যে, আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে পরবর্তী খলীফা বানাতে যাচ্ছেন। হযরত উমর (রা.) কঠোর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠোর হত এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতেন।

সাহাবায়ে কেরাম একটি প্রতিনিধি দল এই উদ্দেশ্যে গঠন করেন যে, তারা যে কোনোভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ বিষয়ে সম্মত করবেন, যেন তিনি হযরত উমর (রা.)-কে খলীফা না বানান। যখন এ প্রতিনিধি দলটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে যান তখন তিনি শায়িত ছিলেন। জ্বর তাঁকে এত দুর্বল করে ফেলেছিল যে, নিজের শক্তিতে উঠে বসার ক্ষমতাও তার ছিল না।

"আমীরুল মুমিনীন!" প্রতিনিধি দলপতি বলেন, "খোদার কসম! উমর খলীফা হতে পারেন না। আপনি যদি তাকে খলীফা বানান, তাহলে আল্লাহর দরবারে আপনাকে কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে। আপনি খলীফা হওয়া

সত্ত্বেও আপনার উপস্থিতিতে তিনি সবাইকে ধমকান এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করেন। এখন যদি তিনি নিজেই খলীফা হয়ে যান তাহলে তাঁর আচরণ সম্পূর্ণ জালেম শাসকের মত হবে।"

হযরত আবু বকর (রা.) রেগে যান। তিনি উঠে বসার চেষ্টা করেন কিন্তু উঠতে পারেন না।

"আমাকে বসাও!" তিনি ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলেন।

তাঁকে উঠিয়ে ঠেস দিয়ে বসানো হয়।

"তোমরা আমাকে আল্লাহর জবাবদিহিতা এবং তার ক্রোধের ভয় দেখাতে এসেছ?" হযরত আবু বকর (রা.) ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কাঁপা আওয়াজে বলেন, "আমি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে বলব, ওগো আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বান্দার কাঁধে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছি। ... আর আমি যা বলেছি, তা সমস্ত জনতাকে শুনিয়ে দাও। আমি উমরকে খলীফা নিযুক্ত করেছি।"

যারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ফায়সালা পরিবর্তনের জন্য গিয়েছিলেন তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কথায় চুপ হয়ে যান এবং এটা ভেবে অনুতপ্ত হন যে, আমরা আমীরুল মুমিনীনকে অসুস্থ অবস্থায় অযথা কষ্ট দিয়েছি। তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

এ ঘটনার পূর্বের দিন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে ডেকে পাঠান। তিনি আমীরুল মুমিনীনের লিপিকার ছিলেন। "আবু আব্দুল্লাহ!" হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, "আমি যা বলি তা লিখুন।" তিনি লিখেন–

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম

এটি একটি ওসিয়তনামা যা আবু বকর বিন আবু কুহাফা এখন লিখাচ্ছেন। যখন মানুষ দুনিয়া হতে বিদায় নেয় তখন সে সত্য ছাড়া বলে না। আমিও মুমূর্ষু অবস্থায় বলছি, আমি আমার ইন্তেকালের পরে হযরত উমরকে খলীফা নিযুক্ত করছি। তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের সকলের উপর ফরজ। আমি তোমাদের কল্যাণকামিতায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি হতে দিইনি। উমর যদি তোমাদের উপর কঠোরতা করে এবং ন্যায়-ইনসাফ না করে তাহলে সে প্রত্যেক ব্যক্তির মত আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। আমার আশা, নিশ্চয় সে ন্যায়-ইনসাফের আঁচল ছাড়বে না। আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে তোমাদের কল্যাণ ও উন্নতি ছাড়া আর কিছু ভাবিনি।"

ওসিয়তটি লিখতে লিখতে হযরত আবু বকর (রা.) বেহুঁশ হয়ে যান। তিনি এ পর্যন্ত লিখেন যে, "আমি আমার ইন্তেকালের পরে উমর বিন খাত্তাবকে ...।" এরপর তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। হযরত উসমান (রা.) নিজেই কথাটির বাকী অংশ পরিপূর্ণ করেন, "তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করছি। তোমাদের সকলের উপর ফরজ হল তার আনুগত্য করা। আমি তোমাদের কল্যাণ ও স্বার্থে কোনো ত্রুটি করিনি।"

একটু পরে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হুঁশ ফিরে আসে।

"আবু আব্দুল্লাহ!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "পড় যা আমি লিখিয়েছি।"

হযরত উসমান (রা.) ওসিয়তনামা পড়ে শোনান।

"আল্লাহ আকবার!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "খোদার কসম! চিন্তা করে যা তুমি লিখেছ সে চিন্তা ভুল ছিল না। তুমি তো এই চিন্তায় বাক্য পরিপূর্ণ করেছ যে, আমি যদি বেহুঁশ অবস্থা ইন্তেকাল করে যাই, তাহলে অপূর্ণ ওসিয়ত খেলাফতের ব্যাপারে ঝগড়ার কারণ হয়ে দেখা দিবে।"

"নিঃসন্দেহে আমীরুল মুমিনীন!" হযরত উসমান (রা.) বলেন, "আমি এটাই চিন্তা করে বাক্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।"

"আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিন" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ হতে লেখা শব্দ পরিবর্তন করেন না এবং ওসিয়তনামা পূর্ণাঙ্গভাবে লেখান।

"আমাকে ধরে মসজিদের দরজা পর্যন্ত নিয়ে চলো" আমীরুল মুমিনীন বলেন।

তাঁর বাড়ির একটি দরজা মসজিদমুখী ছিল। সে দরজা খোলা হয়। নামাযের সময় ছিল। অনেক লোকজন মসজিদে এসেছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) তাঁকে দুই হাত দ্বারা ভর দিয়ে মসজিদ সংলগ্ন দরজা পর্যন্ত নিয়ে যান। উপস্থিত মুসল্লীবৃন্দ তাঁকে দেখে তাঁর দিকে মুখ করেন।

"আমার ভাইয়েরা!" হযরত আবু বকর (রা.) চরম দুর্বলতা সত্ত্বেও উচ্চ আওয়াজে বলার চেষ্টা করে বলেন, "আমি যাকে খলীফা বানাব আপনারা তাকে মেনে নিবেন? আমি এ ব্যাপারে শুধু আপনাদের স্বার্থ দেখেছি। আমার কোনো আত্মীয়কে খলীফা নিযুক্ত করিনি। আমার পরে খলীফা হবেন হযরত উমর (রা.)। আপনারা সকলে তাকে মেনে নিবেন কী এবং তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্য করবেন?"

"জি হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন!" সমস্বরে আওয়াজ ভেসে আসে "আমরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর আনুগত্য করব।"

এরপরে হযরত আবু বকর (রা.) ওসিয়তের উপর মোহর মেরে দেন।

✪✪✪

হযরত আবু বকর (রা.)-এর পেশা ছিল বাণিজ্য। কিন্তু খেলাফতের দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়ায় ব্যবসার প্রতি মনোনিবেশ করার ফুরসৎ হয় না। তাই বলে পরিবারের ভরণ-পোষণ তো চাই। এ জন্য তিনি শুধু নিজ পরিবারের সাংসারিক খরচ হিসেবে বায়তুল মাল হতে কিছু ভাতা নিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের প্রান্তে এসে যখন তার অনুভব হয় যে, আর বাঁচবেন না, তখন পরিবারের লোকদের বলে যান যে, তাঁর নামে যে সামান্য জমি আছে, তা তাঁর ইন্তেকালের পরে বিক্রি করে সমুদয় অর্থ এতদিন তিনি বায়তুল মাল হতে যে ভাতা নিয়েছেন তার বদলে বায়তুল মালে জমা করে দিবে।

"সকলে আমার কাছাকাছি আস" হযরত আবু বকর (রা.) জীবন সায়াহ্নে এসে পরিবারবর্গকে ডেকে বলেন, "আমাকে মাত্র দু'টি কাপড়ে কাফন দিবে। তোমরা দেখে আসছ যে, আমি একটি কাপড় পরিধান করি। এর সঙ্গে আরেকটি কাপড় মিলিয়ে নিবে। এ দু'টি কাপড় প্রথমে ধুয়ে নিবে।"

"আমরা তিনটি নতুন কাপড় নিতে পারি" হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "কাফন তিন কাপড়ে হয়ে থাকে।"

"না প্রিয় কন্যা!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "মৃতকে কাফন তো এ কারণে পরানো হয়, যাতে তার শরীর থেকে কোনো নাপাক বের হলে কাফন তা চুষে নিবে। কাফন পুরানো কাপড়ের হলে দোষ কি? নতুন কাপড় পরিধান করার অধিক হকদার জীবিত লোকেরা। ... আমার গোসল দিবে আসমা বিনতে উমাইস (তাঁর স্ত্রী)। যদি সে একা গোসল না দিতে পারে তাহলে সে নিজের ছেলেকে সঙ্গে নিবে।"

ইত্যবসরে খবর দেয়া হয় যে, ইরাক যুদ্ধক্ষেত্র হতে মুসান্না বিন হারেসা এসেছেন। পরিবারের একজন বলেন, আমীরুল মুমিনীন এখন কথা বলার যোগ্য নন।

"না!" আমীরুল মুমিনীন কিছুটা শক্ত কণ্ঠে বলেন, "তাকে আসতে দাও। সে অনেক দূর হতে এসেছে। যতক্ষণ আমার শ্বাস-প্রশ্বাস চলে ততক্ষণ আমি দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করতে পারি না।"

হযরত মুসান্নাকে ভেতরে ডেকে নেয়া হয়। তিনি যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাজুক অবস্থা দেখেন তখন লজ্জিত হন এবং কথা বাড়াতে দ্বিধা করতে থাকেন।

"আমাকে গুনাহগার বানিও না ইবনে হারেসা!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "হতে পারে তুমি সাহায্য নিতে এসেছ। যদি আমি তোমার জন্য কিছু করতে না পারি তাহলে আল্লাহর দরবারে কী জবাব দিব?"

"হে আমীরুল মুমিনীন!" মুসান্না বিন হারেসা বলেন, "রণাঙ্গন আমাদের অনুকূলে আছে। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু সংখ্যার স্বল্পতা আমাদের উদ্বিগ্ন করে। বর্তমানে সেখানকার মুসলমান এত পরিমাণ নেই যে, তাদেরকে ফৌজে শামিল করে রণাঙ্গনে পাঠাব। যারা জিহাদের যোগ্য ছিল তারা পূর্ব হতেই রণাঙ্গনে আছে। আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশে সেসব লোকদেরকে মুজাহিদদের কাতারে দাঁড় করানো যায় না, যারা মুরতাদ হয়ে গেছে। আমি এ অনুরোধ নিয়ে এসেছি যে, তাদের অনেকে এমন আছে যারা খাঁটি মনে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং রণাঙ্গনে যেতে চায়। আমীরুল মুমিনীন কি তাদের ফৌজে শামিল হওয়ার অনুমতি দিবেন?"

"ইবনে খাত্তাবকে ডাক" আমীরুল মুমিনীন বলেন।

হযরত উমর (রা.) বেশি দূরে ছিলেন না, জলদি আসেন।

"ইবনে খাত্তাব!" আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, "ইবনে হারেসা মদদ চাইতে এসেছে। সে যা বলে তাই কর এবং তাকে এখনিই মদদ সহকারে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দাও। ... যদি আমি এরই মধ্যে বিদায় হয়ে যাই, তাহলে এ কাজে বাধা সৃষ্টি করবে না।"

✪✪✪

আরবদের রীতি ছিল কাব্যাকারে কথা বলা। হযরত আবু বকর (রা.)-এর অন্তিম সময়ের কিছু কথা ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.) পিতার সন্নিকটেই বসা ছিলেন। তিনি পিতার অন্তিম অবস্থা দেখে তখন কবি হাতেমের একটি কবিতা পড়েন :

"মানুষের জীবনে এক সময় অন্তিম মুহূর্ত আসবে। তখন শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক চলাচল না করায় বুকে চাপ সৃষ্টি হয়। এ সময়ে মানুষের ধন-দৌলত কোনো কাজে আসে না।"

"না কন্যা!" হযরত আবু বকর (রা.) ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, "ধন-দৌলত দিয়ে আমি কী করব? এই শের না পড়ে তুমি ঐ আয়াত কেন পড়ছ না, যাতে বলা হয়েছে :

"তোমার উপর অন্তিম মুহূর্তের লক্ষণ শুরু হয়েছে। এটাই সে সময়, যাকে তুমি ভয় করতে।"

হযরত আবু বকর (রা.)-এর জবান হতে এই কথা বের হওয়ার সময় তাঁর শেষ নাভিশ্বাস আসে। তখন তিনি আস্তে আস্তে এই দোয়া করেন, "হে আল্লাহ! মুসলমান হিসেবে আমাকে দুনিয়া হতে তুলে নেন এবং মৃত্যুর পর আমাকে নেককারদের অন্তর্গত করুন।" এটা ছিল প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর শেষ উচ্চারণ। দিন অস্ত গিয়েছিল। সূর্য ডুবে গিয়েছিল। এটা ছিল ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ আগস্ট মোতাবেক ১৩ হিজরীর ২১ জুমাদাল উখরার ঘটনা।

সে রাতেই তাঁকে দাফন করার ফায়সালা হয়। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ওসিয়ত অনুযায়ী তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তাঁকে গোসল দেন। তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান লাশের গায়ে পানি ঢালতে থাকেন এবং আব্দুর রহমানের মাতা গোসল করাতে থাকেন।

গোসল শেষে ঐ খাটিয়া আনা হয়, যাতে উঠিয়ে নবীজীর দেহ মোবারক কবর পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছিল। সেই খাটিয়ায় করে হযরত আবু বকর (রা.)-এর জানাযা উঠানো হয় এবং জানাযা মসজিদে নববীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা এবং মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যখানে রাখা হয়। হযরত উমর (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান।

মদীনার সে রাতটি ছিল শোকাভিভূত। মদীনার অলি-গলিতে মানুষের চাপা কান্না শোনা যাচ্ছিল। মানুষের সঙ্গে রাতও যেন কাঁদছিল। কেননা, সেই মহোত্তম ব্যক্তির দুনিয়া হতে চিরবিদায় ঘটেছে, যিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ কেবল মজবুতই করেননি; বরং সে ভিত্তির উপর সুদৃঢ় ভবন স্থাপন করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পার্শ্বে দাফন ও সমাহিত করা হয়। কবর এভাবে খনন করা হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাথা নবীজীর কাঁধ বরাবর ছিল। এভাবে নবীজী ও আবু বকরের মাঝে পরস্পরের জীবদ্দশায় যে হৃদ্যতা ও সখ্যতা ছিল তা তাঁদের মৃত্যুর পরেও বলবৎ থাকে। হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি সকলের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

✪ ✪ ✪

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর খলীফা হন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)। তিনি স্বীয় খেলাফতের প্রথম দিন সর্বপ্রথম যে হুকুমনামা জারী করেন, তা ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর অপসারণ। তিনি লিখিত পত্র হযরত

আবু উবায়দা (রা.)-এর নামে এক দূতের হাতে পাঠিয়ে দেন। এ নয়া হুকুমনামার প্রেক্ষিতে হযরত খালিদ (রা.) আর প্রধান সেনাপতি বা সর্বাধিনায়ক ছিলেন না; বরং তাকে প্রধান সেনাপতির অধীনে সাধারণ সালার বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাঁর জন্য নতুন কোনো বিজিত এলাকার শাসনকর্তা ও আমীর হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

হযরত উমর (রা.) মদীনায় তার খেলাফত কালের দ্বিতীয় দিন মসজিদে নববীতে নামাযের ইমামতি করেন এবং খলীফা হিসেবে সর্বপ্রথম ভাষণ দেন। তিনি সর্বপ্রথম যে কথা বলেন তা হলো "জাতি ঐ উটের মত, যে তার মালিকের পেছনে পেছনে চলে। তাকে যেখানে বসানো হয় সে তথায় বসে মালিকের অপেক্ষায় থাকে। কাবার রবের কসম! আমি আপনাদেরকে সীরাতে মুস্তাকিমের উপর চালাব।" তিনি উক্ত ভাষণে আরও অনেক কিছু বলে পরিশেষে বলেন, "আমি খালিদ বিন ওলীদকে তার পদ থেকে অপসারণ করেছি এবং তার স্থলে এখন আবু উবায়দা সমস্ত সৈন্যের সর্বাধিনায়ক ও সিরিয়ার বিজিত সকল এলাকার আমীর।"

হযরত উমর (রা.)-এর এ শেষ কথায় মসজিদে উপস্থিত সকলের চেহারার রং পাল্টে যায়। কারো কারো চেহারায় আক্ষেপ এবং কতকের চেহারায় ক্রোধের ভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিল। জনতা একে অপরের দিকে তাকাতাকি করতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.)-এর বিজয় কোনো সামান্য ও সাধারণ বিষয় ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রত্যেকটি বিজয় এবং কৃতিত্ব মসজিদে বর্ণনা করে শোনাতেন। এভাবে এ খবর সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ত। হযরত খালিদ (রা.)-এর বেশিরভাগ বিজয় ছিল অলৌকিক কিসিম। এভাবে হযরত খালিদ (রা.) সকলের দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) খলীফা হয়েই তাকে বরখাস্ত করেন।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল প্রত্যেক শ্রোতা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে জানতে চাচ্ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর অপরাধটা কী? যার কারণে তাকে এত কঠোর শাস্তি দেয়া হলো। কিছু লোকের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা এ ব্যাপারে কারণ জিজ্ঞাসা ছাড়াই হযরত উমর (রা.)-এর ফায়সালার বিরোধিতা করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু কারো মধ্যে এই দুঃসাহস ছিল না যে, তিনি এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা.)-এর মুখোমুখী হবেন। কারণ সকলেরই জানা ছিল যে, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত নরম মেজাজের নন এবং তার স্বভাব এত কঠোর যে, যা অনেক সময় সহ্যের বাইরে হয়। কিন্তু তারপরেও হযরত খালিদ (রা.)-এর গোত্র বনু মাখযুমের এক যুবক প্রতিবাদ জানায়। ইতিহাসে তার নাম আসে নি। শুধু এতটুকু পাওয়া যায় যে, তখনও সে যুবকের দাড়ি-মোচ পুরোপুরি উঠেনি।

"আমীরুল মুমিনীন!" যুবকটি খুবই উচ্চ আওয়াজে বলে, "আপনার জন্য কি সেই সালারকে বরখাস্ত করা সাজে, যিনি ইসলামের নাঙ্গা তলোয়ার? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইবনে ওলীদকে 'সাইফুল্লাহ' বলেননি? আপনি সেই তলোয়ারকে জোর পূর্বক খাঁপে পুরতে চাচ্ছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য কোষমুক্ত করেছেন! ... কেন? আপনি তাকে কেন অপসারণ করতে চান?"

হযরত উমরের মত কঠোর মানুষের কাছে কেউ এভাবে কৈফয়ত চাইতে পারে কি? হযরত উমরকে এমনিতেই সকলে ভয় করতেন। আর এখন তো তিনি খলীফা। ঐ যুবক যেভাবে তিক্ত কণ্ঠে কৈফিয়ত চায় তা হযরত উমর (রা.)-এর জন্য সহনীয় ছিল না। ফলে মসজিদে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। সকলের দৃষ্টি হযরত উমর (রা.)-এর প্রতি নিবদ্ধ ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর চেহারায় রাগ কিংবা ক্রোধের হাল্কা চিহ্নও ছিল না।

"ছেলেটি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছে" হযরত উমর (রা.) কথাটি এমন কণ্ঠে বলেন যে, তাতে হাল্কা রাগের মিশ্রণও ছিল না। ক্ষোভও ছিল না। তিনি আরও বলেন, "আমি তাকে চিনি। ইবনে ওলীদের চাচাত ভাই।" এতটুকু বলে হযরত উমর (রা.) মসজিদ হতে বেরিয়ে যান।

হযরত উমর (রা.) যদি খলীফা না হতেন, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হত। কিন্তু তিনি জানতেন, ইসলাম জাতির প্রতিটি সদস্য চাই সে যে মাপেরই হোক না কেন খলীফা এবং তার যে কোনো আমীরের নিকট জবাবদিহি চাইতে পারে।

✪✪✪

পরের দিন হযরত উমর (রা.) নামায পড়ান এবং আবার ভাষণ দেন। তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর অপসারণের কারণ ব্যাখ্যা করা জরুরী মনে করেন।

"আল্লাহ ও জাতির সামনে আমাকে আমার কাজের জবাবদিহি করতে হবে" হযরত উমর (রা.) বলেন, "আমি ইবনে ওলীদকে ব্যক্তিগত কোনো রেষারেষি কিংবা ভিত্তিহীন অভিযোগে অপসারণ করিনি। তিনি আমীর শ্রেণীর লোক। তিনি শান-শওকত ও স্বচ্ছলতার মাঝে প্রতিপালিত হয়েছেন। তাই এখনও তার অভ্যাস রয়ে গেছে আমীর জাতীয়। তিনি কবিদের বিরাট সমাদর করে তাদের দামী দামী উপহার দেন। অর্থ-সম্পদ অপচয় করেন। এসব অর্থ হয়ত বায়তুল মালে জমা হওয়ার দরকার ছিল অথবা সাহায্যপ্রার্থীদের ঘরে পৌঁছানোর প্রয়োজন ছিল। তিনি পালোয়ান, বীরযোদ্ধা এবং তীরন্দাযদেরও পুরস্কৃত করেন। ...

আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত আমলে আমাকে জানানো হয়েছিল যে, ইবনে ওলীদ আশয়াছ ইবনে কায়েসকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছেন। যদি তিনি এই অর্থ গনীমতের মাল হতে দেন, তাহলে এটা মারাত্মক খেয়ানত। আর যদি নিজের সম্পদ হতে দেন, তবুও এটা অর্থ অপচয়ের শামিল। ইসলাম এমন সৌখিনতা ও অপব্যয়ের অনুমতি দেয় না। ... আমি প্রথম খলীফাকে যে পরামর্শ দিতাম, তা নিজে কেন কার্যকর করব না?"

হযরত উমর (রা.)-এর কথায় জনতা চুপ থাকলেও, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ এমন ছিলেন, যারা হযরত খালিদ (রা.)-এর অপসারণকে 'অতিমাত্রায় শাস্তি' এবং 'জুলুমাত্মক' অভিহিত করেন।

ঐতিহাসিকগণ এ তথ্য পর্যন্ত সবাই একমত যে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে তার অপব্যয়ের কারণে অপসারণ করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু মতানৈক্যও পাওয়া যায়। কতক এ অপসারণের অন্য কিছু কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, হযরত খালিদ (রা.)-এর চাল-চলন অনেকটা ছিল শাহী ধরনের। তিনি বিভিন্ন ভূখণ্ডের আমীর ছিলেন। কিন্তু তার হাবভাব ছিল অনেকটা খলীফার মত। চাইলে যে কাউকে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দিয়ে দিতেন। দরিদ্র ও অন্যান্য হকদারদের প্রতি খেয়াল করতেন না।

ঐতিহাসিকগণ এটাও লিখেছেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর আশঙ্কা জাগে যে, তিনি যদি খালিদকে এখনই প্রতিহত না করেন, তাহলে তিনি শামের বিজিত এলাকার লোকজন দ্বারা যে কোনো সময় মদীনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দিতে পারেন। তখন রোমীয়রাও তাঁর সাহায্যে ছুটে আসবে।

কিন্তু এসব কথা ধারণাভিত্তিক মাত্র। সঠিক অভিযোগ সেটাই মনে হয়, যা হযরত উমর (রা.) তাঁর ভাষণে বলেছিলেন। আর তা হলো, হযরত খালিদ (রা.) আশয়াছ ইবনে কায়েসকে দশ হাজার দেরহাম পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন। আর এ অভিযোগও সঠিক যে, হযরত খালিদ (রা.) অর্থ ব্যয়ে সংযমী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অসাধুতা ও খেয়ানতের অভিযোগ আরোপ আদৌ সঠিক ছিল না। তিনি তাঁর নিজের অংশের মালে গনীমত হতে ব্যয় করতেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) সালারগণ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসকদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও প্রশাসন ঢেলে সাজাতে বড়ই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিরাট আশঙ্কা ছিল, যার ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন। আশঙ্কা এই ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর রণদক্ষতা, চৌকস সৈন্য পরিচালনা এবং একের পর এক বিজয় অর্জনের সুবাদে সাধারণ লোকজন এবং সৈন্যদের মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছিল। ফলে এ কারণে তাঁর অপসারণে মানুষের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি এমনকি জন প্রতিবাদের বিরাট

সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা.) ঝুঁকিতে উতরে যান। প্রথম দিকে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা-সমালোচনা হলেও জনগণ পরে শান্ত হয়ে যায় এবং খলীফার সিদ্ধান্ত অবশেষে সকলেই মেনে নেয়।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) যে রণক্ষেত্রে ছিলেন সেখানকার সকল সৈন্যকে একত্রিত করে হযরত আবু উবায়দা (রা.) জানান যে, হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেছেন আর তার স্থানে এখন হযরত উমর (রা.) খলীফা হয়েছেন।

সৈন্যদেরকে দ্বিতীয় খবর এটা শুনানো হয় যে, হযরত খালিদ (রা.)-কে সেনাপ্রধানের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে এবং এখন থেকে সর্বাধিনায়ক হলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.)।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের সংবাদে সমস্ত সৈন্য সমস্বরে বলে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" এরপর সৈন্যদের মাঝে মৃদু কথাবার্তা শুরু হয়। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর বরখাস্তের খবরে সকলের মাঝে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি তাদের মাথা থেকে মুছে যায়। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, সৈন্যদের তাঁবু হতে তিক্ত ও খেদপূর্ণ বিভিন্ন কথা উঠতে থাকে।

"নতুন খলীফা হযরত খালিদ (রা.)-এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতায় ভীত হয়ে পড়েছেন।"

"ইবনে খাত্তাব রাশভারী লোক। তিনি ইবনে ওলীদকে দমিয়ে রাখতে চান।"

"কেন তাকে বরখাস্ত করা হলো? ইবনে ওলীদ কোনো রণাঙ্গন হতে পিছপা হয়েছেন? কোনো যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন?"

"খলীফার ভয় হয়েছে যে, খালিদ বিন ওলীদ হয়ত নিজেই খলীফা হয়ে যাবেন।"

তবে বুদ্ধিমান লোকেরা চুপচাপ ছিলেন। তারা জানতে চাচ্ছিলেন যে, এ ব্যাপারে হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া কী হবে? এটা ছিল একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হযরত খালিদ (রা.) ব্যতীত মুসলিম সৈন্যদের আর কোনো বিজয় ছিল সন্দেহপূর্ণ। ঐতিহাসিকগণ এবং সমর বিশেষজ্ঞগণ লিখেছেন, যে রণ অভিজ্ঞতা ও কৌশল হযরত খালিদ (রা.)-এর মধ্যে ছিল, তা অন্য কোনো সালারের মধ্যে ছিল না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) অত্যন্ত পরহেযগার ও দুনিয়াবিমুখ মানুষ ছিলেন। তাঁকে 'আমীনুল উম্মত' বলা হত। তিনি অত্যন্ত বীর সিপাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মাঝে হযরত খালিদ (রা.)-এর মত নেতৃত্বগুণ ছিল না।

✪✪✪

এক সপ্তাহ পরেই নতুন যুদ্ধ এসে পড়ে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সৈন্যদের কমান্ড হাতে নিয়েছেন মাত্র এক সপ্তাহ হল। ইতিমধ্যে তাঁকে জানানো হয় যে, এক অপরিচিত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। লোকটি নিজেকে 'আরব' বলে প্রকাশ করলেও মূলত সে ঈসায়ী। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দেন। আগন্তুক একাকী কথা বলতে চাচ্ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সকলকে বাইরে যেতে বলেন।

'মুসলমানদের সর্বাধিনায়ক কি এক ঈসায়ী আরবের উপর আস্থা রাখবেন?" আগন্তুক ঈসায়ী বলে, "আপনারা গণীমতের মাল চাইলে এক স্থানের কথা বলতে পারি, সেখানে আক্রমণ করলে প্রচুর মালে গণীমত লাভ হবে।"

"প্রথমে বল, তুমি আমাদের প্রতি এত দয়া করতে কেন এসেছ?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, "রোমীয়রা তো তোমারই স্বধর্মের লোক, তাহলে তুমি তাদের ক্ষতি করতে চাও কেন?"

"মাতৃভূমির মহব্বতের খাতিরে" ঈসায়ী জবাবে বলে, "রোমীয় ও আমাদের মাজহাব যদিও এক কিন্তু জীবিত ঈসায়ীদেরকে রোমীয়রাই বাঘের সামনে ছেড়ে দিয়েছিল এবং এই রোমীয়রাই হযরত ঈসা (আ.)-কে শুলীতে চড়িয়েছিল। আমি তাদের সম্রাটদের দেখে আসছি। তারা জনগণকে মানুষই মনে করে না। আমি বিজিত এলাকায় আপনাদের শাসনও দেখেছি। আপনারা প্রজাদের উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমি রোমীয়দের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছি। আমার অন্তরে শুধু নিজের নয়; বরং সমস্ত মানবজাতির ব্যথা। ... আমি মুসলমান নয় কিন্তু আমি তো এটা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমি একজন আরব। আর আরবের লোক ভাল হয়ে থাকে।"

আগন্তুক ঈসায়ী আরব হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে প্রভাবিত করে ফেলে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন স্থানে হামলার কথা তুমি বলছ?

"আবুল কুদস!" ঈসায়ী আরব জবাব দিল এবং আবুল কুদসের দূরত্ব কত দূর তা বর্ণনা করে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলে, "দু'-তিন দিন পরে সেখানে একটি মেলা বসবে। সেখানে দূর দূরান্তের বণিকরা বিক্রির জন্য মালামাল আনবে। মূল্যবান পণ্য-সামগ্রীর দোকান বসবে। ধনীশ্রেণীর ক্রেতারা আসবে। যদি আপনি গণীমতের মাল চান, তাহলে ছোটখাটো একটি বাহিনী পাঠিয়ে মেলার সমস্ত মালামাল হস্তগত করবেন।"

"সে মেলার হেফাজতের জন্য রোমীয় ফৌজদের কোনো বহর সেখানে বিদ্যমান আছে কী?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"থাকবে না" ঈসায়ী আরব জবাবে বলে, "আমি ভাল করেই জানি যে, রোম উপসাগরের তীরবর্তী শহর তরাবীসে রোমীয় সৈন্য আছে। সেখান থেকে সৈন্য এত দ্রুত সেখানে পৌঁছবে না। আপনার জন্য ময়দান পরিষ্কার।" এ কথা বলেই লোকটি চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, আমার বেশিক্ষণ এখানে অবস্থান করা উচিত নয়।"

লোকটি চলে যায়।

✪✪✪

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই মেলাকে মোটা এবং সহজ শিকার মনে করেন। তিনি তার পরামর্শদাতা সালারদের ডেকে পাঠান, তাদের মধ্যে হযরত খালিদ (রা.)-ও ছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানান যে, ঈসায়ী আরব তাকে কী কী বলে গেছে।

"এই মালে গণীমত হাতছাড়া হওয়া ঠিক নয়" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আবুল কুদস শত্রুদের এলাকা এবং সে শত্রুদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় মেলায় হামলা করা আমাদের জন্য বৈধ। এতে রোমীয়দের উপর আমাদের ত্রাস সৃষ্টি হবে।" হযরত আবু উবায়দা (রা.) এটুকু বলে পালাক্রমে সকলের দিকে তাকিয়ে বলেন, "সেখানে হামলা করতে কোন গেরিলা দল যেতে ইচ্ছুক? এ কথা বলে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর দৃষ্টি হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি নিবদ্ধ হয়।

হযরত খালিদ (রা.) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, হযরত খালিদ (রা.) নিজেই নিজেকে ঐ গেরিলা হামলার জন্য পেশ করবেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) এমনভাবে চুপ করে বসে থাকেন, যেন এই কাজের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। স্বাভাবিক এটাই যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর এই নীরবতা এবং অনাগ্রহ হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর জন্য নৈরাশ্যজনক ব্যাপার ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) মনে করেন যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর এই নিষ্ক্রিয়তা ছিল তার অপসারণের প্রতিক্রিয়া। মজলিসে এক নওজোয়ানও ছিল তার মুখে দাড়ি দু'একটা করে গজাচ্ছিল মাত্র।

"আমি যাব" ঐ নওজোয়ান বলে উঠে "এই সিদ্ধান্ত সর্বাধিনায়ক দিবেন যে, আমার সঙ্গে কত জন সৈন্য যাবে।"

"তুমি কি এখনও কম বয়সী নও ইবনে জাফর?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) একথা বলেন এবং চকিতে একবার হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে তাকান। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) নির্লিপ্ত ও উদাসভাবে বসে ছিলেন।

"আমীনুল উম্মাহ!" নওজোয়ান জবাবে বলে, "আমি মদীনা হতে এসেছি কেন? আমি কিছু করে দেখাতে চাই। আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আমার জিম্মায়

আমার শহীদ পিতার ঋণ রয়েছে? ... আমীনুল উম্মাহ! আমি অবশ্যই কম বয়সী কিন্তু আনাড়ি কিংবা অনভিজ্ঞ নই। কাপুরুষ নই। যুদ্ধ খেলা কিছু শিখে তবেই এসেছি। আমার মহান সেনাপতি কি আমার মনোবল ভেঙ্গে দিবেন?"

"খোদার কসম! ইবনে জাফর!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "তোমার মনোবল ও আশা ভঙ্গ হবে না। পাঁচশত অশ্বারোহীর একটি বহর নিয়ে নাও। তুমি এ বাহিনীর সালার হবে।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এক কম বয়সী ছেলেকে পাঁচশ' অশ্বারোহীর সালার সম্ভবত এ কারণে বানান যে, এ গেরিলা আক্রমণ অত্যন্ত সহজ ছিল। সেখানে কোনো সৈন্য ছিল না, যারা এই গেরিলা দলের মোকাবেলায় নামবে।

এই নবযুবক কোনো সাধারণ ছেলে ছিল না। তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই হযরত জাফর (রা.)-এর পুত্র। হযরত জাফর (রা.) মুতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

✪✪✪

সে রাতে চাঁদ ছিল পূর্ণ আলোকিত। শাবান মাসের ১৫ তারিখ ছিল। ঈসায়ী সন হিসেবে ছিল ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবরের রাত। নবযুবক আব্দুল্লাহ ৫০০ ঘোড়সওয়ার নিয়ে চাঁদনী রাতে রওনা হয়ে যায়। এদলে আশেকে রসূল এবং প্রখ্যাত মুজাহিদ হযরত আবু জর গিফারী (রা.)-ও ছিলেন। এ বাহিনীকে তখন পাঠানো হয়, যখন মেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আব্দুল্লাহ এর বাহিনী প্রত্যুষে যখন আবুল কুদসে গিয়ে পৌঁছান, তখন সেখানে মেলা চলছিল। এলাকার প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল খুবই মনোরম। মেলা বসার কারণে পুরো গ্রামটি ছিল তাঁবু, শামিয়ানা এবং ত্রিপল মোড়ানো একটি এলাকা। প্রতি দোকানে মূল্যবান পণ্য-সামগ্রী ভরপুর ছিল। রাত যতই বিদায় নিতে থাকে মেলার জৌলুস ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আব্দুল্লাহ নবযুবক ছিলেন। সে নিজেকে আনাড়ি মনে না করলেও বাস্তব ময়দানে এসে আনাড়িরই পরিচয় দেয়। সর্বাগ্রে তার এক-দু'জন গোয়েন্দা এটা দেখার জন্য পাঠানো দরকার ছিল যে, রোমীয় সৈন্যদের কোনো দল আশেপাশে কোথাও আছে কিনা এবং মেলায় যারা এসেছে তারা ছদ্মবেশী রোমীয় সৈন্য তো নয়! এসব কিছু না করেই সে এলাকায় গিয়েই আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়।

পাঁচশত মুসলমান অশ্বারোহী মেলার চারদিকে গিয়ে মেলাকে ঘিরে নিতে চেষ্টা করে। এদিকে হঠাৎ করে কোত্থেকে যেন প্রায় পাঁচ হাজার রোমীয় সৈন্যের উদয় হয় এবং তারা মেলা ও মুসলিম অশ্বারোহীদের ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে নিতে থাকে। পাঁচশ' মুজাহিদের মোকাবেলা হয় পাঁচ হাজার রোমীয় সৈন্যের

এবং পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের ঘেরাওয়ের আওতায় চলে এসেছিল। তাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। এই পাঁচ হাজার সৈন্য মেলার হেফাজতের জন্য আশেপাশে কোথাও ঘাঁপটি মেরে ছিল। তাদের জানা ছিল যে, মুসলমানরা খুব দ্রুত অগ্রসর হয়। যেন এমনটি না হয় যে, মুসলিম বাহিনী হঠাৎ এসে মেলা লুটে নিয়ে যায়।

মুসলিম অশ্বারোহীরা রোমীয় বাহিনীর ঘেরাও হতে বের হতে ঘোড়া ছুটাচ্ছিল। কিন্তু কোথায় পাঁচশত অশ্বারোহী আর কোথায় পাঁচ হাজার সৈন্য। মুসলমানরা যেদিক দিয়েই বের হতে যায় সেদিকেই রুখে দেয়া হচ্ছিল। মেলায় হুলস্থুল পড়ে যায়। জনতা চিৎকার করছিল। দোকানদাররা তাদের মালামাল গুটিয়ে নিচ্ছিল। আর যাদের কাছে টাকা-পয়সা ছিল তারা পালাচ্ছিল। এতে করে কিছু লোক ঘোড়ার পদতলে পড়ে থেতলে যায়।

মুসলমানরা প্রত্যেক রণাঙ্গনে স্বল্প সংখ্যা নিয়ে লড়ে আসছিল। নিজেদের থেকে কয়েক গুণ বেশি সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করা এবং সে অসম লড়াইয়ে বিজয় অর্জন করার অভিজ্ঞতাও ছিল মুসলমানদের। সে হিসেবে এবারও তারা সংখ্যায় পাঁচশত হয়েও পাঁচ হাজার রোমীয় সৈন্যের ঘেরাও ছিন্ন-ভিন্ন করে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু সফলতার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। কারো নির্দেশনা ছাড়াই তারা নিজেদেরকে বৃত্তের মত বিন্যাস করে ফেলেছিল এবং এভাবে থেকেই রোমীয়দের মোকাবেলা করতে থাকে। আব্দুল্লাহ লড়তে পারে ঠিকই কিন্তু এই ভয়াবহ অবস্থায় স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ছিল না। সে সিপাহীর মত বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিল। হযরত আবু জর গিফারী (রা.)-ও জীবন বাজি রেখে লড়ছিলেন। সৈন্যদের সকলেই সামনে অগ্রসর হয়ে হয়ে আক্রমণ করছিল এবং রোমীয়দের হামলা প্রতিহতও করছিল। তাদের বৃত্তের আকারে বিন্যাস এভাবে ছিল যে, সকলের মুখ ছিল বাইরের দিকে অর্থাৎ তাদের পশ্চাৎভাগ বলতে কিছুই ছিল না।

রোমীয়রা মুসলমানদের অস্বাভাবিক বিন্যাসে দেখে গতি মন্থর করে এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে সতর্ক হয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল দশ গুণ বেশি এবং তারা সবাই ছিল লড়াকু। তাদের সতর্ক হওয়ায় পার্থক্য এতটুকু হয় যে, মুসলমানদের ধ্বংসযজ্ঞ কিছুক্ষণের জন্য মুলতবী হয়ে গিয়েছিল। এর কোনোই সম্ভাবনা ছিল না যে, পাঁচশত অশ্বারোহী পাঁচ হাজার সৈন্যের তলোয়ারের মুখ থেকে জিন্দা বের হবে।

এই পাঁচশত সেনা সর্বাধিনায়কের একটি ভুলের মাশুল গুনছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) আমীনুল উম্মত ছিলেন। যুহদ ও তাকওয়ার ময়দানে ছিলেন অদ্বিতীয়। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তার মর্যাদা ছিল অতি উচ্চ। কিন্তু শাসন

কর্ম পরিচালনার জন্য, সৈন্যদের নেতৃত্ব দানের জন্য এবং সমর বিষয়ে চৌকস সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শুধু ঐসব গুণ যথেষ্ট ছিল না; বরং অনেক সময় এসব গুণই উল্টো কওম ও ফৌজকে ডুবায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক ঈসায়ীর উপর বিশ্বাস রাখা এবং তার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র গণীমতের মালের জন্য এক কমবয়সী লোকের নেতৃত্বে পাঁচশ' সৈন্য রণাঙ্গনের আশেপাশের খবর না নিয়েই পাঠিয়ে দেয়াটা ছিল হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সরলতা ও সাধুতার ফল।

✪✪✪

হযরত আবু উবায়দা (রা.) সালারদের নিয়ে বসা ছিলেন। দামেস্ক বিজয় হয়েছে। আগামী যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছিল। ওদিকে সেনারা বিশ্রাম করছিলেন।

আচমকা এক অশ্বারোহী ঘোড়া দৌড়িয়ে সোজা হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর তাঁবুর সামনে আসে। অশ্বারোহী ঘোড়া থামিয়েই অশ্বপৃষ্ঠ হতে এক লাফে নীচে নেমে আসে এবং এক প্রকার দৌড়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর তাঁবুর মধ্যে সোজা ঢুকে যান। সৈনিক হাফাচ্ছিল। তারা চেহারায় ধুলাবালুর আস্তর পড়ে ছিল। সকলের দৃষ্টি অশ্বারোহীর দিকে ঘুরে যায়।

"মহামান্য সালার!" লোকটি হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলে, "হয়ত তারা ইতিমধ্যে মরে শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা ঘেরাওয়ের কবলে পড়েছে।"

"কারা?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, কাদের কথা বলছ? কাদেরকে কারা ঘিরে ফেলেছে?"

"আবুল কুদস!" অশ্বারোহী বলে, "আবুল কুদসে পাঠানো পাঁচশত সৈন্যের কথা বলছি। ... এখনিই তাদের সাহায্যে পৌঁছা দরকার। তা না হলে একজনও জীবিত থাকবে না।"

যেসব ঐতিহাসিক এ ঘটনা লিখেছেন, প্রত্যেকের বর্ণনায় এটা এসেছে যে, এই একজনই অশ্বারোহী ছিল, মেলায় হুলস্থুল পড়ে গেলে যে তাকে কাজে লাগিয়ে রোমীয়দের ঘেরাও হতে বের হতে পেরেছিল। তখনও ঘেরাও পরিপূর্ণ হয়নি। এ মুজাহিদ দূরদর্শীতার দ্বারা অনুমান করেছিলেন যে, যুদ্ধ এভাবে চলতে থাকলে তার সাথীদের পরিণতি কী হবে। ফলে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং ঘেরাও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই সটকে পড়ে। পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছিল এবং রোমীয়রা যেভাবে মুজাহিদদের ঘিরে ফেলেছিল, এর মধ্য দিয়ে এ দলের নবযুবক সালারের পক্ষে সাহায্যের জন্য দামেস্কে লোক পাঠানোর অবকাশ ছিল না। তাই এই কঠিন মুহূর্তে ঐ মুজাহিদ সালারের

নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দামেস্ক আসে।

আগত মুজাহিদ দ্রুতভাবে বিস্তারিত ঘটনা শোনায় যে, আবুল কুদস মেলায় কী হয় এবং বর্তমানে কোন অবস্থা চলছে। সব শুনে সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর রং বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে তাকান। হযরত খালিদ (রা.)-এর চেহারায় উদ্বেগের গভীর ছাপ ছিল।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে অনুরোধের সুরে বলেন, "আল্লাহর নামে আবু সুলাইমান! তুমি ছাড়া কেউ তাদেরকে ঘেরাওয়ের কবল হতে বের করতে পারবে না। যাও, এখনিই রওনা হও।"

"আল্লাহর সাহায্যে আমিই তাদেরকে ঘেরাও মুক্ত করব ইনশাআল্লাহ!" হযরত খালিদ (রা.) আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, "আমি আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলাম আমীনুল উম্মত!"

"আবু সুলাইমান! আমাকে ক্ষমা করো!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "তোমার নিয়তের ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। তাই তোমাকে নির্দেশ দিই নি। আমার ধারণা ছিল, অপসারণ তোমার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।"

"খোদার কসম! যদি আমার উপরে এক বাচ্চাকেও সর্বাধিনায়ক বানানো হয়, তবুও আমি তারই অনুগত হয়ে থাকব" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আপনাকে তো নবীজী আমীনুল উম্মত বলেছেন। আমি কীভাবে এই দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারি যে, আপনার নির্দেশ মানব না? আমি তো আমাকে আপনার পায়ের ধুলাবালুরও সমকক্ষ মনে করি না ... সবাইকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, আবু সুলাইমান ইবনে ওলীদ নিজের জীবনকে ইসলামের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে।"

ঐতিহাসিক ওকীদী এবং আল্লামা তবারী লিখেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর চোখে অশ্রু এসে যায় এবং তিনি কিছুক্ষণ যাবত ইবনে ওলীদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

"তোমার উপর আল্লাহর রহমত হোক" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "যাও আবু সুলাইমান! তোমার ভাইদের জীবন রক্ষা কর।"

✪✪✪

ইতিহাসে বিস্তারিত তথ্য মেলে না যে, হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সঙ্গে কতশত বা কত হাজার সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যান্য তথ্য বিভিন্ন ইতিহাসে কম-বেশি বর্ণিত হয়েছে। হযরত খালিদ (রা.) এ অভিযানে 'নাঙ্গা মুজাহিদ'

হযরত যাররার (রা.)-কে সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাদের পেছনে মুসলিম বাহিনী ঘোড়া ছুটিয়ে চলছিলেন।

হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত যাররার (রা.) আটকে পড়া মুজাহিদদের উদ্ধার করতে চলে গেলে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর অবস্থা বদলে যায়।

"আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্!" তিনি দোয়ার জন্য হাত তুলে কাঁদতে থাকেন– "খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) আমাকে লিখেছিলেন যে, মালে গণীমতের লোভে মুজাহিদদেরকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলবে না, যেখানে তাদের প্রাণহানি ঘটে। হযরত উমর (রা.) আরও লিখেছিলেন, সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে দেখে-শুনে নিবে। ... হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার থেকে এটা কেমন সিদ্ধান্ত হল। আমি এক ঈসায়ীর কথা বিশ্বাস করেছি। আমি এক অল্প বয়সী বালকের হাতে পাঁচশত অশ্বারোহীর কমান্ড তুলে দিয়েছি এবং তাকে এতটুকু পর্যন্ত বলে দিইনি যে, গন্তব্যে পৌছার পূর্বে কোথাও সৈন্যদের থামিয়ে গন্তব্যস্থল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিবে।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সহযোগী সালারগণ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) যে পাঁচশত মূল্যবান অশ্বারোহীকে নিজের ভুলের দরুন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন তার জন্য তিনি শান্ত ও সুস্থির হতে পারছিলেন না।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত যাররার (রা.) সহগামী সৈন্যদের নিয়ে উড়ে উড়ে আবুল কুদস পৌছেন। তখন সেখানকার মুজাহিদদের অবস্থা ছিল অতি সঙ্গীন। হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে তাঁর সৈন্যরা নারাধ্বনি দিতে শুরু করে। এ নারাধ্বনি ছিল উদ্দেশ্যমূলক। যাতে এতে করে ঘেরাওয়ে আটকা পড়া মুজাহিদ বাহিনীর মনোবল বেড়ে যায় এবং রোমীয়দের উপর ত্রাস সৃষ্টি হয়।

সাধারণ নারাধ্বনি শেষ হলে হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় নারাধ্বনি উচ্চারিত করেন :

انا فارس الضديد

انا خالد بن الوليد

আমি পারস্যদের যমদূত
আমি খালিদ ইবনুল ওলীদ।

রোমীয়রা ইতিপূর্বের বিভিন্ন রণাঙ্গনে এ নারাধ্বনি শুনেছিলেন। নারাধ্বনির পাশাপাশি মুসলিম বাহিনী তাদেরকে যেভাবে টমেটোর মত কাটতে থাকে ও ধরাশায়ী করতে থাকে তা তারা সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না।

নতুন আক্রমণের মুখে পড়ে রোমীয় সৈন্যরা স্বীয় ঘেরাওর ভেতরে আনা মুসলমানদের কথা বেমালুম ভুলে যায়। হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনী ছড়িয়ে দিয়ে প্রথম চোটেই বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ করান। যাতে রোমীয়রা সামনা সামনি এসে বিন্যস্তভাবে আক্রমণ করার সুযোগই না পায়। এছাড়া হযরত খালিদ (রা.)-এর নিজস্ব একটি দুর্বলতার অনুভূতি ছিল। তিনি স্বীয় বাহিনী সমেত দামেস্ক হতে দুর্বার গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আল কুদস পৌঁছেছিলেন। দীর্ঘ পথ রুদ্ধশ্বাসে ছুটে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের গা থেকে ঘাম টপকে পড়ছিল। তাই হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রানান্ত চেষ্টা ছিল, রোমীয়দের দ্রুত ভাগিয়ে দেয়া। নতুবা সময় বেশি নিলে ঘোড়া হাল ছেড়ে দিবে।

হযরত যাররার (রা.) এ যুদ্ধেও ঐ রণনৈপুণ্য দেখান, যা রোমীয়দের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তিনি নিজের শিরস্ত্রাণ, বর্ম এবং গায়ের জামা খুলে ফেলেন এবং রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। রোমীয়রা এত সহজে পিছপা হবার ছিল না। তারা ইতিমধ্যে ঘেরাওয়ের মধ্যে বন্দী মুসলিম বাহিনীর কতককে শহীদ এবং অনেককে মারাত্মক আহত করে ফেলেছিল। সৈন্যদের মাঝে যারা অক্ষত ছিল, হযরত খালিদ (রা.) এসে যাওয়ায় তাদের নতুনভাবে মনোবল বৃদ্ধি পায়। রোমীয়রা যখন হযরত খালিদ (রা.) ও হযরত যাররার (রা.)-এর মোকাবেলায় তাদের দিকে ঘুরে যায়, তখন পশ্চাৎ দিক থেকে এই অক্ষত মুজাহিদরা টর্নোডো হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যারা কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত রোমীয়দের শিকারের আওতায় ছিল।

যুদ্ধ জমে ওঠে। রক্তক্ষয়ী ও তীব্র লড়াই চলছিল। এবার চিত্র পাল্টে যায়। রোমীয়রা এবার মুসলমানদের ঘেরাওয়ে চলে আসে। তাদের সংখ্যা তখনও ছিল বেশি। মুসলমানরা চতুর্দিক হতে তাদেরকে এমনভাবে চাপিয়ে আনে যে, তারা স্বাচ্ছন্দে ঘোড়া ঘুরানোরও জায়গা পায় না। নিজেরাই নিজেদের মাঝে জট পাকিয়ে ফেলে। এতে লাভবান হয় মুসলমানরা। তারা মনভরে মূলা-গাজরের মত তাদের কাটতে থাকে। চোখের সামনে নিজেদের এই পরিণতি দেখে তারা ভড়কে যায়। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে রোমীয়দেরকে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। পরিশেষে তারা অগণিত লাশ আর বহুসংখ্যক মারাত্মক আহত সৈন্যদের ফেলে রণাঙ্গন ছেড়ে চলে যায়।

ঐ মুসলিম অশ্বারোহীদের প্রাণহানির সংখ্যা কম ছিল না যারা রোমীয়দের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে লড়াই করেছিল। হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন

মেলার মালামাল জমা করতে। তিনি অনেক সৈন্যকে আহতদের এবং লাশ উঠিয়ে আনার কাজে লাগিয়ে দেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর নিজের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাঁর শরীরে অনেক আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁর পরিহিত পোশাকও রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। নিজের এসব ক্ষতস্থানের প্রতি তার কোনো দৃষ্টি ছিল না। কেননা ক্ষত তাঁর জন্য কোনো নতুন বিষয় ছিল না। তাঁর শরীরে এ সময় পর্যন্ত এত আঘাত লেগেছিল যে, অতিরিক্ত আর ক্ষত হওয়ার মত স্থান বাকী ছিল না।

হযরত খালিদ (রা.) দামেস্কে ফিরে আসেন। তিনি যে মালে গণীমত আনেন তা ছিল যেমনি পরিমাণে অনেক, তেমনি অত্যন্ত মূল্যবান। আহত ও নিহত রোমীয়দের অসংখ্য ঘোড়াও তাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু এই গণীমতের মালের জন্য বড়ই মূল্যবান প্রাণ খরচ করতে হয়েছিল।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই মূল্যবান প্রাণহানীর জন্য খুবই আফসোস করেন। অবশ্য এটা দেখে তাঁর মন প্রশান্ত হয় যে, হযরত খালিদ (রা.) তাঁর এই সন্দেহ দূর করে দিয়েছেন যে, অপসারণের কারণে তার মধ্যে পূর্বের মত প্রেরণা, আকর্ষণ ও জোশ নেই। হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় শরীর আহত করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, অপসারণে তাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) গণীমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ খেলাফতের জন্য আলাদা করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে হযরত উমর (রা.)-কে বিস্তারিতভাবে লিখে জানান যে, তিনি প্রথমে কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তার পরিণতি কী হয়েছিল এবং এ যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব কী ছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, উক্ত পত্রে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করে অনেক কথা লিখেছিলেন।

✪✪✪

প্রতি ময়দান এবং রণাঙ্গন হতে রোমীয়রা শুধুই পিছু হটছিল। রোমীয়দের সম্রাট হিরাকেল ইন্তেকিয়াতে ছিলেন। তাঁর নিকটে দূত আসলেই একই ধরনের খবর পৌঁছাতে থাকে যে :

"অমুক কেল্লাও মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে।"

"অমুক ময়দান হতেও সৈন্যরা পিছুটান দিয়েছে।"

"মুসলমানরা অমুক দিকে অগ্রসর হয়েছে।"

"আমাদের অমুক শহরের লোকজন মুসলমানদেরকে জিযিয়া কর দিতে সম্মত হয়েছে।"

হিরাকেলের কানে বর্তমানে এ ধরনের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা প্রবেশ করছিল না। ঘুমের ঘেরেও তিনি এমনই কথা শুনতে পেতেন। তাঁর সভাসদ, মন্ত্রী এবং সালাররা এখন তাঁর সামনে আর কোনো পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু তাদেরকে সম্রাটের সামনে যেতেই হত এবং সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে পরাজয় সম্পর্কে কথাবার্তা বলা এবং তা শুনতে হত।

ইন্তেকিয়ায় এক সন্ধ্যা চলছিল। সে সময়ে ইন্তেকিয়ার সন্ধ্যা জৌলুসপূর্ণ হত। রোম সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সৌন্দর্যপূর্ণ শহর ছিল ইন্তেকিয়া। রোমের উচ্চস্তরের অফিসার, প্রশাসক ও মন্ত্রীরা এ শহরেই অবস্থান করত। কিছু দিন পূর্ব হতে রোম সম্রাট হিরাকেল এখানে সাময়িক রাজধানী এবং সামরিক হেড কোয়ার্টার বানিয়েছিলেন। রোমীয়রা ছিল ভীষণ লড়াকু জাতি। তৎযুগে রোম সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য। সুদৃঢ়তার কারণ ছিল রোমীয় সেনাবাহিনীর শক্তি ও দাপট। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং বিপুল সংখ্যাধিক্যে রোমকবাহিনী শত্রু মহলের জন্য রীতিমত ত্রাস ছিল। তাদের আয়েসী ও বিলাসী আসবাবের অভাব ছিল না। প্রচুর পরিমাণ বিলাসী দ্রব্য ছিল। পতিতালয় ছিল অনেক। নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পীর অভাব ছিল না। সুন্দরী, রূপসী যুবতী নারীদের আনাগোনা ছিল শহরের সর্বত্র। ফলে ইন্তেকিয়া সন্ধ্যায় মুচকি হাসত এবং রাতভর জেগে থাকত। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী এ দেশে আসার পর রোমীয়দের একের পর এক পরাজয়ের খবরে ইন্তেকিয়ার সব জৌলুস ফিকে হয়ে গিয়েছিল। আনন্দ-উচ্ছাস উঠে গিয়েছিল। ইন্তেকিয়ার সন্ধ্যা আর আগের মত জৌলুসপূর্ণ ও আনন্দমুখরিত ছিল না। এখন তা হয়ে পড়েছিল অনেক নিরানন্দ ও বেদনাবিধুর।

ইন্তেকিয়া সেনা হেডকোয়ার্টার হওয়ায় এখানে সৈন্যদের আগমন-নির্গমন সবসময় লেগে থাকত। নতুন সৈন্যরা এলে পতিতালয়ের শ্রী বৃদ্ধি হত এবং ভ্রাম্যমান পতিতাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেত। এখন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইন্তেকিয়ার বাইরে থেকে আগত সৈন্যরা ছিল আহত। অক্ষতভাবে যারা আসছিল তাদের চেহারায় ছিল পরাজয়ের কালো মেঘের ছায়া। প্রত্যেক সৈন্যের চেহারায় আঁকা ছিল পরাজয়ের কলঙ্ক। ফলে আনন্দ-ফূর্তির জন্য অন্যান্য মহিলা তো দূরে থাক, তাদের আপন স্ত্রীরাও তাদেরকে সুনজরে দেখছিল না। এই নতুন সৈন্যরা রোমীয় সমরাতিহাসের ঐতিহ্য ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের মুখে চুনকালি মাখিয়েছিল। রোমক জাতি ও রোম সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল।

ইন্তেকিয়ায় যেসব রোমীয় মহিলা ছিল তারা স্বয়ং হিরাকেলকেও ছেড়ে কথা বলে না। সেদিন ছিল ইন্তেকিয়ার বেদনাবিধুর সন্ধ্যাগুলির একটি। হিরাকেল

শাহী বাহনে চড়ে কোথাও হতে ফিরছিলেন। তাঁর সামনে আটটি ঘোড়া শাহী ভাবে চলছিল। এসব ঘোড়ার সওয়ার ছিল হিরাকেলের বডিগার্ডরা। তাদের হাবভাবই ছিল ভিন্ন ধরনের। তাদের সকলের হাতে বর্শা ছিল, যার ফলার দিকটি ছিল উপরমুখী এবং প্রত্যেক বর্শার ফলক হতে একটু নীচে রেশমী কাপড়ের এক একটি ঝাণ্ডা ছিল। সম্রাটবাহী শাহী রথের পেছনেও আট-দশজন অশ্বারোহী ছিল।

একটি আওয়াজ শুনা যায় "সম্রাটের গাড়ি আসছে।"

জনতা সম্রাটকে একনজর দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে যায়। দর্শকদের মধ্যে মহিলারাও ছিল। মহিলারা সাধারণত দরজার সামনে অথবা দেয়ালের উপরে উঠে সম্রাটের আগমন-নির্গমন দেখত। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় কয়েকজন মহিলা সরাসরি হিরাকেলের রাস্তায় চলে আসে। মহিলারা রাস্তায় নেমে এলে সম্রাটের দু'জন অগ্রবর্তী বডিগার্ড ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের কাছে চলে আসে এবং মহিলাদেরকে রাস্তা হতে সরিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু মহিলারা চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে যে, তারা সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আরও দু'জন বডিগার্ড চলে আসে। কেননা মহিলারা পেছনে যেকে চাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে সম্রাটের বহনকারী গাড়ি ঘটনাস্থলে চলে আসে। তিনি দূর থেকেই মহিলাদের দেখছিলেন। তিনি মহিলাদের কাছে এসে গাড়ি দাঁড় করান এবং নিজে গাড়ি থেকে নেমে আসেন।

"তাদেরকে ছেড়ে দাও" হিরাকেল গর্জন করে বলেন, "তাদেরকে আমার কাছে আসতে দাও।"

সম্রাট মহিলাদের কাছে এগিয়ে গেলে মহিলারা সম্রাটকে ঘিরে ফেলে। সকলের মুখ ছিল সরব।

"আমি কিছুই বুঝছি না" হিরাকেল উচ্চকণ্ঠে বলেন, "একজন বলো, আমি সব কথাই শুনব।"

"মহামান্য রোম সম্রাট!" এক মহিলা বলে, "আপনি এখন কিছু বুঝবেন না।"

"যিনি রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংস মেনে নিয়েছেন, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মহিলাদের কথা তাঁর না বুঝাই স্বাভাবিক" এক মহিলা বলে, "আমরা সকলেই রোমীয়। কেউ স্থানীয় নই। এখানকার মহিলারা কখনো আপনার রাস্তায় আসবে না। কেননা রোমীয়রা চলে যাক আর আরব মুসলমানরা এখানে আসুক এটা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। বেইজ্জতি ও অপমান যা হবার তা শুধু আমাদেরই হচ্ছে। মাথা কাটা যাচ্ছে রোমীয়দের।"

"আর কার কী বলার আছে বলো" হিরাকেল বলেন, "কথা থাকলে বলে ফেল; চুপ থেকো না।"

"আপনি কি চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন যে, আপনি আমাদেরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিবেন?" এক মহিলা বলে, "বর্তমানে এ ছাড়া আর কোনো কথা শুনি না যে, অমুক শহর মুসলমানরা অধিকার করে নিয়েছে এবং সেখানকার রোমীয় মহিলারা মুসলমানদের বাঁদীতে পরিণত হয়েছে।"

"আমাদের পুরুষ সৈন্যরা যদি লড়াই করার হিম্মত না রাখে তাহলে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিন" আরেক মহিলা বলে, "ঘোড়া, তলোয়ার এবং বর্শা আমাদের হাতে তুলে দিন।"

"যে সৈন্যদেরকে ইরানীরা পর্যন্ত ভয় করত" আরেক মহিলা বলে, তারা এখন ভীত, আহত এবং পলায়নপর সৈন্যে পরিণত হয়েছে।"

বর্তমানে এ শহরে যেসব সৈন্য আসছে তারা কোনো না কোনো কেল্লা বা রণাঙ্গন হতে পালিয়ে আসা সৈন্য" আরেক মহিলা বলে।

এদিকে হিরাকেলের বডিগার্ড বাহিনী এটা ভেবে ভেতরে ভেতরে ঘামছিল ও ভয় পাচ্ছিল যে, গুটি কতক মহিলাকে রাস্তা হতে সরাতে না পারার অপরাধে হয়ত তাদের উপর সম্রাটের শাস্তি নেমে আসবে। দর্শক এই অপেক্ষায় ছিল যে, সম্রাট এবার এসব মহিলাকে ঘোড়ার পদতলে ফেলে পিষ্ট করার নির্দেশ দিবেন। কিন্তু হিরাকেল নীরবে ও ধৈর্যের সঙ্গে মহিলাদের তীর্যক মন্তব্য ও কঠোর সমালোচনা শুনছিলেন। হয়তবা এর কারণ এই হবে যে, এসব মহিলারা ছিল রোমীয়; স্থানীয় নয়।

"আমাদের সৈন্যরা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে" হিরাকেল বলে, "আমি কাপুরুষ হইনি। পরাজিত হয়ে যারা ফিরে এসেছে তারা আবার যুদ্ধ করবে। আমি পরাজয় মেনে নিই নি।"

"তাহলে আমাদের সম্রাটের চিন্তা-ভাবনা কী?" এক মহিলা জানতে চায়।

"তোমরা অচিরেই তা শুনতে পাবে" হিরাকেল বলে, "আমি এখনও জীবিত আছি। আমার যা চিন্তা তা আমি করে দেখাব। জয়-পরাজয় হয়েই থাকে। সে জাতি সর্বদা অন্যদের গোলামই থাকে, যারা পরাজয় স্বীকার করে নেয়। আমি তোমাদেরকে কারো গোলাম হতে দিব না। মুসলমানদের যতদূর আসার ছিল তারা এসে গেছে। এখন আমার পালা। তারা আমার ফাঁদে চলে এসেছে। এখন আর তারা জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না। তারা এতদিন যা নিয়েছে তার থেকে কয়েক গুণ বেশি ফিরিয়ে দিবে। ... আমার জন্য দোয়া করতে থাক। তোমরা শীঘ্রই সুসংবাদ শুনতে পাবে। ... আর তোমরা নিজ নিজ স্বামী, পিতা, ভাই ও পুত্রদের মনোবল বৃদ্ধি করতে থাক।"

"আমরা তাদের জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করে দিব" এক মহিলা বলে।

"একদিন তোমরা তাদের বুকে টেনে নিবে" হিরাকেল বলে, "এবার থেকে তারা বিজয়ীবেশে তোমাদের সামনে আসবে।"

মহিলারা সম্রাটের কথায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁর রাস্তা ছেড়ে দেয়।

✪✪✪

হিরাকেল মহিলাদের নিছক মনজয়ের জন্য উল্লিখিত কথাগুলো বলেননি। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, তিনি পরাজয় স্বীকার করে নেওয়ার মত যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি আগে সিপাহী ও পরে ছিলেন বাদশা। স্বীয় যুগের অন্যতম জেনারেলও ছিলেন তিনি। এটা অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি হযরত খালেদ (রা.)-এর সমপর্যায়ের জেনারেল এবং রণচালে তার জুড়ি কেউ ছিল না।

যদি তিনি শুধুই সম্রাট হতেন, তাহলে তার যাত্রা পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী মহিলাদের আস্ত রাখতেন না। বরং তাদের কঠোর শাস্তি দিতেন। কিন্তু তিনি মহিলাদের থেকে নিজেও মনোবল চাঙ্গা করেন এবং তাদেরও মনোবল বৃদ্ধি করেন।

তিনি এটাও অনুভব করেছিলেন যে, কোনো এলাকা হতে পরাজয় এবং সৈন্যদের পিছপা হওয়ার সংবাদ এলে তাঁর অফিসাররা এটা নিয়ে তাঁর সামনে আসতে চায় না এবং তাকে তা জানাতে চায় না। একটি ঘটনা হতে এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়। তাঁর এক সালার উপদেষ্টা হিসেবে সবসময় সম্রাটের সঙ্গে থাকত। একদিন ঐ সালার সম্রাটের সামনে আসে। তার চেহারায় নিরাশার ও দুশ্চিন্তার যে ছাপ ছিল তা সম্রাট সহজেই অনুমান করে ফেলেন।

"কী হয়েছে?" হিরাকেল জিজ্ঞাসা করেন।

"মাবযুদ দীনায থেকে দূত এসেছে" সালার বলে।

"তুমি কেন বলছ না যে, সে আরেকটি পশ্চাদপসারণের খবর নিয়ে এসেছে" হিরাকেল আবেগী কণ্ঠে বলে, "মন থেকে আমার ভয় কেন বের করে ফেল না? পরাজয় আর পিছপার খবর শুনেই ঘাবড়ে যাও কেন? ... কী হয়ছে বল।"

"ঠিকই বলেছেন সম্রাট!" সালার বলে, "দূত পশ্চাদপসারণের সংবাদ নিয়ে এসেছে। ... আর সেখান থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরা ইতিমধ্যে শহরে আসতেও শুরু করেছে।"

"আসতে দাও তাদের!" হিরাকেল এমনভাবে কথাটা বলেন যার মধ্যে কোনো উত্তাপ ছিল না এবং তার কণ্ঠে শাহী প্রতাপও ছিল না "তাদের মনোবল বৃদ্ধি কর। কেউ যেন তাদেরকে পরাজয় ও পিছু হটার জন্য অভিযুক্ত না করে। এই সিপাহীরাই একদিন পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করবে।"

"সিপাহীদের মনোবল তো ঠিক হয়ে যাবে" সালার বলে, "কিন্তু জনগণের মনোবল ভেঙ্গে যাচ্ছে। মানুষ মুসলমানদেরকে জ্বিন ও ভূত মনে করতে শুরু করেছে। এমন এমন গুজব রটছে, যা জনতাকে কাপুরুষ বানিয়ে ফেলছে।"

"জান এই গুজব কারা ছড়াচ্ছে?" হিরাকেল বলেন, আমাদেরই সালার, কমান্ডার এবং সিপাহীরা। আর তা এটা প্রকাশ করতে যে, তারা তো প্রাণপণ লড়ছে কিন্তু পারছে না শুধু এ কারণে যে, মুসলমানরা মানুষ নয়; বরং জ্বিন।"

"মহামান্য সম্রাট!" সালার বলে, "মুসমানদের সফলতার অপর এক কারণ আছে। ... আমাদের যে শহরের লোকজন তাদের সঙ্গে সন্ধি করে এবং কর আদায় করে, তাদের সঙ্গে মুসলমানরা খুব ভাল ব্যবহার করে। শহরের মহিলাদের এবং তাদের যুবতী মেয়েদের প্রতি চোখ তুলেও তাকায় না। তাদের জান-মালের হেফাজত করে। তাদের ধর্মেরও সম্মান করে। এসব দিক সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এর ফল এই হয় যে, অন্যান্য শহরের লোকেরাও আমাদের সৈন্যদের পক্ষ ত্যাগ করে এবং তাদেরকে সন্ধি করতে বাধ্য করে। এর কোনো প্রতিবিধান হওয়া দরকার।"

"এর একমাত্র প্রতিবিধান হলো, মুসলমানদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে তাদেরকে চিরতরে খতম করে দেয়া" হিরাকেল বলেন, "আর তার বন্দোবস্তও হচ্ছে।"

✪✪✪

'আবুল কুদস'-এ হিরাকেল যে চোট পেয়েছিল, তা তাকে ভীষণ মর্মাহত করেছিল। তাঁর নিকট এ ময়দানের বিস্তারিত তথ্য পৌঁছেছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) একটি ভুল করে ফেলেছিলেন। রোমীয়রা এই ভেবে প্রফুল্লিত হয় যে, মুসলমানদের একটি দল তাদের ফাঁদে ফেঁসে গেছে। মুসলমানরা ঠিকই ফেঁসে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত যাররার (রা.) ঠিক সময় মদদে এসে যাওয়ায় রোমীয়দের পাতা ফাঁদের শুধু মূলোৎপাটনই হয়নি; বরং মুসলমানদের হাতে চরমভাবে ধরাশায়ী হয় এবং মুসলমানরা বিজয়ী হওয়ার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ গণীমতের মাল লাভ করে।

মুসলমানদের বিদ্যুৎগতি হিরাকেলকে উদ্বিগ্ন করে তুলছিল। তিনি দেখছিলেন যে, মুসলমানরা এক স্থান হতে অপর স্থানে বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে এবং রণাঙ্গনে সালারদের রণকৌশলে মুজাহিদরা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে ও সালারদের কৌশল কামিয়াব করে তুলে।

এরপর থেকে হিরাকেল রাতে ঘুমোনোও ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি সেদিনই তাঁর সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এসব দূত মারফত

তিনি এই ফরমান পাঠিয়েছিলেন যে, যেন বেশি হারে সৈন্য ইন্তেকিয়া পাঠানো হয়। তাঁর পক্ষে সাম্রাজ্যের সমস্ত সৈন্য সমবেত করা সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক স্থানেই নিরাপত্তার জন্য কিছু সৈন্য থাকার প্রয়োজন ছিল। তিনি সকল স্থান হতে এমন পরিমাণ সৈন্য তলব করেন যারা এলে কোথাও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ছেদ পড়বে না। দুর্বল হবে না।

যেসব এলাকা হতে সৈন্য আসে তার মধ্যে উত্তর সিরিয়া, ইউরোপের কতিপয় শহর ও দ্বীপ অন্যতম ছিল। হিরাকেল নির্দেশনামায় এ কথাও বলে দিয়েছিলেন যে, এসব সৈন্য যেন খুব দ্রুত এসে পৌঁছে। সৈন্যদের আনাগোনা শুরু হলে কতককে ইন্তেকিয়া রাখা হয় আর বাকীদেরকে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর হতে সামান্য দূরে 'বীসান' নামক এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

হিরাকেল তাঁর উপদেষ্টা ও সালাদের ডেকে পাঠান। সেকলার, সেন্স এবং থিউডোর্স তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল। এই তিনজনকে রণাঙ্গন হতে তলব করা হয়েছিল। হিরাকেল তাদের জানান যে, মুসলমানদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে তিনি কী ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন আর সালারদের করণীয় কী হবে।

"তোমরা দেখেছ যে, মুসলমানরা কীভাবে লড়ে" সম্রাট বলেন,

"পরাজয় ও পিছপা হওয়ার কারণে তোমাদের মনোবল না ভাঙ্গা চাই। তাদের থেকে তোমরা অভিজ্ঞতা হাসিল করেছ। যদি তোমরা পূর্ব পরাজয় হতে কিছু না শিখে থাক, তাহলে এটাই একমাত্র পথ যে, তোমরা গিয়ে মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নাও। রোম সম্রাটের মর্যাদা-সম্মান মুসলমানদের পদতলে ঢেলে দাও এবং ক্রুশকে রোম সাগরে ছুঁড়ে ফেলে মুসলমানদের ধর্মে শামিল হয়ে যাও। তোমাদের জীবন, স্ত্রী এবং অর্থ-সম্পদ তোমাদের কাছে খুব প্রিয়। যার ফলে আরব ডাকুদের একটি দল তোমাদেরকে একের পর এক পরাজিত করে চলেছে।"

দরবারে পীনপতন নিরবতা নেমে আসে। সবার মুখ ছিল মূক। এ সময় হিরাকেলের দৃষ্টি সকলের চেহারা প্রদক্ষিণ করে আসে।

"মহামান্য রোম সম্রাট!" তাঁর সালার থিউডোর্স নীরবতা ভাঙ্গে "আমরা আর পিছু হটব না। আমি আমার ব্যাপারে বলতে পারি যে, আপনার কাছে জীবিত ফিরে এলে পরাজিত হয়ে ফিরব না। যদি আমি পরাজিত হই তাহলে আমার লাশও এখানে আসবে না।"

এই সালারের মুখ খোলার দ্বারা দরবারের নিরবতাই শুধু ভাঙ্গে তা নয়; বরং সকলের মাঝে যে হীনমন্যতা বিরাজ করছিল তাও দূর হয়ে যায়। সকলেই হিরাকেলকে আশ্বস্ত করে যে, তাদের কাছে রোম সাম্রাজ্য রক্ষার চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু নেই।

"আমি মুসলমানদেরকে এখানে নির্মূল করার যে পরিকল্পনা করেছি তা ব্যর্থ হতে পারে না।" হিরাকেল বলেন, "এতদিন আমাদের সৈন্যরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে লড়েছে। এক স্থানে আমাদের ফৌজ হারলে তারা পালিয়ে অন্যত্র গিয়ে সেখানকার সৈন্যদের মাঝে হীনমন্যতা ছড়িয়েছে। তারা নিজেদেরকে পলায়নের অভিযোগ থেকে বাঁচাতে এমন এমন কথা বলেছে, যা শুনে সেখানকার সৈন্যদের মাঝে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। এবার আমি সকল সৈন্য এক স্থানে সমবেত করে লড়াব। ...

তোমরা দেখেছ যে, আমি কোন কোন স্থান হতে সৈন্য চেয়েছি এবং কত সৈন্য সমবেত করেছি। আমার দৃষ্টি দামেস্কের উপর। তবে আমি দামেস্কে আক্রমণ করব না। দামেস্ক অবরোধও করব না। আমি দামেস্কের বাইরে ছোট ছোট লড়াইয়ে অধিক সৈন্য ব্যবহার করে মুসলমানদের খাদ্য-রসদের ঐ রাস্তা বন্ধ করে দিব, যা আরব হয়ে দামেস্কে এসেছে। আমি দামেস্ক বা এর আশেপাশে কোনো যুদ্ধ করব না; বরং মুসলমানরা অধৈর্য হয়ে লড়তে চাইলেও আমরা এড়িয়ে যাব। আমরা তাদের জন্য এমন অবস্থা সৃষ্টি করব যে, তারা লড়াই করার যোগ্য থাকবে না। কোথাও হতে তাদের ওখানে রসদ পৌঁছতে দিব না। সাহায্য পৌঁছবে না। এতে করে শহরের লোকেরাই দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে তাদেরকে দামেস্ক ছাড়তে বাধ্য করবে। যদি তারা এভাবে দামেস্ক ছেড়ে যায় তাহলে আমরা কোথাও তাদের দাঁড়াতে দিব না। এটাও মনে রাখবে যে, আমাদের সৈন্য সমাবেশ এমন গোপনীয়ভাবে হবে যে, মুসলমানরা তা আদৌ জানতে পারবে না।"

✪✪✪

হিরাকেলের ধারণা ছিল, তাঁর সৈন্যসমাবেশের কথা গোপন রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সঙ্গে হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) অত্যন্ত মজবুত এবং দ্রুততর গোয়েন্দা টিম প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-কে অশ্বারোহী বাহিনীর সালার নিযুক্ত করেছিলেন এবং এর পাশাপাশি তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে নিজের উপদেষ্টাও মনে করতেন। ঐতিহাসিকদের মত হলো, হযরত আবু উবায়দা (রা.) সালার হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন এবং যুদ্ধ বিষয়কেও পূর্ণভাবে বুঝতেন। কিন্তু তাঁর মাঝে ঐ গতি ছিল না, যা ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর মধ্যে। হযরত খালিদ (রা.) সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কখনও মারাত্মক ঝুঁকিও নিতেন। এর বিপরীত হযরত আবু উবায়দা (রা.) ছিলেন 'ধীরে চল' নীতির উপর। নিজের এই রীতি সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিফহাল

থাকায় তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে সর্বক্ষণ কাছে কাছে রাখতেন। তিনি যে কোনো পরিকল্পনা নিতে কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে বিশেষভাবে পরামর্শ করতেন।

হযরত খালিদ (রা.) অবস্থা পর্যালোচনা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি রাখতেন। এখন এটা তার দায়িত্ব ছিল না। কেননা এ দায়িত্ব এখন বর্তিত হয়েছে সর্বাধিনায়কের উপর। হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন অন্যান্য সালারদের মতই একজন সাধারণ সালার। কিন্তু তিনি বরখাস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজের দায়িত্ব হতে এক চুলও নড়েন না। তিনি পূর্বের মতই গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনার উপর দৃষ্টি রেখেছিলেন। এরই ফলে মুসলিম গোয়েন্দারা রোম সাম্রাজ্যের দূর এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

একদিন এক গোয়েন্দা আসে। সে অনেক দূর হতে এসেছিল। এই গোয়েন্দা জানায় যে, রোমীয়দের একটি বাহিনী রোম সাগর পেরিয়ে জাহাজে আসছে। এই গোয়েন্দা খবরটি জানে আরও আগে চলে যাওয়া গোয়েন্দা হতে। সে তাদের সকলের প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে দ্রুত দামেস্ক আসে এবং এই খবর জানায় যে, রোমীয়রা কম বেশি এক লাখ সৈন্য জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে জমা করেছে।

ইতিহাসের তথ্য মতে বীসান নামক স্থানে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষের দিকে এবং ১৩ হিজরীর জিলকদ মাসের প্রথম সপ্তাহে রোমীয়রা এই সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল। গোয়েন্দা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী এই সৈন্যের সংখ্যা এক লাখ বলেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার।

এই বিরাট সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, রোমীয়রা বড় মাত্রার পদক্ষেপ নিতে চায়।

সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা (রা.) গোয়েন্দা রিপোর্ট জেনে সালারদের ডেকে পাঠান।

"আমার প্রিয় সাথীগণ!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) সালারদের উদ্দেশে বলেন, "আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত হোক। শুকরিয়া আদায় করুন ঐ আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদেরকে প্রতি রণাঙ্গনে বিজয় দান করেছেন। ... আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, আমরা এত দূর চলে এসেছি যে, এখান থেকে আমাদের ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক আমাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। যদি আমরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, তাহলে এটি একটি ইতিহাস হয়ে যাবে। যা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকা হবে। কেউ ভুলবেন না যে, আমরা গণীমতের মাল লাভের জন্য লড়ছি না এবং সাম্রাজ্যবাদিতাও আমাদের উদ্দেশ্য না। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মানব জাতিকে অন্ধকার এবং গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার জিম্মাদারী

আমাদের কাঁধে অর্পণ করেছেন। এখন শত্রুরা আমাদের সামনে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।...

রোমীয়রা প্রায় এক লাখ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। এ থেকে তাদের দৃঢ় উদ্দেশ্যের কথা বুঝা যায়। যতদূর আমার ধারণা এবং এটাই হবে যে, রোমীয়রা এবার দামেস্ক আক্রমণ করবে। যদি দামেস্ক আমাদের হাত থেকে ছুটে যায়, তাহলে আর কোথাও দৃঢ়ভাবে অবস্থান করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে। শত্রুরা রোম উপসাগর হতে ইন্তেকিয়া, বৈরুত এবং আরও কয়েকটি নৌবন্দর দিয়ে ইউরোপ থেকে সৈন্য এনেছে। আমাদের সর্বাগ্রে দামেস্কের প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত করতে হবে। কিন্তু আমরা এক স্থানেই পড়ে থাকব না।"

"আমাদের সর্বমোট সংখ্যা এখন কত?" এক সালার জিজ্ঞাসা করে।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে তাকান।

"আমাদের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে কিছু বেশী হতে পারে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "বিগত যুদ্ধে যেসব মুজাহিদ আহত হয়েছিলো তারা আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ হয়ে লড়াইয়ে ফিরে এসেছে। আমার ধারণানুপাতে আমাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার হবে। আমাদের একটি প্লাস পয়েন্ট হলো, মুজাহিদ বাহিনী দীর্ঘ বিশ্রাম লাভের সুযোগ পেয়েছে।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) মিলে প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরী করেন যে, রোমীয়দের এক লাখ সৈন্যের মোকাবেলা কীভাবে করা হবে। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) ময়দানে লড়াইরত সালারদের জন্য এই নিয়ম বলবৎ রেখেছিলেন যে, কোনো বড় যুদ্ধ পরিকল্পনা নেয়া হলে, তার থেকে অনুমোদন নিতে হবে। হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কতক রণাঙ্গনের পরিকল্পনা তিনি মদীনায় বসে চূড়ান্ত করে সালারদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিতেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) উক্ত রীতি অনুযায়ী একজন দ্রুতগামী দূত মদীনায় পাঠিয়ে দেন। তাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়, তার মধ্যে নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল এবং এ প্রেক্ষিতে তাদের পরিকল্পনাও বিস্তারিতভাবে ঐ পত্রে উল্লেখ ছিল।

হাতে সময় ছিল খুবই কম। শত্রুপক্ষ কয়েকগুণ বেশি সৈন্য এনেছিল। কিছুই বলা যাচ্ছিল না যে, তারা কখন কী করে বসে। তবে মুসলমানদের বার্তা প্রেরণ ব্যবস্থা এত দ্রুততর ও উন্নত ছিল যে, সামান্য সময়ের ব্যবধানে অনেক দূর-দূরান্তে বার্তা পৌঁছে যেত।

অল্প সময়ে দূত মদীনায় পৌঁছে যায়। আমীরুল মুমিনীন চলমান পরিস্থিতি ও তার প্রেক্ষিতে নেয়া পরিকল্পনা সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। এতে তিনি সামান্য কিছু রদবদল ঘটিয়ে পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন।

ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) দামেস্কে ছিলেন। তিনি সালারও ছিলেন আবার দামেস্ক শহরের প্রশাসকও ছিলেন। তাকে এই বার্তা দেয়া হয় যে, শত্রুরা দামেস্ক উদ্ধারে উঠে পড়ে লেগেছে এবং তিনি যেন সর্বক্ষণ দামেস্কে থাকেন। তাঁকে এই নির্দেশনাও দেয়া হয় যে, তিনি যেন দামেস্কের উত্তর-পশ্চিমের প্রতি পর্যবেক্ষক লোকদের মাধ্যমে নজর রাখেন। কেননা হতে পারে, রোমীয় এদিক থেকে আক্রমণ করবে।

সালার হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.) স্বীয় বাহিনীসহ ঐ এলাকায় ছিলেন, যেখানে বীসান এবং ফাহল অবস্থিত ছিল। হযরত উমর (রা.) বিশেষভাবে লিখেছিলেন যে, সালার শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.)-কে ঐ যুদ্ধের সালার নিযুক্ত করা হোক, যার জন্য রোমীয়রা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। হযরত খালিদ (রা.)-কে অগ্রবর্তী বাহিনীর সালার বানানো হয়েছিল। ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ত্রিশ হাজার মুজাহিদ বাহিনী রওনা হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল বীসানের একটু দূরে ফাহাল নামক স্থানে পৌছা। মুসলিম বাহিনী ফাহালে পৌছলে দেখা যায় যে, সেখানে রোমীয় বাহিনী নেই। রোমকদের পুরো বাহিনীর এখানে থাকার কথাও ছিল না। সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে, কয়েকটি বাহিনী সেখানে বিদ্যমান আছে কিন্তু তারাও ঐ এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেখানকার স্থানীয় লোকজন জানায় যে, রোমীয়দের সেই বাহিনী বীসান চলে গেছে, যেখানে তাদের সমস্ত সৈন্যের সমাবেশ ছিল।

মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হতে চায়। কিন্তু নদীর উভয় পাড়ে অনেক দূর পর্যন্ত জলাভূমি ছিল, যেখান দিয়ে চলাচল করা সম্ভব ছিল না। এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই জলাভূমি নদীর উভয় তীর হতে এক এক মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই এলাকাটি সমুদ্রের উপরিভাগ হতে কয়েকশ ফুট নীচু ছিল এবং সে যুগে স্থানটি ছিল নিম্নাঞ্চল।

খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে, নদীর কিনারা কোথাও হতে ভেঙ্গে যায়নি। তাহলে এত পানি কোথা থেকে এল, যা পুরো নিম্নাঞ্চলকে জলাভূমি বানিয়ে দিয়েছে?

"কিছু দূর উপরে গিয়ে দেখুন" এক স্থানীয় লোক বলে, "ফাহালে রোম বাহিনী থাকত। এখন সেখান থেকে চলে গেছে। উপরের দিকে গিয়ে তারা নদীতে পাথরের বাঁধ দিয়েছে এবং দুই কিনারা ভেঙ্গে দিয়েছে। এভাবে উপর থেকে এই পানি এখানে এসে জমা হয়েছে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।"

রোমীয়রা মুসলিম বাহিনীর গতি রুখতে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল রোমীয়রা হয়ত এই ভেবেছিল যে, মুসলমানরা মরুভূমি এবং ময়দানে চলতে এবং লড়াই করতে অভ্যস্ত; তারা জলাভূমি দিয়ে চলতে পারবে না।

যদি তারা এমনটি ভেবে থাকে তবে ঠিকই ভেবেছিল। জলাভূমি মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন বিষয় ছিল। তাদের জন্য মরু প্রান্তর এবং পাহাড়তলীও নতুন বিষয় ছিল। কিন্তু তারা পাহাড়ী এলাকাতেও লড়েছিল এবং শত্রুদের পরাস্ত করেছিল। তারা জলাভূমিও অতিক্রম করে যেতে পারত কিন্তু তাদের হাতে এত সময় ছিল না।

✪✪✪

সালার হযরত শুরাহবীল (রা.) জলাভূমি হতে কিছুদূর সরে গিয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে আবার ঢেলে সাজান। ডান এবং বাম পার্শ্ব বাহিনী হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর হাতে থাকে। হযরত খালিদের বাহিনীর কমান্ড হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.)-এর হাতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.)-কে ঐ বাহিনী দেয়া হয়, যাদের বীসানে যাওয়ার দরকার ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) সর্বাগ্রে ছিলেন। কিছু দূর সামনে গেলে জলাভূমিতে তার পা গেঁথে যায়। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী জলাভূমি মাড়িয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু জলাভূমি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঐ স্থান সামনে চলে আসে যেখানে জলাভূমি হতে পা বের করাও সম্ভব হচ্ছিল না। সুতরাং তিনি জলাভূমি হতে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করতে থাকেন। বের হওয়াও কষ্টকর হয়ে যায়। প্রানান্ত প্রয়াস চালিয়ে হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীসহ জলাভূমি হতে বেরিয়ে আসেন এবং ফাহাল ফিরে যান।

রোমীয় সালার সেকলার অভিজ্ঞ ছিল। সে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, সে এই ধোঁকাকে সফল মনে করেছিল যে, মুসলমানরা জলাভূমি হতে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এই জলাভূমি এলাকায় এমন স্থানও ছিল, যেখানে পানির নীচে জমিন খুব শক্ত ছিল এবং সেখানে কাদা ছিল না। সেখান থেকে পার হওয়া অতি সহজ ছিল। এই ধরনের রাস্তার জ্ঞান শুধু রোমীয়দের ছিল। সেকলার স্বীয় বাহিনীর একাংশকে পৃথক করে এবং তাদেরকে এক স্থানে জমা করে।

"রোম সাম্রাজ্যের রক্ষকগণ!" সে তার বাহিনীর উদ্দেশে বলে, "আজ তোমাদের শত্রুরা ফাঁদে পড়ে গেছে। মুসলমানরা জলাভূমি দিয়ে চলাচল করতে পারবে না। তারা জলাভূমির এপারে ফাহালে ক্যাম্প স্থাপন করেছে। যে জলাভূমিতে মুসলমানরা পার হতে পারেনি আমরা সে জলাভূমি দিয়ে চলে তাদের দেখিয়ে দিব। তারা মনে করবে, তাদের সামনে বিস্তীর্ণ জলাভূমি আছে যা তাদেরকে আমাদের হাত থেকে রক্ষা করবে। আমরা রাতে আক্রমণ করব। তখন তারা নিজ নিজ ক্যাম্পে গভীর ঘুমে বিভোর থাকবে। ...

"হে রোমবাসী! এটা রাতের যুদ্ধ হবে, যা সহজ হয় না। তবে আজ তোমাদেরকে ঐ সকল সঙ্গীর খুনের বদলা নিতে হবে, যারা এ পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে মারা গেছে। তোমরা তোমাদের শিকার পাবে ঘুমন্ত অবস্থায়। একজনও জীবিত বেরিয়ে যেতে পারবে না। তাদের ঘোড়া, যুদ্ধাস্ত্র এবং তাদের কাছে তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া যেসব মালামাল রয়েছে তা তোমরাই পাবে। যদি তোমরা এই সুবর্ণ সুযোগে তাদের খতম করতে পার, তাহলে বুঝবে তোমরা ইসলামকে মিটিয়ে দিয়েছ। আর এটাই হলো আমাদের মূল টার্গেট। সম্রাট হিরাকেলের এই ধারণা দূর করে দাও যে, আমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারি না।"

রোমীয় সৈন্যরা এই কথা শুনে যে, তারা মুসলমানদেরকে অজ্ঞাতে পেয়ে যাবে, জোশে ফেটে পড়তে থাকে। তাদের মাঝে কিছু সৈন্য ছিল যারা ইতিপূর্বে মুসলমানদের হাতে আহত হয়েছিল, কিছু পলায়নকারীও ছিল। তারা দাঁতে দাঁতে পিষছিল। তারা প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল। তারা মনে মনে মুসলমানদেরকে তাদের তলোয়ারে কাটতে এবং বর্শায় এফোঁড়-ওফোঁড় হতে দেখছিল।

✪✪✪

৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী মোতাবেক ১৩ হিজরীর ২৭ জিলকদ এর সূর্য ডুবে গেলে রোমীয় সালার সেকলার স্বীয় বাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়। সন্ধ্যা দ্রুত অন্ধকারে ছেয়ে যায়। প্রস্তুতি শেষে সেকলার যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেয়। জলাভূমি পেরিয়ে আসার রাস্তা তার জানা ছিল। সে নিজ বাহিনীকে ঐ নির্দিষ্ট পথে চালায়। যখন সমস্ত সৈন্য জলাভূমি পেরিয়ে আসে তখন সেকলার তাদেরকে ঐভাবে বিন্যাস করে যেভাবে হামলার সময় করা হয়। এবারের হামলা মূলত সরাসরি হামলা ছিল না বরং গেরিলা আক্রমণ ছিল। এক পক্ষের পদক্ষেপ ছিল।

বিন্যাস শেষে সেকলার সৈন্যদের ফাহালের উদ্দেশে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়। সে নিজে সকলের আগে ছিল। সে চলার গতি দ্রুততর রাখে, যাতে মুসলমানরা তাদের আগমনের খবর পেলেও সামলানোর সুযোগ না পায়।

এক সময় রোমীয়রা সেখানে পৌঁছে যায় যেখানে মুসলমানদের শিবির ছিল। কিন্তু এখন সেখানে কিছুই ছিল না। এতে সেকলার ক্ষিপ্ত হয়ে গোয়েন্দাদের দোষ দিতে থাকে যারা তাকে জানিয়েছিল যে, মুসলমানরা অমুক স্থানে ক্যাম্প করে অবস্থান করছে।

হঠাৎ তারা "আল্লাহু আকবার" নারাধ্বনি শুনতে পায়। একই সাথে অসংখ্য মশাল জ্বলে ওঠে। সেকলার দেখে যে, মুসলমানরা শুধু জাগ্রতই নয়; বরং তারা যুদ্ধ বিন্যাসে অপেক্ষমান।

সালার হযরত শুরাহবীল (রা.) অত্যন্ত সতর্ক সালার ছিলেন। তিনি যখন এখানে এসে জানতে পারেন যে, বিস্তৃত জলাভূমি হঠাৎ যেন উদয় হয়েছে, তখন তিনি অনুমান করে ফেলেন যে, রোমীয়রা শুধু তাদের রাস্তাই বন্ধ করেনি; বরং তারা আরও কিছু করবে। রোমীয়রা এটাই করতে পারে যে, তারা যে কোনো সময় হামলা চালাবে। সুতরাং এই ভাবা থেকে হযরত শুরাহবীল (রা.) সন্ধ্যার পর তাঁর বাহিনীকে শোয়ার পরিবর্তে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

এর পাশাপাশি তিনি জলাভূমির আশে-পাশে গোয়েন্দা নিয়োজিত করেন। এক গোয়েন্দা হযরত শুরাহবীল (রা.)-কে অবহিত করে যে, শত্রুরা আসছে। হযরত শুরাহবীল (রা.) একটি উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়েছিলেন। যা তিনি দিনের আলোয় নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি সে স্থানে মুজাহিদদের যুদ্ধ বিন্যাসে প্রস্তুত রেখেছিলেন।

"মদীনাবাসী!" সেকলার উচ্চ আওয়াজে মুসলমানদের আহ্বান জানায় "সামনে এসো। নিজেদের এবং সৈন্যদের পরিণাম দেখ।"

"হামলা করতে তোমরা এসেছ" হযরত শুরাহবীল (রা.) পাল্টা জবাবে বলেন, "তোমরা এগিয়ে এস। তোমরাই জলাভূমি পেরিয়ে এসেছ। এবার আমাদের জলাভূমি অতিক্রম করা দেখ। ... রোমীয়রা! তোমরা কালকের সূর্যোদয় দেখবে না।"

এভাবে পাল্টাপাল্টি হুংকার চলতে থাকে। পরিশেষে সেকলার তার এক বাহিনীকে হামলা চালানোর নির্দেশ দেয়। সে এই চাল চেলেছিল যে, তার বাহিনী হামলা করে পেছনে সরে আসবে। তাতে মুসলমানরাও তাদের সঙ্গে মিশে সামনে চলে আসবে। কিন্তু হযরত শুরাহবীল (রা.) প্রথমেই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমরা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করব। ফলে মুসলমানরা নিজ স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকে। রোমীয়রা ঢেউয়ের মত ছুটে এসে আক্রমণ করছিল আর মুসলমানরা সে হামলা প্রতিরোধ করছিল। নিজেদের বিন্যাস ভাঙ্গছিল না।

হযরত শুরাহবীল (রা.) রাতে কোনো চাল চালার ঝুঁকি নিতে চান না। তাঁর সৈন্যসংখ্যা রোমীয়দের তুলনায় খুব কম ছিল। রণকৌশল প্রয়োগের জন্য দিনের আলোর প্রয়োজন ছিল। সেকলার সম্ভবত এই ধোঁকা খেয়েছিল যে, মুসলমানদের লড়াই করার হিম্মত নেই। এই ভেবে সে একের পর এক আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মত হামলা বৃদ্ধি করে। কিন্তু মুসলমানরা সীসা ঢালা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারা মুসলমানদের ব্যূহ ছেদ করতে পারে না। মুসলমানরা এর মাঝে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখে যে, তারা সামনে এগিয়ে গিয়ে হামলা প্রতিহত করত অতঃপর পূর্বের স্থানে আবার ফিরে আসত। রোমীয়রা প্রতি আক্রমণে অসংখ্য আহত সৈন্য ফেলে রেখে পেছনে সরে যেত।

এবার আক্রমণে সেকলার নিজেই চলে আসে। সে তার বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে হুংকার দিতে দিতে দ্রুত গতিতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়। মশালের আলোয় মুসলমানরা রোমীয়দের ঝাণ্ডা দেখতে পায়। কয়েকজন মুজাহিদ রোমীয়দের সারি ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায় এবং সেকলারকে ঘিরে ফেলে। সেকলারের বডিগার্ডরা তাকে নিজেদের বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে নেয়।

বডিগার্ডদের তীব্র লড়াই হয় মুজাহিদদের সঙ্গে। এ সময়ে সেকলার কয়েক বার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে বডিগার্ডদের বেষ্টনী হতে যেদিক দিয়েই বের হতে চায়, মুসলমানরা তাকে বাধা প্রদান করে। এক মুজাহিদ এই ঘোরতর যুদ্ধ হতে কৌশলে বেরিয়ে আসে এবং সোজা সালার হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলে, এখন রোমীয়দের আর পিছিয়ে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। কেননা, কতক মুজাহিদ রোমীয়দের সালারকে ঘিরে ফেলেছে এবং সে এখন তাদের তলোয়ারের নাগালে।

হযরত শুরাহবীল (রা.) এ খবর পেয়েই কতক জানবায মুজাহিদ বাছাই করে তাদেরকে রোমীয়দের সম্মুখ বাহিনীতে ঢুকে পড়তে পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরেই মুজাহিদদের নারাধ্বনি শোনা যায় :

"খোদার কসম! আমরা রোমীয় সালারকে খতম করে দিয়েছি।"

"রোমীয়! তোমাদের পতিত ঝাণ্ডা তুলে নাও।"

"রোমবাসী! তোমাদের সালারের লাশ নিয়ে যাও।"

আকস্মিক এই আওয়াজে রোমীয়রা স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা উড্ডীন ঝাণ্ডা খুঁজে ফেরে। কিন্তু কোনো ঝাণ্ডার দেখা তারা পায় না। এতক্ষণ থেকে থেকে সালারের হুংকার শোনা গেলেও এখন আর সে হুংকার শোনা যাচ্ছিল না। এতে তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তাদের সালার নিহত হয়েছে। সালার নিহত হওয়ায় সৈন্যদের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে কোনো সহঅধিনায়ক ঝাণ্ডা তুলে নেয় এবং লড়াই অব্যাহত রাখে।

✪✪✪

ইতিমধ্যে পূর্বাকাশ জুড়ে সূর্যের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু রণাঙ্গনে প্রচুর ধুলাবালি উড়তে থাকায় সূর্য কেউ দেখতে পায় না। মুসলমানরাও শহীদ হয়েছিল। তবে রোমীয়দের নিহতের সংখ্যা ছিল বেশি। ময়দানে তাদের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তাদের যেসব সৈন্য আহত হয়ে ময়দানে পড়ে ছিল, তারা গড়িয়ে গড়িয়ে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হওয়া থেকে বাঁচতে চেষ্টা করছিল। রণাঙ্গন রোমীয়দের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

"ইসলামের ঝাণ্ডাবাহীগণ!" হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর উচ্চকণ্ঠ ধ্বনিত হয় "তোমরা রোমীয়দের তাদেরই খুনে গোসল করিয়ে দিয়েছ। তোমরা রাতভর তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছ। এবার আমাদের পালা।"

হযরত শুরাহবীল (রা.) তাঁর ডান পার্শ্ব বাহিনীর একটি বহরকে সামনে এগিয়ে দেন। রোমীয়রা হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু রাতভর তারা হামলা চালানো এবং পিছু হটার কারণে। তাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এর বিপরীতে হযরত শুরাহবীল (রা.) তাঁর বাহিনীর দৈহিক শক্তি নষ্ট হতে দেননি। এ উদ্দেশ্যেই তিনি সারারাত প্রতিরোধ যুদ্ধ করেন।

হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর ডান পার্শ্ববাহিনীর একটি দল বাইরের দিক দিয়ে আক্রমণ করে। এতে করে রোমীয়রা সেদিকে পার্শ্ব বাড়াতে বাধ্য হয়ে যায়। হযরত শুরাহবীল (রা.) তৎক্ষণাৎ রোমীয়দের অপর পার্শ্ব বাহিনীর উপর আরেকটি এমন হামলায় চালায় এবং সে পার্শ্বকেও সম্মুখ বাহিনী হতে পৃথক করে দেন। এতে করে রোমীয়দের উভয় বাহু মূল বাহিনী হতে অনেক দূর সরে যায়। এ সময় হযরত শুরাহবীল (রা.) নিজের নেতৃত্বে নিজের সম্মুখ বাহিনী দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণ করাতে তাদের এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

রোমীয়রা সারারাত জাগ্রত থাকায় ক্লান্ত-শ্রান্ত ছিল এবং তাদের সালারও মারা গিয়েছিল। স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিল যে, তাদের মাঝে লড়াই করার প্রেরণা ও শক্তি ছিল না। মুসলমানদের দুই পার্শ্ব বাহিনী শত্রুদের উভয় পার্শ্বকে আরও বেশি বিস্তৃত করতে থাকে। তারা এত দূর চলে যায় যে, এখন তাদের পক্ষে সম্মুখ বাহিনীর সাহায্যে ছুটে আসা সম্ভবপর ছিল না।

মুসলমানদের দুই পার্শ্ব বাহিনীর সালার কোনো সাধারণ সালার ছিল না। তারা ছিলেন ইতিহাস সৃষ্টিকারী সালার হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)। আর সম্মুখভাগের কয়েকটি বহরের সালার ছিলেন হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)। রোমীয়দের জন্য হযরত খালিদ (রা.) ত্রাসের অপর নাম হয়ে গিয়েছিলেন।

অশ্বারোহী বহরের সালার ছিলেন হযরত যাররার (রা.)। তিনি রোম সাম্রাজ্যের সৈন্যদের মাঝে এ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, তিনি ময়দানে নেমে শিরস্ত্রাণ ও জামা খুলে ফেলে কোমর পর্যন্ত নগ্ন হয়ে যেতেন এবং এভাবেই লড়তেন। তিনি একাকী যুদ্ধ করেন কিংবা কোনো দলের কমান্ড দিতেন, সর্বাবস্থায় এত দ্রুত প্রান্ত বদল করতেন যে, দুশমন চোখের পলকে তাঁর বর্শায় গেঁথে যেত অথবা তাঁর তলোয়ারে কাটা পড়ত।

মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ছিল। সালারগণ নিজস্ব বীরত্ব, অসাধারণ নেতৃত্ব এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রণকৌশল ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সে কমতি পুষিয়ে দেন। যার

ফলে রোমীয়দের সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও সূর্যাস্তের কিছু পূর্ব হতে তারা রণাঙ্গন হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে। রোমীয়দের মাঝে এই গুণ ছিল যে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পালাত না; বরং তাদের পিছপাও সুশৃঙ্খল হত। কিন্তু ফাহাল রণাঙ্গন হতে তারা বিশৃঙ্খলভাবে পালাতে থাকে। তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের এত বেশি প্রাণহানী ঘটে যে, তাতে তাদের সংখ্যাই শুধু হ্রাস পায়নি; বরং রক্তের স্রোত দেখে তাদের মাঝে রীতিমত ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

✪✪✪

তাদের এভাবে অবিন্যস্ত পিছু হটার আরও কারণ ছিল। তাদের সালার সেকলার তাদেরকে জলাভূমি হতে বের করে এনেছিল। সে জানত, জমিন কোথায় শক্ত, যেখানে পা কাদায় আটকে যাবে না। কিন্তু এখন তাদের সঙ্গে সেই সালার ছিল না। তার লাশ যুদ্ধের ময়দানে পড়ে ছিল। সিপাহীরা এ কারণে পালানো শুরু করে দেয়, যাতে তারা দ্রুত জলাভূমি পেরিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারে।

মুসলিম সালার হযরত শুরাহবীল (রা.) যখন শত্রুদের এভাবে পালাতে দেখেন তখন তাঁর জলাভূমির কথা মনে পড়ে। ফলে তিনি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী মুসলিম সেনারা নারাধ্বনি তুলে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে রোমীয়রা আরও দ্রুত গতিতে দৌড়ায়। কিন্তু জলাভূমি তাদের চলার গতি শ্লথ করে দেয়। হুলস্থুল এবং বিক্ষিপ্ততার মধ্যে তাদের স্মরণ থাকে না যে, জলাভূমির কোন স্থান দিয়ে তারা পেরিয়ে এসেছিল। তাদের পশ্চাতেও ছিল মৃত্যু, সম্মুখেও ছিল মৃত্যুর ফাঁদ। তারা মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচতে জলাভূমিতে নেমে পড়ে এবং ক্রমেই কাদার মধ্যে ধ্বসে যেতে থাকে। মুসলমানরাও তাদের পিছু পিছু জলাভূমি দিয়ে চলতে থাকে এবং তাদেরকে নির্দয়ভাবে কাটতে থাকে। যেসব রোমীয় সৈন্য জলাভূমির গভীরে চলে গিয়েছিল, তাদেরকে তীরের নিশানায় পরিণত করা হয়।

দরিয়ার পানি ছেড়ে দিয়ে রোমীয়রা মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রুখতে যে জলাভূমি তৈরী করেছিল এখন তা তাদের জন্যই মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়ে যায়। ফাহালের এই যুদ্ধকে 'কাদার যুদ্ধ' বলে। এ রণাঙ্গন হতে খুব কমই রোমীয় সৈন্য বেঁচেছিল। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তারা বীসানে চলে গিয়েছিল।

এ যুদ্ধে দশ হাজারের মত রোমীয় মারা পড়েছিল। যারা আহত হয়ে ময়দানে পড়ে ছিল তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক। মারাত্মক জখমী হওয়ায় তাদের পক্ষে পলায়ন করা সম্ভব ছিল না।

✪✪✪

সালার হযরত শুরাহবীল (রা.) এখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করা ভাল মনে করলেন না। তিনি শত্রুদের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকতে চাচ্ছিলেন। যাতে শত্রুরা পুনরায় সুসংঘটিত না হতে পারে। তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে কিছু সৈন্যসহ ফাহালে অবস্থান করতে রেখে যান এবং নিজে বাকী সৈন্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। কিন্তু জলাভূমি আবার তার গতিরোধ করে। তিনি দু'-তিনজন রোমীয় সৈন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, জলাভূমি পেরিয়ে যাবার রাস্তা কোনটি?

আহত রোম সৈন্যরা আরেকটি রাস্তার সন্ধান দেয়। তবে সে পথটি ছিল অনেক দূরে এবং বিদঘুটে। অবশ্য সে দূর পথে চললেও ততটুকু সময় ব্যয় হবে, যা জলাভূমি দিয়ে গেলে ব্যয় হত। হযরত শুরাহবীল (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে নিজ নিজ বাহিনীসহ ফাহালে রেখে নিজে ঐ দূরের রাস্তা দিয়ে জলাভূমি পেরুবার জন্য যান, যে রাস্তার সন্ধান রোমীয় আহত সৈনিকরা তাঁকে দিয়েছিল। তাঁকে জর্দান নদীও পার হতে হয়। তিনি এ পথে সামনে অগ্রসর হয়ে বীসান অবরোধ করেন।

বীসানে রোমীয়দের প্রচুর সৈন্য ছিল। হিরাকেল সৈন্যাধিক্যের বলে মুসলমানদের চূড়ান্তকারী বরং নির্মূলকারীভাবে পরাস্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনার প্রথম ধাপই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ফাহালের পলায়নপর কিছু সৈন্যের ভাগ্য ভাল ছিল যে, তারা অক্ষতভাবে জলাভূমি পেরিয়ে আসতে পেরেছিল। তাদের আশ্রয়স্থল ছিল বীসান।

বীসানের সালার এই সংবাদের অপেক্ষায় ছিল যে, তার বন্ধুবর সালার সেকলার মুসলমানদের তাদের অজান্তে নির্মূল করতে পেরেছে এবং মুসলমানদের পক্ষ হতে হামলার সম্ভাবনা চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু চতুর্থ সন্ধ্যায় বীসানে সর্বপ্রথম এক আহত রোমীয় সৈন্য প্রবেশ করে। আহত হওয়ার পাশাপাশি তার মাথাও স্বাভাবিক ছিল না। ক্লান্তি এবং ভয়ে তার চোখ বের হওয়ার উপক্রম ছিল। তার ঠোঁট ছিল উন্মুখ– সে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার যোগ্যও ছিল না।

ঐ সৈনিক বীসানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বীসানে অবস্থানরত সৈন্যরা তাকে ঘিরে ধরে এবং জিজ্ঞাসা করে, খবর কী?

"কচুকাটা কেটেছে" সিপাহী ভীতি ও উদ্বেগে কম্পিত কণ্ঠে বলে, "সবাইকে হত্যা করেছে।"

"মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে?" তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়।

"না" সিপাহী জবাবে বলে, "তারা আমাদের কচুকাটা কেটেছে। "কাদাও আমাদের জ্যন্ত মেরেছে।"

তার সঙ্গে আরও কয়েকজন সিপাহী ছিল। তাদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাও ঐ সিপাহীর মত ছিল। তারা সবাই এমন সব কথা শুনায়, যাতে নিরাশা ও ভীতি সৃষ্টি করে। তাদের কথা বীসানে অবস্থানরত সিপাহীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তাদের মাঝে এমন সৈন্যও ছিল, যারা কোনো না কোনো যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে লড়েছিল। তারা ফাহাল থেকে আসা সৈন্যদের কথায় বিভিন্ন রং মেশায়। সব মিলিয়ে রোমীয় সৈন্যদের উপর এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে।

"আমার মতে তারা মানুষই নয়" এক সৈন্য মুসলমানদের ব্যাপারে বলে, "আমাদের সৈন্য যেখানেই যাক না কেন মুসলমানরা সেখানে উড়ে গিয়ে পৌঁছে।"

"তাদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক কম" আরেক সিপাহী বলে, "কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে তাদের সংখ্যা আমাদের থেকে অনেক গুণ বেশি দেখা যায়।"

✪✪✪

ভীত-সন্ত্রস্ত আহত সৈন্যদের যেসব কথা ঝড়ের বেগে সর্বস্থানে ও সর্বস্তরে পৌঁছে গিয়েছিল তা দ্রুত সত্য প্রমাণিত হয়। একটি আওয়াজ ওঠে "মুসলমানরা এসে গেছে। মুসলমানরা শহর অবরোধ করে ফেলেছে।" এর সঙ্গে সঙ্গে বীসান শহরে হুলস্থুল পড়ে যায়। শহরের কারো পক্ষে কেল্লার বাইরে যাবার উপায় ছিল না। কেল্লার দরজা ইতিপূর্বেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শহরবাসী ভেতরেই লুকানোর চেষ্টা করছিল। টাকা-পয়সা ও স্বর্ণ ইত্যাদি ঘরের বিছানার তলে লুকাতে থাকে।

রোমীয় সৈন্যরা কেল্লার প্রাচীর এবং মিনারায় গিয়ে দাঁড়ায়।

"রোমবাসী!" হযরত শুরাহবীল (রা.) হুংকার দিয়ে বলেন, "রক্তপাত ছাড়াই কেল্লা আমাদের হাতে তুলে দাও।"

জবাবে কেল্লার উপর হতে তীর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তবে মুসলমানরা তাদের তীরের নাগালের বাইরে ছিল।

"রোমবাসী!" হযরত শুরাহবীল (রা.) পুনরায় ঘোষণা করেন, "অস্ত্র সমর্পণ কর। কর দেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ কর। যদি এটাও না মান, তাহলে মনে রেখ, আমরা বীসানের প্রত্যেকটি ইট খুলে ফেলব। তোমরা সবাই মরে যাবে অথবা আমাদের কয়েদী হবে। আমরা কাউকে ক্ষমা করব না।

রোমীয় সৈন্যদের মাঝে মুসলমান ত্রাস বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু সৈন্যদের সালার ও অন্যান্য কর্মকর্তারা বীর যোদ্ধা ছিল। তারা নিজেদের সমর ইতিহাস-ঐতিহ্য হতে এত তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ছিল না। ফলে তারা না অস্ত্র সমর্পণে আগ্রহ প্রকাশ করে, না কর দেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

মুসলমানরা এক দিন এক রাত অবিরাম লড়েছিল। এরপর তারা পলায়ন পর রোমীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করে। এখন তারা বীসানে এসেছিল। তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। হযরত শুরাহবীল (রা.) তাদের বিশ্রাম দানের জন্য তৎক্ষণাৎ কেল্লার উপর চড়াও হন না। অবশ্য নিজে কেল্লার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন যে, দেয়াল কোনো স্থান হতে দুর্বল কিংবা কোনো স্থানে সুড়ঙ্গ খনন করা যায় কি না।

অবরোধ সাত-আট দিন অব্যাহত থাকে। এতে রোমীয় সৈন্যরা এই ভেবে খুশি হয় যে, মুসলমানরা কেল্লার উপর চড়াও হওয়ার হিম্মত রাখে না। তবে রোমীয় সালার এটাও দেখছিল যে, তার বাহিনীর হিম্মতও নিম্নগামী। সে নিজ বাহিনীর প্রেরণা উজ্জীবিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা কেল্লা হতে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করবে এবং কেল্লার অভ্যন্তরের ফায়সালা কেল্লার বাইরেই সেরে ফেলবে।

পরের দিন কেল্লার সকল দরজা খুলে যায় এবং প্রত্যেক দরজা দিয়ে রোমীয় সৈন্য বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত বের হয়। তাদের বেশির ভাগ ছিল অশ্বারোহী। তারা কেল্লা হতে বেরিয়েই তুফানের গতিতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। মুসলমানদের জন্য এই আক্রমণ ছিল অপ্রত্যাশিত। তাদের সংখ্যাও ছিল রোমীয়দের চেয়ে কম।

প্রথম দিকের অবস্থা বলছিল, রোমীয়রা মুসলমানদের উপর চেপে বসেছে এবং মুসলমানরা অতর্কিত আসা এ ধাক্কা সইতে পারবে না। কিন্তু হযরত শুরাহবীল (রা.) যেনতেন সালার ছিলেন না। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখেন এবং দূত পাঠিয়ে পাঠিয়ে ও নিজে ভীষণ তৎপর হয়ে সৈন্যদের দ্রুত পিছু হটে যাবার নির্দেশ দেন।

মুসলমানরা এই নির্দেশ তৎক্ষণাৎ মান্য করে এবং নিজেদের অবস্থানস্থল থেকে পেছনে সরে আসে। এর পাশাপাশি হযরত শুরাহবীল (রা.) এক দল মুজাহিদকে কেল্লার দরজার কাছাকাছি পাঠিয়ে দেন। তাদের বেশির ভাগ ছিল তীরন্দায। তাদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে, রোমীয়রা পেছনে ফিরে এসে দরজা দিয়ে ঢুকতে চাইলে, তাদের উপর এভাবে তীর বর্ষণ করবে যে, তারা যেন দরজার নিকটেই আসতে না পারে।

হযরত শুরাহবীল (রা.) এবং তাঁর কমান্ডারগণ স্বীয় বাহিনীকে অবরোধের বিন্যাস ভেঙ্গে যুদ্ধের বিন্যাসে বিন্যস্ত করেন। মুজাহিদরা এতখানি পেছনে সরে আসে যে, রোমীয়রা কেল্লার অনেক দূরে চলে যায়। এবার হযরত শুরাহবীল (রা.) নিজের গতিতে জবাবী হামলা চালান। রোমীয়রা হামলার মাঝে এতটা মগ্ন ছিল যে, তাদের পশ্চাতে কী হচ্ছে তার খবর ছিল না। মুসলমানরা নিজেদের

গুছিয়ে নিয়ে হামলা চালালে রোমীয়রা অবিন্যস্ততার দরুন হামলা মোকাবেলা করতে পারে না। তারা কেল্লার দিকে দৌড়ে গেলে সেখানে অবস্থানরত মুজাহিদদের তীর তাদের ধরাশায়ী করতে থাকে। মুসলিম তীরন্দাযগণ অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং ধ্বংসমুখর ছিল।

রোমীয়দের যুদ্ধ প্রেরণা পূর্বের থেকে ভঙ্গুর ছিল। এবার সর্বশেষ প্রেরণাটুকুও লোপ পেয়ে যায়। রোমীয়দের প্রাণহানী এত বেশি ছিল যে, যা সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরিশেষে তারা অস্ত্র সমর্পণ করে এবং হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর শর্ত মেনে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তারা কর এবং কিছু রবিশস্য প্রদানের শর্তও মেনে নেয় এবং কেল্লা মুসলমানদের হাওলা করে দেয়।

৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৩ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের শেষ সপ্তাহে বীসান পরিপূর্ণভাবে মুসলমানদের কব্জায় চলে আসে।

ওদিকে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) ফাহালের উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

✪✪✪

ইন্তেকিয়ার বড় ঘন্টা বাজছিল। এটা অনেক বড় ঘন্টা ছিল। এ ঘন্টার আওয়াজ সারা শহরে শোনা যেত। সুবহে সাদিকের নীরবতায় তার 'ডন ডনা ডন' আওয়াজ আরও বেশি জোরে শোনা যাচ্ছিল। এটা ছিল ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের একটি প্রভাত। গির্জার ঘন্টা প্রায় বেজে থাকে এবং মানুষ তার আওয়াজে পবিত্রভাব অনুভব করত। ঘন্টাধ্বনি মানুষের মাঝে এমন প্রভাব ফেলত, যেন এ ধ্বনি তাদের আত্মাকে আকুল করে তোলে। কিন্তু ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের এক প্রত্যুষে ঐ ঘন্টার আকুলকারী আওয়াজের মাঝে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল। ঐ প্রতিক্রিয়ার মাঝে নিরাশা চুইয়ে পড়ছিল এবং ভীতি সঞ্চারও করছিল।

ঐ ঘন্টার আওয়াজ রোম সম্রাট হিরাকেলের মহলেও শ্রুত হচ্ছিল। হিরাকেল ঘুমানোর চেষ্টা করছিলেন। এটা জেগে থাকার সময় ছিল। কিন্তু তিনি সারা রাত ঘুমাতে পারেন না। রণাঙ্গনের খবর তাকে ঘুমাতে দিচ্ছিল না। তিনি মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রুখা এবং তাদেরকে চিরতরে খতম করার জন্য যে পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন তা ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছিল। মুসলমানরা তুফানের গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। হিরাকেল রাত জেগে জেগে নিত্য নতুন পরিকল্পনা তৈরী করতেন। কিন্তু তার সকল পরিকল্পনা ও অভিলাষ মুসলমানদের ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হচ্ছিল।

এক অত্যন্ত সুন্দরী ও ষোড়শী তরুণী হিরাকেলের কামরায় প্রবেশ করে। মেয়েটি ছিল তার নব স্ত্রী যারান।

"সম্রাট আজ রাতেও ঘুমান নি!" যারান বলে, "আপনি কেন সেসব সালার ও সৈন্যদের সকলের সামনে হত্যা করেন না, যারা পরাজিত হয়ে ফিরে আসে? তারা নিজেদের জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে আসে এবং অন্যান্য সৈন্যদের মাঝে কাপুরুষতা ছড়ায়।"

সম্রাট হিরাকেল পালঙ্কে শোয়া ছিলেন। যারান তার শিয়রে গিয়ে বসে পড়ে। হিরাকেল উঠে দাঁড়ান এবং কামরায় পায়চারি করতে থাকেন।

"যারান!" সম্রাট পায়চারি থামিয়ে বলেন, "তারা মুসলমানদের হাতে নিহত হচ্ছে। অথচ তুমি বলছ, জীবন নিয়ে পালিয়ে আসা সৈন্যদেরকে আমি যেন হত্যা করি। আমি তাদের খোদা নই। এরাই তো তারা, যারা একদিন ইরানীদের আমার পদতলে এনে বসিয়ে দিয়েছিল। পারস্যরা যে একেবারে দুর্বল ছিল তা তো নয়। আমাদের সমপাল্লার জাতি। মুসলমানরা তাদেরকেও প্রতি রণাঙ্গনে পরাজিত করেছে। এখন তারা আমাদেরকেও পরাজিত করে চলছে। আমি মুসলমানদের গুরুত্ব দিই। যদি আমাদের সালাররা অস্ত্র সমর্পণ করে থাকে তবে তার অর্থ এই নয় যে, তারা দুর্বল। বরং আসল কথা হলো, মুসলমানরা অধিক শক্তিশালী। তাদের সালারদের বিবেক-বুদ্ধি বেশি।

"তবে কি সম্রাট নিরাশ হয়ে গেছেন?" যারান জিজ্ঞাসা করে।

"না!" হিরাকেল বলে, "এটা নিরাশার কথা নয়। এক যোদ্ধা আরেক যোদ্ধার প্রশংসা করছে। মুসলামানরা নীচ শত্রু নয়। যদি তারা আমাকেও অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করে তবে তুমি আমার কাছেই থাকবে। তারা তোমাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিবে না।"

যারান সম্রাটের মন ভুলাতে এসেছিল। তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে এসেছিল। সে ছিল হিরাকেলের মনের মত স্ত্রী। সে হিরাকেলকে কীভাবে ভুলাতে হয় তা জানত। কিন্তু হিরাকেল এবার তাকে বেশি গুরুত্ব দেয় না।

গির্জার ঘণ্টা সমানে বাজছিল।

"মানুষ গির্জায় যাচ্ছে" যারান বলে, "সকলে আপনার বিজয়ের জন্য দোয়া করবে।"

হিরাকেল যারানকে চকিত ফিরে দেখে যেন মেয়েটি তাকে উপহাস করেছে। হিরাকেল যারানের কথা কুৎসিত উপহাস মনে করে পাত্তা দেয় না।

"শুধু দোয়া কখনও পরাজয়কে জয়ে পরিণত করতে পারে না যারান!" হিরাকেল বলেন, "যাও, আমাকে চিন্তা করতে দাও। এখন তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই।"

সম্রাট হিরাকেল জানতে পেরেছিলেন যে, তার সালার সেকলার মুসলমানদের গতিরোধ এবং তাদের ফাঁসানোর জন্য যে জলাভূমি সৃষ্টি করেছিল, সেই জলাভূমি

তাদের লাশে ভরে গেছে, ফাহাল নামক স্থানে সেকলার মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে এবং মুসলমানরা বীসানও দখল করে নিয়েছে।

হিরাকেলের এই পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায় যে, তিনি দামেস্কে হামলা করবেন না এবং তা অবরোধও করবেন না; বরং স্বীয় বাহিনীকে দামেস্কের বাইরে রেখে দামেস্কগামী রাস্তা বন্ধ করে দিবেন। অতঃপর মুসলমানদের বিক্ষিপ্তভাবে লড়াবেন। কিন্তু মুসলমানরা তার পরিকল্পনার প্রথম অংশকেই ফাহালে ব্যর্থ করে দেয়।

✪✪✪

রোমের সম্রাট হিরাকেল হিম্মত হারাবার মত লোক ছিলেন না। তাঁর জীবনটাই কেটেছে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়েছিলেন, যাকে কাজে লাগিয়ে তিনি অনেক ভয়াবহ অবস্থার গতিমুখকে পরিবর্তন করে নিজের অনুকূলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোম সম্রাট হয়েছিলেন। সে সময় উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ, গ্রীক এবং তুর্কীর কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রোম সাম্রাজ্য মূলত আরও বিস্তীর্ণ থাকলেও যখন হিরাকেল সম্রাট হন তখন এই বিশাল সাম্রাজ্য সংকুচিত এবং তাতে ধ্বস শুরু হয়েছিল।

হিরাকেল তাঁর শাসনামলের বিশ বছর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে এবং মহল ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে থাকেন। তার সাম্রাজ্যের দুশমন সাধারণ কোনো জাতি ছিল না। একদিকে ছিল পারস্য সাম্রাজ্য। অপর দিকে ছিল বর্বর জাতি, যারা বড়ই জালেম বীর যোদ্ধা ছিল। এ ছাড়াও ছিল তুর্কী জাতি, যাদের সমর শক্তি এবং দক্ষতা ছিল সর্বস্বীকৃত। এটা হিরাকেলের অসাধারণ ব্যবস্থাপনা প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা এবং সমর নেতৃত্বের পরাকাষ্ঠা ছিল যে, তিনি এই ত্রিমুখী শত্রুকে পরাস্ত করে রোম সাম্রাজ্যকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন পর্যন্ত সম্প্রসারিত এবং সুদৃঢ় করেছিলেন।

এসব শক্তিশালী দুশমনদের বিরুদ্ধে লাগাতার যুদ্ধ বিগ্রহ হতে হিরাকেলের সৈন্যরা অভিজ্ঞ এবং সুশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল। শৃঙ্খলাও এমন ছিল যে, পিছু হটার সময়েও তারা শৃঙ্খলা ও বিন্যাস বজায় রাখত। হিরাকেলের বাহিনীতে কেবল রোমীয় সৈন্যই ছিল না; বরং আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তার সেনাবাহিনীতে ছিল। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের ঈসায়ীরাও ছিল। তবে এসব ঈসায়ীদের উপর তার পূর্ণ ভরসা ছিল না। তাদের ব্যাপারে হিরাকেলের দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল যে, এসব লোক মালে গণীমতের জন্য লড়াই করে এবং যেখানে শত্রুদের জয়ের সম্ভাবনা দেখে সেখান থেকে পলায়ন করে।

মুসলমানদের হিরাকেল আরবের 'বুদ্দু' বলতেন। তিনি মুসলমানদের মরু ডাকাত ও লুটেরাও বলেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি এটা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, এখন তাদের যুদ্ধ এমন শক্রর সঙ্গে হচ্ছে, যারা তাঁর বাহিনীর চেয়েও সমর বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণতা রাখে। হিরাকেল মেনে নিয়েছিলেন যে, মুসলমানরা একটি টার্গেট নিয়ে লড়ছে। সে টার্গেট মেনে নেয়া হিরাকেলের জন্য সম্ভব ছিল না। এটা ছিল ধর্মীয় প্রশ্ন। কিন্তু তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, মুসলমানরা ভূখণ্ড করায়ত্ব ও ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য ঘর হতে বের হয় নি; বরং তারা একটি বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার জন্য জান কুরবানী দিচ্ছে।

✪✪✪

"আমি স্বীয় বাহিনীর মাঝে ঐ প্রেরণা সৃষ্টি করতে অক্ষম যা মুসলমানদের মাঝে আছে" সেদিন হিরাকেল ইন্তেকিয়া অবস্থানরত সালারদের ডেকে বলেন, "তোমাদের সৈন্যদের বলবে যে, তারা যেন নিজ নিজ আকীদা-বিশ্বাস রক্ষার জন্য লড়াই করে। তাদের বলবে, যেসব এলাকা মুসলমানরা দখল করে নিচ্ছে, সেখানকার লোকেরা স্বীয় মাজহাব ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করে চলেছে। তাদের বলো যে, আর কিছুর জন্য না হোক, অন্তত নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়াই কর। নিজেদের যুবতী মেয়ে ও বোনদেরকে মুসলমানদের থেকে বাঁচানোর জন্য অস্ত্র ধর।"

হিরাকেল পরে সালাদেরকে রণাঙ্গনের তাজা সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন।

"এখন কি তোমরা এটা অনুভব করছ না যে, আমাদের পরিকল্পনা পাল্টাতে হবে?" হিরাকেল তার সালাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন।

"মুসলমানদের উপর বেশির থেকে বেশি সৈন্য নিয়ে হামলা করা দরকার" এক সালার বলে।

"এটা তো আমি করতেই চাই" হিরাকেল বলেন, "আমি এত বেশি এবং সার্বিক দিকে দিয়ে এত শক্তিধর বাহিনী প্রস্তুত করছি, যাদের দেখে পাহাড়ও কেঁপে উঠবে। আমরা যেসব এলাকা হারিয়ে ফেলেছি তার জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। এসব ভূখণ্ড আবার ফিরে আসবে। আমি তোমাদের কারো চেহারায় নিরাশার ছায়া দেখতে চাই না। আমি লাগাতার বিশ বছর ধরে লড়াই করে রোম সাম্রাজ্যের মর্যাদা বহাল রেখেছি। এখনও তেমন করব। কিন্তু কথা হলো, তোমরা যদি মুসলমানদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ো, তাহলে আমার ব্যর্থতা অনিবার্য।"

সালাররা একের পর এক তাকে তেজস্বী কণ্ঠে নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা রোম সাম্রাজ্যের ইজ্জত রক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিবে।

"কথায় জোশ চাই না, যুদ্ধের ময়দানে জোশ দেখাতে হবে" হিরাকেল বলেন, "এটা আমি জানি যে, তোমরা জান কুরবানী করবে। কিন্তু ইতিহাস এটা দেখবে যে, তোমাদের জীবন কোন কাজে ব্যয় হয়েছে এবং তোমরা শত্রুদের মেরে মরেছিলে না কি যুদ্ধে স্বাভাবিকভাবে যেভাবে সৈন্যরা মারা যায় সেভাবে মরেছিলে। ...

"এবার শোনো, আমাদের করণীয় কী। আমি প্রথমে দামেস্ক আক্রমণ করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু এখন দামেস্ক অবরোধ করে ঐ শহর আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে। সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দামেস্কের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। এটা এক সময় আমাদের সেনানিবাস ছিল। এখন একে মুসলমানরা তাদের কেন্দ্র বানিয়েছে। এই শহর অবশ্যই আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।"

হিরাকেল তাঁর এক সালার সেন্সকে বলেন, তুমি হিমস থেকে স্বীয় বাহিনীসহ দামেস্ক যাও।

"... আর থিয়োডার্স!" হিরাকেল আরেক সালারকে লক্ষ্য করে বলেন, "তুমি নিজের সঙ্গে অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এখনিই দামেস্ক রওনা হয়ে যাও। গতি খুব দ্রুত হতে হবে, যাতে মুসলমানদের কোনো সাহায্যকারী বাহিনী তোমাদের পূর্বে দামেস্ক না পৌঁছতে পারে। সেন্স তোমার সাহায্যের জন্য তোমাদের নিকটেই থাকবে। দামেস্ক অধিকার করে আমরা আবার তাকে সেনা হেডকোয়ার্টার বানাব। ... এখন দুনিয়ার কথা ভুলে যাও। স্ত্রী ও পরিজনদের কথা ভুলে যাও। কেউ একবার পরাজিত হলে তার খাওয়া-ঘুম থাকার কথা নয়।"

হিরাকেল ইতিহাস ভিত্তিক গুরুত্বের কথা এভাবে বলেন, "যে জাতি তাদের পরাজয়ের কথা ভুলে যায়, তাদেরকে যুগ ভুলে যায়। আর যে জাতি তাদের শত্রু হতে নজর ফিরিয়ে রাখে তারা একদিন শত্রুদের গোলাম হয়ে যায়। ... তোমাদের মান-সম্মান সাম্রাজ্যের মান-সম্মানের সঙ্গে বাঁধা। সাম্রাজ্যের মান-মর্যাদা যদি ধরে রাখতে না পার, তাহলে তোমরা মর্যাদাহীন জীবন-যাপন করবে এবং অপরিচিত লোকের মত মৃত্যুবরণ করবে।"

ঐতিহাসিক লিখেন, হিরাকেলের বলার ভঙ্গিতে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তার ছাঁপ ছিল। তার কণ্ঠ শাসকসুলভ ছিল না। কিন্তু তার প্রতিটি কথা সালারদের উপর তেমন প্রভাব ফেলছিল, যেমনটি হিরাকেল সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল।

সালার থিয়োডার্স এবং সালার সেন্স তখনই নয়া দিক-নির্দেশনাসহ রওনা হয়ে যায়।

✪✪✪

হিরাকেল যখন দামেস্ক পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ওদিকে তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) ফাহালের উত্তর দিকে যাচ্ছিলেন।

মুসলিম বাহিনী এখন পূর্বের বাহিনীর মত ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) যখন সর্বাধিনায়ক ছিলেন, তখন তিনি সৈন্যদের সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত করেছিলেন। মুজাহিদ বাহিনী পূর্ব হতেই সুশৃঙ্খল ছিল। তাদের খোদা এক, রসূল এক, কুরআন এক এবং আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গিও এক ছিল। সালার হতে সিপাহী পর্যন্ত সকলেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত ছিল। তারপরেও তাদেরকে পারস্য ও রোম বাহিনীর মত সুশৃঙ্খল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। সময়ের প্রয়োজনে হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে আরও ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তিনি গোয়েন্দা ধারাও মজবুত করেছিলেন। এ ছাড়া হযরত খালিদ (রা.) একটি অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, যারা ছিল যেমন জানবায তেমনি তারা চোখের পলকে ঐ স্থানে গিয়ে পৌঁছত, যেখানে সাহায্যের প্রয়োজন পড়ত। তবে এ বাহিনীর সদস্য ছিল খুবই কম। ক্রমে এদের সংখ্যা কমছিল এবং তারা স্বীয় মাতৃভূমি হতে ক্রমেই দূরে সরে পড়ছিল।

সেটি ছিল ইসলামী ইতিহাস নির্মাণের সময়। আল্লাহ পাক তাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, তারা ইতিহাস ভেঙ্গে ইতিহাস গড়বে এবং ঐ পথ দেখিয়ে যাবে, যা কেয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে মুসলমানদের উজ্জ্বল ইতিহাস ও ইসলামী বিজয়ের রোডম্যাপ হয়ে যাবে।

৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে যে মুজাহিদ বাহিনী সিরিয়া, ফিলিস্তিন পেছনে রেখে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, তারা নিজেদের জীবন-মরণসহ সব কিছু ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিল। তারা একটি পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনে পাগলপারা ছিল। তলোয়ারের ঝংকার, তীরের শোঁ শোঁ আওয়াজ এবং আহতদের গগন বিদারী আর্তনাদ তাদের জন্য প্রেরণার গীত হয়ে গিয়েছিল। তাদের রুকু-সেজদাও হত তলোয়ারের ছত্রছায়ায়। তারা গোশত-মাংসের দেহ নয়; বরং দ্বীন, ঈমান ও জযবার মূর্তপ্রতীক হয়ে গিয়েছিল। তারা আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান ছিল। আত্মিক শক্তিবলেই তারা রণাঙ্গনের পর রণাঙ্গনে ছুটে বেড়াত এবং তাদের চলার গতি ছিল অতি দ্রুত।

✪✪✪

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) স্ব-স্ব বাহিনী নিয়ে হিমসের দিকে যাচ্ছিলেন। তারা ফাহাল হতে রওনা হয়েছিলেন। যেখান থেকে হিমস প্রায় আশি মাইল দূরে ছিল। পথিমধ্যে দামেস্ক পড়ত; যা কমপক্ষে ত্রিশ মাইল দূরে ছিল। কিন্তু তাদের যাওয়ার কথা ছিল দামেস্ক হতে কিছু দূর দিয়ে।

দামেস্ক এবং ফাহালের মাঝে একটি সবুজ-শ্যামল এলাকা ছিল। স্থানটি খুবই সুন্দর এবং মনোহরী ছিল। এ স্থানটির নাম ছিল 'মারজুর রুম'। মুসলিম বাহিনীর এখানে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতির কথা ছিল। তার ঐ স্থান হতে সামান্য দূরে ছিল ইত্যবসরে সৈনিকের মত এক লোক এসে পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। লোকটির পোশাক ছিল শিকারীর মত। যখন উভয় সালার ঐ লোকের সামনে দিয়ে অতিবাহিত হয় তখন লোকটি ঘোড়া সমেত তাদের সঙ্গে চলা শুরু করে।

"খবর কী?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন।

"রোমীয়রা আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে" অশ্বারোহী জবাব দেয় "সংখ্যা আমাদের থেকে বেশি। হিমস পানে শত্রুদের আরেকটি দল আসছে।"

এই অশ্বারোহী কোনো শিকারী বা অপরিচিত লোক ছিল না; বরং সে ছিল এক মুসলিম গোয়েন্দা। শিকারীর বেশে সে অনেক দূর সামনে গিয়েছিল। সে একা ছিল না। তার আরও কয়েকজন সঙ্গীও সামনে গিয়েছিল। গোয়েন্দাগিরি করা কোনো সাধারণ ও সহজ ব্যাপার ছিল না যে, দুশমনদের গতিবিধি দেখবে ও ফিরে এসে সালারদের জানিয়ে দিবে। শত্রু পক্ষের গোয়েন্দাও ছড়িয়ে থাকত। তারা গোয়েন্দাগিরি করার পাশপাশি এটাও দেখত যে, অপরপক্ষের কোনো গোয়েন্দা তাদের এলাকায় এসেছে কিনা। খোঁজ পেলে ধরা খাওয়া এবং মারা যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদা থাকত।

ঐ গোয়েন্দা সবুজ-শ্যামল এলাকায় যে রোম বাহিনীর অবস্থানের খবর দিয়েছিল, ঐতিহাসিকদের মতে তারা ছিল রোমীয় সালার থিয়োডার্সের বাহিনী। আর যে বাহিনী আসছিল তার সালার ছিল সেন্স।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে ডেকে বলেন, "এ দুই বাহিনী এদিকে আসার উদ্দেশ্য এই ছাড়া আর কি হবে যে, তারা দামেস্কগামী রাস্তা বন্ধ করে দিতে চায়। দামেস্ক হুমকির মুখে পড়েছে বলে আমার মনে হয়।"

"রোমীয়রা যদি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আসে তাহলে আমরা কেন দু'ভাগে বিভক্ত হব না?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"দু'ভাগেই বিভক্ত হতে হবে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের পথ দেখাবেন আল্লাহ তা'আলাই।"

"আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "এটা কী সমীচীন হবে না যে, আমরা বিষয়টি মুজাহিদদের জানিয়ে দিই?"

হযরত খালিদ (রা.) রেকাবীতে পা রেখে দাঁড়িয়ে যান এবং মুজাহিদদের থামার জন্য ইশারা করেন।

"ইসলামের মুজাহিদ বাহিনী!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) উচ্চ কণ্ঠে মুজাহিদ বাহিনীকে বলেন, "শত্রুরা আমাদের গতি রুদ্ধ করেছে। তোমরা কী ইতিপূর্বে কুফরের পাহাড়কে টলিয়ে দাও নি? শিরক এবং ধর্মান্তরিতের বিরাট উপত্যকা তোমরা পদদলিত করনি? যে রোমীয় বাহিনী আমাদের রাস্তায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও তারা সংখ্যায় বেশি কিন্তু তাদের মাঝে ঈমানী ঐ শক্তি নেই, যা তোমাদের মাঝে আছে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী। তিনি বাতিলের পূজারীদের সঙ্গে নন। আল্লাহ সন্তুষ্টি অন্তরে পোষণ কর এবং নিজেদের আরেকটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখ।"

"আমরা প্রস্তুত" মুজাহিদরা নারা ধ্বনি দিতে থাকে "আমরা প্রস্তুত।

... লাব্বাইক আবু উবায়দা। ... লাব্বাইক আবু সুলাইমান!"

মুজাহিদ বাহিনীতে এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যাতে ঘোড়াও টান টান উত্তেজনায় খুর মাটিতে ঘষতে থাকে। মুজাহিদরা থেকে থেকে এমন স্লোগান দিতে থকে, যেন তারা ক্ষোভে ফুঁসছে এবং প্রথম বারের মত যুদ্ধে এসেছে। এটা ছিল ইমানের সতেজতা এবং আত্মিক প্রেরণা।

✪ ✪ ✪

কতক ঐতিহাসিক মারজুর রোমের যুদ্ধকে বেশি গুরুত্ব দেন নি। তবে দুই জন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। এদের মাঝে হেনরী স্মিথের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এ যুদ্ধকে সমর বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং খুঁটিনাটি সব দিক আলোচনা করেছেন। তার তথ্য মতে, হযরত আবু উবায়দা এবং হযরত খালিদ (রা.) স্ব-স্ব বাহিনী পৃথক করে তাদেরকে এভাবে বিভক্ত করেন, যাতে উভয় সালার প্রয়োজনে একে অপরকে সাহায্য করতে পারেন।

উভয় বাহিনীর প্রথম মাথাটি ছিল মিশ্রিত। অর্থাৎ সেখানে উভয় বাহিনীর সৈন্য ছিল। পর্যালোচনা ও চারদিক নজর রাখার জন্য তাদের সামনে আরেকটি দল ছিল। কেননা, উভয় সালার এ এলাকায় নতুন ছিলেন। ডান-বাম হতেও আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। দু'জন মুসলিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য সামনে অগ্রসর হলে এক উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তারা যাত্রা বিরতি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

"বন্ধু আমার!" আগন্তুক মুসলিম গোয়েন্দাদের বলে, "তোমরা ওদিক থেকে আসছ আর আমি ওদিকে যাচ্ছি। শুনলাম ওদিক থেকে নাকি মুসলিম বাহিনী আসছে। যদি তোমরা তাদের দেখে থাক তাহলে বলে দাও। আমি রাস্তা বদলে ফেলব। যেন এমন না হয় যে, আমি অজান্তে তাদের শিকার হব আর তারা আমার উট ছিনিয়ে নিবে।"

"আর তুমি এটা বল যে, ওদিকে রোমীয় সৈন্যরা কোথায়?"

মুসলমান গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসা করে এবং বলে, "আমরাও তেমন ভয় করছি, যেমনটি তুমি করছ। রোমীয়রা আমাদের ঘোড়া ছিনিয়ে নিবে।"

"রোমীয় সৈন্যদের কোথাও নাম-গন্ধ নেই" আগন্তুক জবাবে বলে, "তোমাদেরকে এমন কথা কে বলেছে?"

"মারজুর রূম হতে আগন্তুকরা!" এক মুসলিম গোয়েন্দা জবাবে বলে।

"সে ভুল বলেছে" আগন্তুক বলে, "আমি তো ওদিক থেকেই আসছি।"

দুই মুসলিম গোয়েন্দা কোনো এক ছদ্মবেশে ঘোড়ায় বসা ছিল। একজন এত জোরে উটের পা ধরে টান দেয় যে, আগন্তুক উটের পিঠ হতে জমিনে আছড়ে পড়ে। উভয় মুসলিম গোয়েন্দা দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ে এবং উষ্ট্রারোহীকে সামলানোর সুযোগ দেয় না। তারা তলোয়ার বের করে তার শাহরগে চেপে ধরে।

"তুমি ঈসায়ী আরব" এক মুসলিম গোয়েন্দা তাকে বলে এবং রোমীয়দের গোয়েন্দা। ... অস্বীকার করলে আমরা তোমার দুই হাত কাঁধ থেকে কেটে দিব। ... মারজুর রূম এর বিস্তারিত খবর জানাও।"

লোকটি প্রাণ ভিক্ষা পাবার প্রতিশ্রুতিতে স্বীকার করে যে, সে ঠিকই রোমীয়দের গোয়েন্দা। লোকটি আরও বলে যে, রোমীয় সালার থিয়োডার্স স্বীয় বাহিনী নিয়ে পূর্ব থেকেই মারজুর রূমে ছিল। পরে আরেক সালার সেন্সও তার বাহিনী নিয়ে এসে গেছে।

ঐ রোমীয় গোয়েন্দাকে ধরে পেছনে আনা হয় এবং তাকে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে তুলে দেয়া হয়।

✪✪✪

যখন মুজাহিদ বাহিনী মারজুর রূমের সবুজ-শ্যামল এলাকার নিকটে গিয়ে পৌঁছে, তখন তারা দেখে যে, সেখানে রোমীয়দের দু'টি বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষমান।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর বাহিনীকে রোমীয় সালার থিয়োডার্সের বাহিনীর সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করান আর হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীকে রোমীয় অপর সালার সেন্সের বাহিনীর সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করান। রোমীয়রা মুসলিম বাহিনী দেখেও কোনো তৎপরতা দেখায় না। তারা সম্ভবত মুসলমানদের প্রথমে আক্রমণের সুযোগ দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) প্রথমে আক্রমণে যান না। তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কেও প্রথমে আক্রমণ করতে দেন না। উভয় মুসলিম সালার এই ভেবে অবাক হন যে,

রোমীয়রা সামনে এসে কেন আক্রমণ করছে না! অথচ তাদের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি। মুসলমানরা এই অসহ্য নিরবতাকে একটি চাল মনে করে তারাও সামনে অগ্রসর হয় না।

সূর্য ডুবে যায়। উভয় পক্ষের সৈন্যরা পিছু হটে যায় এবং সৈন্যদের কিছুক্ষণের জন্য শোয়ার অনুমতি প্রদান করে।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সালার ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.)। এই জন্য তাঁর উপস্থিতিতে কোনো স্বাধীন ফায়সালা করার উপায় ছিল না হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য। কিন্তু তিনি যে স্বভাবচরিত্রের যোদ্ধা ছিলেন, তা তাকে ঘুমুতে দিচ্ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) অস্থিরভাবে শুয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকেন। তাঁর ঘুম না আসার এক কারণ এই ছিল যে, তাদের সামনে শত্রুরা উপস্থিত অথচ লড়াই হচ্ছে না। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ তাকে অস্থির করে চলছিল। হয়ত এটা ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতির ফল। তিনি রোমীয়দের ক্যাম্প হতে হাল্কা হাল্কা আওয়াজ শুনছিলেন।

হযরত খালিদ (রা.)-এর এই সন্দেহ জাগে যে, শত্রুরা হয়ত ঘুমায়নি এবং তারা কোনো গোপন তৎপরতায় লিপ্ত। তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেন না। এক অজানা আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন। তিনি গা ঝাড়া দিয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। ধীর পদে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যান। স্থানটি ছিল সবুজ-শ্যামলিমা এবং সেখানে অনেক গাছও ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ঝোপ-ঝাড় এবং গাছ-গাছালিকে আড়াল করে দুশমনের অবস্থানস্থলের দিকে চলে যান।

হযরত খালিদ (রা.) যেতে যেতে সেখানে পৌঁছে যান, যেখানে রোমীয় সালার থিয়োডার্সের বাহিনী থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে রোমীয়দের একজন সৈন্যও ছিল না। কোনো সান্ত্রী ছিল না, যে তার গতিরোধ করবে। সন্ধ্যার সময় তিনি নিজ চোখে তাদেরকে এই স্থানে সেনা ছাউনী স্থাপন করতে দেখেছিলেন। রাত হতেই তারা কোথায় গায়েব হয়ে গেল? আর সামনে অগ্রসর হলে তিনি এমন কিছু নিদর্শন পেয়ে যান, যা স্পষ্ট প্রমাণ করছিল যে, সৈন্যরা এখানে অবস্থান করেছিল।

হযরত খালিদ (রা.) ঐ প্রান্তে চলে যান যেখানে রোমীয় সৈন্যদের অপর অংশ তাঁবু স্থাপন করেছিল। হযরত খালিদ (রা.) দূর থেকেই বুঝতে পারেন যে, সেখানে সৈন্য বিদ্যমান। তিনি সন্তর্পণে আরও সামনে যান। রোমীয় সান্ত্রী টহল দিচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা.) শত্রু শিবিরের আশে-পাশে এগিয়ে যেতে থাকেন। চাঁদনী রাতে শত্রু ক্যাম্প তিনি সুস্পষ্ট দেখতে পান।

হযরত খালিদ (রা.)-এর বিশ্বাস হয়ে যায় যে, অর্ধেক সৈন্য কোথায় যেন চলে গেছে। হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে আসেন এবং তাকে জানান যে, রোমীয়দের অর্ধেক সৈন্য লাপাত্তা হয়েছে।

"কোথায় চলে যেতে পারে?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"সেখানেই গিয়েছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "যেখানে যাওয়ার জন্য তারা দিনের বেলায় যুদ্ধ করতে অনীহা দেখায়।"

কিছুক্ষণ যাবত উভয় সালার এ ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকেন যে, রোমীয়দের একাংশ কোথায় গায়েব হয়ে গেল? ঐতিহাসিকদের মতে, এটা ছিল রোমীয় সালার থিয়োডার্সের বাহিনী, যারা মধ্য রাতে চলে গিয়েছিল। শুধু রয়ে গিয়েছিল সালার সেন্সের বাহিনী। তার বাহিনীর সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে।

✪✪✪

সকাল হতেই রোমীয়রা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি রোমীয়দের উপর আক্রমণ করেছিলেন। তিনি স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী স্বীয় বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং শত্রুদের উপর হামলা চালিয়েছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সৈন্যের দ্বারা পার্শ্ব বাহিনীতে আক্রমণ চালিয়ে নিজে নজর রেখেছিলেন শত্রুর সম্মুখ বাহিনীর উপর। সেখানেই ছিল রোমীয় সালার সেন্সের ঝাণ্ডা।

মুজাহিদ বাহিনী পার্শ্ব বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে হযরত আবু উবায়দা (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে সালার সেন্সকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান জানান। সেন্স তৎক্ষণাৎ আবেদনে সাড়া দেয় এবং ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে চলে আসে। শুরু হয় দু'সালারের অসি যুদ্ধ। উভয়ে একে অন্যের উপর আক্রমণ করে এবং আঘাত সামলে পাল্টা আঘাত হানে। সেন্স একটু এগিয়ে গিয়ে ঘোড়া ঘোরায়। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিজের ঘোড়াকে বেশি এগিয়ে নেন না; বরং একটু এগিয়েই পরক্ষণে ঘুরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। সেন্স তখনও স্বাভাবিক হয়নি ইতিমধ্যে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর তলোয়ার এসে তার কাঁধে লাগে। কিন্তু তার পরিধেয় বর্ম তাকে প্রাণে রক্ষা করে।

আবার উভয়ের ঘোড়া পরস্পরের দিকে এগিয়ে যায়। সেন্স আক্রমণ করার জন্য তলোয়ার উঁচু করে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বর্শার মত আঘাত করে তলোয়ার তার বগলে ঢুকিয়ে দেন। একটু আগে গিয়ে আবার ঘোড়া ঘোরান। বোগলের জখম সেন্সকে কষ্ট দিচ্ছিল। সে তার ঘোড়াকে সময়মত ঘোরাতে পারে না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবার তার এক পায়ে আঘাত করলে তার

পা কেটে যায়। সেঙ্গ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেঙ্গের মাথাকে বর্ম হতে উন্মুক্ত দেখে ঘাড়ে আঘাত করেন। এতে সেঙ্গের মাথা পুরো না কাটলেও মাথা ঘাড় থেকে পৃথক হয়ে ঝুলতে থাকে। এরপর তার লাশ ঘোড়া হতে এভাবে পড়ে যায় যে, তার এক পা ঘোড়ার পাদানিতে আটকে যায়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়ার গায়ে তলোয়ারের মাথা বসিয়ে দেন। ঘোড়া ক্ষিপ্ত হয়ে দৌড় দেয় এবং তার সওয়ারীর লাশ টেনে-হিঁচড়ে ফিরতে থাকে।

এর সাথে সাথে হযরত আবু উবায়দা (রা.) তার সম্মুখ বাহিনীকে দুশমনের সম্মুখ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। কেননা তাদের সালার মারা যাওয়ায় সম্মুখ বাহিনীর মাঝে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। একে তো সালার নেই, দ্বিতীয়ত মুজাহিদ বাহিনীর প্রচণ্ড হামলায় রোমীয়রা ভড়কে যায়। তারা সাহসহারা হয়ে পিছু হটতে থাকে। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের পশ্চাতে গিয়ে তাদের পালানোর পথও রুদ্ধ করে দেয়। তারপরও কিছু সৈন্য পালাতে সক্ষম হয় এবং তারা পালিয়ে হিমসের পথ ধরে।

এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মোতাবেক ১৪ হিজরীর মুহাররম মাসে।

✪✪✪

সেদিন সকালে দামেস্কের বাইরেও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হচ্ছিল।

আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, দামেস্ক মুসলমানদের অধিকারে ছিল। তবে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ছিল। দামেস্কের শাসক ও সালার ছিলেন হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)। রোম সম্রাট হিরাকেলের পরিকল্পনা ছিল এমন যে, দামেস্কে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা খুব কম, তাই অতি সহজেই তাদের শেষ করা যাবে। তিনি এই দায়িত্ব তাঁর এক অভীজ্ঞ সালার থিয়োডার্সের কাঁধে অর্পণ করেছিলেন।

দামেস্ক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে এটাও ছিল যে, শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য কিছু লোক শহরের দূর দূর এলাকা দিয়ে টহল দিত। সেদিন সকালে হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান জানতে পারেন যে, রোম বাহিনী আসছে। দামেস্কের উপর সর্বক্ষণ হামলার আশঙ্কা ছিল। কেননা, দামেস্কের মত এত বড় শহর হারিয়ে রোমীয়রা বসে থাকবে, এটা হতে পারে না। এ জন্য দামেস্কের সালার সর্বক্ষণ প্রস্তুতি নিয়ে থাকতেন। তিনি রোমীয় বাহিনীর আসার সংবাদ পেয়েই স্বীয় বাহিনীকে শহরের বের হয়ে শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করতে অভ্যস্ত ছিল না। অবরোধ করার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল। তারা অবরুদ্ধ হওয়াকে

পছন্দও করতেন না। তারা ময়দানে সামনাসামনি তাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিধর শত্রুদের সঙ্গেও লড়াই করত।

রোম বাহিনী যেহেতু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে আসছিল, তাই হযরত ইয়াযিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীকে ঐ দিকেই যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড় করে দিয়েছিলেন। রোম বাহিনী সামনে এলে জানা যায় যে, তাদের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি। ঐ রোমীয় বাহিনীর সালার ছিল থিয়োডার্স। সে ইন্তেকিয়া হতে বৈরুতের রাস্তা হয়ে দামেস্ক বিজয় করার জন্য আসছিল। যখন মারজুর রূমে আসে, তখন ইতিমধ্যে সেখানে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী চলে এসেছে। তার টার্গেট ছিল দামেস্ক, তাই সে মারজুর রূমে মুসলিম বাহিনীকে নাগালে পেয়েও যুদ্ধে জড়ায় না। সে দামেস্ক পৌঁছার পূর্বে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিল না।

ঐতিহাসিক ওকীদী, ইবনে হিশাম এবং আবু সাঈদ লিখেন, থিয়োডার্স বড়ই চমৎকার পরিকল্পনা করেছিল। এক হলো, মারজুর রূমে মুসলমানদের যুদ্ধের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয় কিন্তু নিজে যুদ্ধে জড়ায় না। এভাবে রাত এলে সে অত্যন্ত সন্তর্পণে স্বীয় বাহিনী নিয়ে দামেস্ক চলে যায়। রোমীয় সালার সেন্স পেছনে রয়ে যায়। তার দায়িত্ব ছিল, হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীকে মারজুর রূমে আটকে রাখা। এ স্থান থেকে দামেস্ক বিশ মাইলও ছিল না। ফলে সকাল না হতেই থিয়োডার্স স্বীয় বাহিনীসহ দামেস্কের সীমানায় পৌঁছে যায়।

যখন সে দামেস্কের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন মুসলিম বাহিনীকে কেল্লার বাইরে অপেক্ষমান পায়। এটা ছিল দামেস্কের প্রতিরক্ষা বাহিনী, যার নেতৃত্বে ছিলেন সালার হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)। থিয়োডার্সের জানা ছিল যে, দামেস্ক প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুসলমানদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে এই যা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এদের অতিরিক্ত কোনো সৈন্য নেই এবং কোথাও হতে তাদের মদদ আসারও সম্ভাবনা নেই। ফলে থিয়োডার্স একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। সে স্বীয় বাহিনীকে হুংকার দিয়ে বলে, "আরবের এসব বুদ্দুদের পিষে ফেল। দামেস্ক তোমাদের।"

"মুজাহিদগণ!" সালার হযরত ইয়াযিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীকে ডেকে উচ্চ আওয়াজে বলেন, "দামেস্ক তোমাদের ইজ্জত। শত্রুরা যেন শহরের প্রাচীরের ছায়া পর্যন্তও যেতে না পারে। কুফরের তুফানকে শহরের বাইরে রুখে দাও।"

✪✪✪

এটা ছিল প্রেরণাদীপ্ত হুংকার, যা মুজাহিদ বাহিনীর রক্ত গরম করে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা ছিল বড়ই তিক্ত। দুশমনের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি এবং মুসলমানদের সাহায্যের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ফলে শুধু দামেস্কই হাত ফসকে যাওয়ার ছিল না; বরং একজন মুজাহিদেরও জীবিত থাকার সম্ভাবনা ছিল না। মুজাহিদ সব রণাঙ্গনেই কম সংখ্যা নিয়ে লড়েছে কিন্তু কমেরও একটি সীমা থাকে। রোমীয়দের সংখ্যা এবার এত বেশি ছিল যে, ইয়াযিদ বাহিনীকে অতি সহজে ঘেরাও করে ফেলতে পারত। হিরাকেল এমনটি অনুধাবন করেই এখানে বেশি সৈন্য পাঠিয়েছিলেন এবং থিয়োডার্স তাঁর অভীজ্ঞ সালার ছিল।

থিয়োডার্স মুসলিম বাহিনীকে দেখেও তার বাহিনীকে থামায় না। সে এসেই হামলা করার নির্দেশ দেয়। হামলা উভয়পক্ষ হতে হয়েছিল। সালার হযরত ইয়াযিদ (রা.) অনুধাবন করেন যে, রোমীয়রা তাদেরকে ভেতরের দিকে সংকুচিত হতে বাধ্য করছে। তিনি স্বীয় বাহিনীকে আরও ছড়িয়ে দেন এবং অশ্বারোহী বাহিনীকে বলেন যে, তারা যেন শত্রুদের পার্শ্ব বাহিনীতে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু রোমীয়রা ছিল প্লাবনের মত। মুসলিম বাহিনী জযবা দ্বারা হামলা প্রতিহত করছিল। এর চেয়ে বেশি কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রোমীয়রা শহরের দিকে যাবারও চেষ্টা করছিল। হযরত ইয়াযিদ (রা.) এর ব্যবস্থা পূর্বেই করে রেখেছিলেন। তিনি শহরের প্রত্যেক দরজার সামনে এবং কিছু দূর পর্যন্ত তীরন্দায বাহিনী দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে অল্প সংখ্যক অশ্বারোহীও ছিল।

সূর্য মাথার উপরে চলে আসে। অর্ধেক দিন পেরিয়ে যায়। মুজাহিদরা তখনও রোমীয়দের ঢেউয়ের মত আসা হামলা রুখে যাচ্ছিল। তাদের হুংকার এবং গর্জনে তখনও প্রাণ ছিল। কিন্তু আহত ও শহীদ হওয়ার কারণে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। রোমীয়রা সংখ্যাধিক্যতা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাবু করতে পারছিল না। কিন্তু অর্ধ দিনের পরে মুসলমানদের শরীর নিথর হতে থাকে। তাদের ঘোড়াও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

দুপুরের পর মুজাহিদরা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, পরাজয় তাদের খুব নিকটে এসে গেছে। তারা পিছু হটায় অভ্যস্ত ছিলো না। তারা কালেমা তৈয়বা উচ্চস্বরে পড়তে শুরু করে এবং এই চেষ্টায় রক্তাক্ত হতে থাকে যে, হামলা প্রতিরোধও করবে আবার হামলা চালাবেও। তাদের বিন্যাস ভেঙ্গে যায় এবং তারা পৃথক পৃথকভাবে লড়ছিল। সালার ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) সিপাহী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার বডিগার্ড ও পতাকাবাহীদের বলেন, যেন ঝাণ্ডা কোনো অবস্থাতেই পড়ে না যায়।

দ্রুত সেই ক্ষণ এসে পড়ে, যখন মুজাহিদদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এক দিকে শত্রুর হাতে বন্দী ও অপর দিকে মৃত্যু দাঁড়িয়ে। তারা কোনভাবেই এটা শুনতে চাচ্ছিল না যে, দুশমনরা দামেস্ক অধিকার করে নিয়েছে।

মুজাহিদরা যখন জীবনের শেষ যুদ্ধ করার জন্য জীবনবাজি রাখছিল ঠিক তখন রোমীয়দের পশ্চাতে শোরগোল ওঠে এবং দেখতে দেখতে রোমীয়দের মাঝে হুলস্থুল পড়ে যায়। দামেস্কের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুসলমানদের এই খোঁজ ছিল না যে, পশ্চাতে কী হচ্ছে এবং রোমীয়দের উপর কোন বিপদ এসে পতিত হয়েছে। রোমীয়দের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায় এবং তাদের আক্রমণও শেষ হয়ে যায়।

"ইসলামের বীরগণ!" ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন, "আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। মনোবল দৃঢ় রাখ।"

ঘটনা এই ছিল, ইয়াযিদ (রা.) জানতেন না যে, রোমীয়দের পশ্চাতে কী হচ্ছে। তিনি রোমীয়দের উপর হামলা করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু রোমীয়দের অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে যায় যে, তারা হামলা প্রতিহত করার কথাও ভুলে যায়। ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) পার্শ্ব বাহিনীর দিকে এগিয়ে যান। বডিগার্ডরা তার সঙ্গেই ছিল। তিনি রোমীয়দের পশ্চাতে যাচ্ছিলেন। ভয় ও ত্রাসের আওয়াজ এত বেশি উচ্চারিত হচ্ছিল যে, তাঁর নিজের আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল না। শুধু এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, রোমীয়দের মাঝে হুলস্থুল পড়ে গেছে এবং তারা ছুটোছুটি করছে। তিনি আরেকটু এগিয়ে যান। তখন একটি আওয়াজ তার কানে ভেসে আসে :

انا فارس الضديد

انا خالد بن الوليد

আমি পারস্যের যমদূত
আমি খালিদ বিন ওলীদ।

"দামেস্কের প্রতিরক্ষকগণ!" হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে পেছনে আসেন "খোদার কসম! ইবনে ওলীদ এসে গেছেন। ... আবু সুলাইমান এসে পৌঁছেছেন। ... আল্লাহর মদদ এসে গেছে। .. আল্লাহকে আহ্বানকারীগণ! আল্লাহ আমাদের ডাক শুনেছেন। ... খোদার কসম! রোমীয়রা নিজেদের কবরের উপর লড়ছে। ... বিজয় সত্যপূজারীদের হবে।"

সে যুগের লিখিত তথ্য হতে জানা যায় যে, অপ্রত্যাশিত মদদে হযরত ইয়াযিদ (রা.) খুশিতে পাগলের মত হয়ে যান। এমন অবস্থা হয় তার বাহিনীরও। এরপর রোমীয়দের গণহত্যা শুরু হয়ে যায়।

✪✪✪

হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানের সাহায্যে হযরত খালিদ (রা.) এসে যাওয়াটা ছিল একটি জীবন্ত মোজেযা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হযরত খালিদ (রা.) এত দ্রুত কীভাবে এলেন?

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মারজুর রূমে হযরত খালিদ (রা.) রাতের বেলায় চুপিসারে রোমীয়দের ক্যাম্পের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, রোমীয় সৈন্যদের যে দলটি দিনের বেলায় তাদের সামনে ছিল তারা রাতে সেখানে ছিল না। এতে হযরত খালিদ (রা.)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, তারা নিশ্চয় কোথাও গেছে। তিনি বিষয়টি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে অবহিত করেছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) দূরদর্শী ছিলেন। তাঁর সন্দেহ জাগে যে, রোমীয়দের এই দলটি হয়তবা দামেস্ক চলে গেছে। আর তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যার স্বল্পতা হেতু সহজেই তাদের উপর বিজয় অর্জন করা যাবে এবং দামেস্ক অতি সহজে পুনরুদ্ধার হবে।

"হিরাকেল সাধারণ বুদ্ধির লোক নন" হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেন, "অবশ্যই তাঁর জানা আছে যে, দামেস্কে আমাদের সৈন্য সংখ্যা খুব কম। আমার এটা ছাড়া আর কিছু বুঝে আসছে না যে, দামেস্ক হুমকির মুখে পড়েছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি দামেস্ক যেতে চাই।"

"তোমার উপর আল্লাহর রহমত হোক আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি এবং তোমাকে আল্লাহর দায়িত্বে সোপর্দ করছি। ... রোমীয়দের যে দলটি পেছনে রয়েছে আমি তাদেরকে সামলাবো।"

অনুমতি পেয়ে হযরত খালিদ (রা.) এক মুহূর্তও নষ্ট করেন না। এক দল অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করে তৎক্ষণাৎ দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

পথিমধ্যে কিছু নিদর্শন ও চিহ্ন এমন মেলে যা তাকে সুনিশ্চিত করে যে, এ পথে এক দল সৈন্য গেছে। থিয়োডার্স অর্ধ রাতের পূর্বে মারজুর রূম হতে রওনা হয়। আর হযরত খালিদ (রা.) রাতের শেষ প্রহরে রওনা হন। দামেস্কে তিনি তখন পৌছেন, যখন মুসলমানরা পরাজিত হওয়ার উপকণ্ঠে পৌছে গিয়েছিল এবং তাঁদের মদদ পাওয়ার সামান্যতম আশাও ছিল না।

হযরত খালিদ (রা.) দামেস্কে পৌছে সেই দৃশ্যই দেখেন, যা তিনি চিন্তা করেছিলেন। তিনি মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে রোমীয়দের পশ্চাৎ দিক হতে

তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের ঝাণ্ডা দেখেছিলেন। তিনি মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পৌঁছান। তিনি থিয়োডার্সকে ব্যস্ত ও তৎপর দেখতে পান। সে ইতিপূর্বে দামেস্ক বিজয়কে সময়ের ব্যাপার মনে করছিল। বিজয় হাতের মুঠোয় এসেও ফস্কে গিয়েছিল।

"আমি রোমীয়দের হত্যাকারী" হযরত খালিদ (রা.) থিয়োডার্সকে আহ্বান জানিয়ে বলে, "আমি সেখান থেকেই এসেছি যেখান থেকে রাতে তুমি এসেছ।"

থিয়োডার্স তরবারী বের করে। উভয় সালারের বডিগার্ডরা দূরে সরে যায়। হযরত খালিদ (রা.) থিয়োডার্সের দুই-তিন আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন এবং তার চারপাশে ঘুরতে থাকেন। থিয়োডার্সকে কঠিনভাবে আক্রমণ করার সুযোগ মিলছিল না। সে হযরত খালিদ (রা.)-এর দয়া ও করুণার উপরে ছিল। থিয়োডার্স একজন নামকরা যোদ্ধা ছিল। কিন্তু এবার তার মোকাবেলা এমন সালারের সঙ্গে হচ্ছিল, যিনি সর্বক্ষণ শিকারের অনুসন্ধানে থাকেন।

পরিশেষে থিয়োডার্স ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে পৌঁছার চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) চোখের পলকে প্রান্ত বদল করে নিজেকে তার আক্রমণের আওতার বাইরে নিয়ে চলে আসেন এবং ঐভাবে প্রান্ত বদলরত অবস্থায় এমন জোরে আঘাত করেন যে, থিয়োডার্স ঘোড়ার উপরে থেকেই দু'টুকরো হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর অপর আঘাত তাকে দুনিয়া হতে চির বিদায় দিয়ে দেয়।

সালার নিহত হবার পর রোমীয়দের করণীয় একটাই ছিল। আর তা হলো, পলায়ন করে নিজের জীবন বাঁচানো। সেসব রোমীয় সৌভাগ্যবান ছিল, যারা জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

গণীমতের মালের মধ্যে বর্ম, শিরস্ত্রাণ, অস্ত্র এবং ঘোড়া উল্লেখযোগ্য ছিল।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) অপর রোমীয় সালার সেন্সকে চিরতরে শেষ করে দিয়েছিলেন।

✪✪✪

হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন হিমস গিয়ে সে শহর অবরোধ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিজে অপর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বা'আলাবাক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ধারণা ছিল উভয় স্থানে অবরোধ বিলম্বিত হবে এবং মোকাবেলা কঠিন হবে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে, মুসলমানদের তলোয়ারের ত্রাস সে কাজ করে না, যা তাদের আখলাক-চরিত্র করে। মুসলমানরা যে দিকেই যেত সেখানে পূর্বে প্রচার হয়ে যেত যে, মুসলমানরা কারো প্রতি জুলুম করে না এবং তারা চুক্তির শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

তৎযুগের বিজয়ী সৈন্যরা সর্বাগ্রে বিজিত এলাকার সুন্দরী নারীদের প্রতি হাত তুলত। এরপর বাড়ি বাড়ি ঢুকে লুটপাট চালাত এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। এটা ছিল তৎযুগের প্রথা এবং এটাকে বিজয়ী বাহিনীর অধিকার মনে করা হত। কিন্তু মুসলমানরা ছিল ব্যতিক্রম। তারা এই প্রথা পালন করে না; বরং বিজিত এলাকার প্রতিটি নর-নারীর ইজ্জত-আবরু এবং তাদের জান-মালের হেফাজত করে।

এরই ফল এই হয়েছিল যে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন বা'আলাবাক্কা গিয়ে সে শহর অবরোধ করেন, তখন সেখানে যে রোমীয় বাহিনী ছিল তারা নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে।

অপরদিকে হযরত খালিদ (রা.) হিমস শহর অবরোধ করলে রোমীয় সালার হারবীস কেল্লা হতে বাইরে চলে আসে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-ও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে রোমীয় সালার হতে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং স্বর্ণ ও রেশম নির্মিত একশত পোশাক দাবী করা হয়। রোমীয় সালার এ দাবী মেনে নেয়। চুক্তিনামা এভাবে তৈরী হয় যে, মুসলমানরা এক বছরের মধ্যে হিমসে আক্রমণ করবে না। যদি এ সময়ের মধ্যে রোমীয় সৈন্যরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামান্যতম কোনো জঙ্গী তৎপরতা চালায় তাহলে মুসলমানরা চুক্তি লঙ্ঘিত হওয়ায় যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে।

এই চুক্তিনামায় সই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের দরজা খুলে যায় এবং মুসলিম বাহিনী শহরে ঢুকে পড়ে। ঐতিহাসিক ইবনে আছীর লিখেন, হিমসবাসী এটা দেখে অবাক হয়ে যায় যে, মুসলমানরা কোনো দোকানে গিয়ে কিছু কিনলে তার মূল্য পরিশোধ করে। অনেকে মুজাহিদদের হাদিয়া-তোহফা প্রদান করলে মুজাহিদরা তারও মূল্য দিয়ে দেয়। তারা বলে, মুসলমানরা হাদিয়াকে মালে গণীমত মনে করে। আর কোনো মুসলমান নিজের পক্ষ হতে নিজের কাছে গণীমতের মাল রাখতে পারে না। এছাড়াও সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর ইসলাম গণীমতের মাল নেওয়াকে জায়েয মনে করে না।

এমন স্থানও আসে যেখানকার জনতা মুসলিম বাহিনীকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্বাগত জানায়। যেমন ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মুসলিম বাহিনী হিমস থেকে হিমায় গেলে এলাকাবাসী শহরের বাইরে চলে আসে এবং মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নেয়। মাযাররাতুন নুমান শহরের লোকজন মুসলমানদের এভাবে স্বাগত জানায় যে, প্রথমে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে এরপর খুশির গান গাইতে গাইতে বাইরে আসে। তাদের পশ্চাতে শহরের নেতৃস্থানীয় লোকজন আসে এবং কর পেশ করে শহর হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর হাতে তুলে দেয়। এরপর সে শহরের কিছু লোক ইসলামও গ্রহণ করে।

✪✪✪

"মুসলমানরা আমাদের জালে চলে এসেছে" সম্রাট হিরাকেল তাঁর সালারদের বলছিলেন "আমি শীতকালে অপেক্ষায় ছিলাম। আরবের এসব মুসলমানরা উটের গোশত খায় এবং উটেরই দুধ পান করে। মরুভূমির অধিবাসীরা এমন শীত কখনো দেখেনি। তারা শীতের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে পারবে না। এই দেশের ঠাণ্ডা তাদের উদ্দীপনা ও প্রেরণাকে স্থবির করে দিবে। এরপরের মৌসুম আসা পর্যন্ত তারা শেষ হয়ে যাবে। তখন আমরা অতি সহজভাবে তাদের পরাজিত করতে পারব। তাদের তাঁবু ঠাণ্ডার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে না।"

হিরাকেল নির্দেশ দেন যে, হিমস থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়া হোক।

কিছু দিন পর হযরত আবু উবায়দা (রা.) জানতে পারেন যে, রোমীয়দের মদদ হিমস পৌঁছে গেছে। রোমীয়দের এই আচরণের অর্থ এই ছিল যে, তাদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা ও চুক্তি ভেঙ্গে গেছে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) অন্য কোথাও ছিলেন। খবরটি পেয়েই তারা হিমসে স্বসৈন্যে চলে আসেন। হযরত খালিদ (রা.) প্রথমে পৌঁছেছিলেন। তিনি হিমসের কাছে গিয়ে দেখেন যে, বাইরে রোমীয় বাহিনী যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের উপর আক্রমণ চালান। রোমীয়রা পিছু হটতে থাকে এবং এক সময় তারা কেল্লার মধ্যে চলে যায়। রোমীয়রা কেল্লায় প্রবেশ করলে গেট বন্ধ হয়ে যায়। এর পরপরই হযরত আবু উবায়দা (রা.) স্বীয় বাহিনী নিয়ে হিমসে এসে পৌঁছান।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, "এই অবরোধ তোমার এবং তুমিই এর সালার।"

এটি ছিল একটি বিরাট সম্মান প্রদর্শন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি এই সম্মান দেখান। কেননা খলীফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশনা অনুযায়ী হযরত আবু উবায়দা (রা.) সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

এটা ছিল ডিসেম্বর মাস। শীতকাল শুরু হয়েছিল। প্রচণ্ড শীত পড়ে। মুসলমানরা এত শীতে অভ্যস্ত ছিল না। তাদের উপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছিল। এই কারণে অবরোধ দীর্ঘায়ু হয়। এ সময়ে খলীফাতুল মুসলিমীনের পক্ষ হতে নির্দেশ আসে, কিছু সৈন্য ইরাকে পাঠাবার জন্য।

একটি বাহিনী ইরাক চলে যায়। এতে রোমীয়রা মনে করে যে, মুসলমানরা অবরোধ তুলে নিচ্ছে। কিন্তু এমনটি হয় না। রোমীয়রা এই আশায় কেল্লায় বসে থাকে যে, প্রচণ্ড শীত সহ্য করতে না পেরে মুসলমানরা একসময় অবরোধ তুলে নিবে।

৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস আসে। শীতের প্রচণ্ডতা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। রোমীয় সালার হারবীস রোমের শাহী খান্দানের লোক ছিল। তার অন্য কারো নির্দেশের প্রয়োজন ছিল না। সে তার সালার ও উপসালারদের ডেকে বলে যে, শীত মৌসুম বিদায় নিয়েছে। তাই উচিত হবে, অন্য কোথাও হতে মুসলমানদের মদদ আসা এবং শীতের প্রকোপ থেকে নিজেদের মুক্ত করার পূর্বেই তাদের উপর আক্রমণ করা।

এই পরিকল্পনার আওতায় একদিন কেল্লার একটি দরজা হঠাৎ খুলে যায়। সেখান থেকে পাঁচ হাজার সৈন্য বেরিয়ে মুসলমানদের ঐ দলের উপর আক্রমণ করে যারা ঐ দরজার কাছে অবস্থানরত ছিল। হামলা ছিল জোরদার এবং মারাত্মক। মুসলমানরা এই হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এছাড়াও শীতের ধকল তারা তখনও কাটিয়ে উঠেনি। ফলে তারা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। পেছনে সরে আসে এবং বিন্যস্ত হয়ে আবার সামনে অগ্রসর হয়। কিন্তু রোমীয়দের আরেকটি আঘাত আবার তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, "তুমি কি এটাই দেখতে থাকবে যে, রোমীয়রা জয়ী হয়ে কেল্লায় ফিরে যাবে?"

হযরত খালিদ (রা.) তামাশা দর্শকদের মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু তিনি সেই দরজা হতে সরতে পারছিলেন না, যে দরজার সামনে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এরপরও তিনি একটি অশ্বারোহী দল সঙ্গে নেন এবং রোমীয়দের উপর আক্রমণ করেন। রোমীয়রা জমে মোকাবেলা করে। এভাবে এক সময় সূর্য ডুবে যায়। সূর্যাস্ত হতেই রোমীয়রা কেল্লায় ফিরে যায়। তাদের অনেক লাশ এবং মারাত্মক আহত সৈন্যরা ময়দানে পড়ে ছিল।

✪✪✪

দ্বিতীয় দিন হযরত আবু উবায়দা (রা.) সমস্ত সালারদের ডেকে পাঠান। "তোমরা কী দেখনি যে, গতকাল রোমীয়রা বাইরে এসে হামলা করলে আমাদের লোকেরা কীভাবে নিস্প্রাণভাবে লড়াই করে?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) অভিযোগের সুরে বলেন, "তবে কি আমাদের মাঝে ঈমানী প্রেরণা কমে গেছে? শীতের প্রকোপে তো শুধু দেহ ঠাণ্ডা হয়।"

"মহামান্য সর্বাধিনায়ক!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমাদের লোকেরা নিস্প্রাণ হয়ে লড়েনি। তবে কথা হলো, এবার যেসব রোমীয় হামলা চালিয়েছে তারা ঐসব রোমীয়দের চেয়ে বেশি দুঃসাহসী ও প্রতিভাবান ছিল, ইতিপূর্বে যাদের সঙ্গে আমাদের লড়াই হয়েছে।"

"তাহলে তুমিই বল আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, "এভাবে দীর্ঘদিন অবরোধ করে আমাদের এখানেই বসে থাকা উচিত?"

"না, আবু উবায়দা!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "কাল সকালে আমরা অবরোধ তুলে নিব।"

অন্যান্য সালাররা অবাক বিস্ময়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে চেয়ে থাকে।

"হ্যাঁ, আমার বন্ধুগণ!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "কাল এখানে আমরা থাকব না ... এবং আমার পরিকল্পনা মনোযোগ দিয়ে শোনো।"

হযরত খালিদ (রা.) অবরোধ তুলে নেয়ার ব্যাপারে তাদেরকে কিছু দিক-নির্দেশনা দান করেন এবং তার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা পেশ করেন।

পরদিন প্রভাতে প্রাচীরের উপর হতে আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে– "তারা চলে যাচ্ছে। ... অবরোধ উঠে গেছে। ... ঐ যে দেখ, মুসলমানরা চলে যাচ্ছে।"

সালার হারবীস খবরটি শুনে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে প্রাচীরের উপরে আসে। তার সঙ্গে শহরের বড় পাদ্রীও ছিল।

"ঠাণ্ডা তাদেরকে ঘায়েল করে দিয়েছে" হারবীস বলে, "তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার শক্তি ও হিম্মত নেই। আমি তাদেরকে জীবিত যেতে দিব না। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করব। তাদের খতম করে দিয়ে আসব।"

"মুহতারাম সালার!" পাদ্রী বলে, "এটা আমার কাছে মুসলমানদের একটি কৌশল বলে মনে হয়। এরা ফিরে যাবার মত জাতি নয়। ঐ দেখুন, তারা স্ত্রী, কন্যাদের এখানে রেখে গেছে।"

"আমি দেখছি" হারবীস বলে, "তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের আমাদের জন্য ফেলে রেখে গেছে। তাদের হেফাজতের জন্য তারা খুব কমই সৈন্য রেখে গেছে। তারা মাল-সামান বাঁধছে। কিন্তু আমরা তাদের যেতে দিব না। আমি প্রথমে ঐ সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবনে যাব, যারা মনোবল হারিয়ে চলে গেছে।"

হারবীস তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করে এবং হযরত আবু উবায়দা ও হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীকে ধরার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ইতিমধ্যে মুসলমানরা দুই-আড়াই মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল। এ সময়ে রোমীয়রা তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে।

হারবীস স্বীয় বাহিনীসহ মুসলমানদের কাছে পৌঁছতেই হঠাৎ মুসলমানরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) গতকাল সালারদের এ কথাই বলেছিলেন যে, তারা অবরোধ তুলে চলে গেলে রোমীয়রা অবশ্যই তাদের পিছু নিবে। তখন আমরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের ঘিরে ফেলব এবং হামলা

চালিয়ে খতম করে দিব। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী রোমীয়রা কাছে আসতেই মুসলমানরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল ডান দিক হয়ে পেছনে সরে যায় আর অপর দল বাম দিকে হয়ে সামনে ঘুরে আসে। যার ফলে রোমীয়রা ঘেরাওয়ের কবলে পড়ে যায়।

রোমীয়রা এমন অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা খেই হারিয়ে ফেলে। ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে তাদের ঘেরাও করে ফেলে। নিজেদের স্ত্রী, সন্তান এবং তাদের রক্ষায় কিছু মুজাহিদকে পেছনে রেখে আসাটাও ছিল রণকৌশলের একটি অংশ। রোমীয়রা পিছু হটতে চাইলে স্ত্রী-সন্তানদের রক্ষায় নিয়োজিত মুজাহিদরা রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তারা রোমীয়দের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দিবে।

আরেক সালার হযরত মুয়াজ বিন যাবাল (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর পূর্ব নির্দেশনা অনুযায়ী পাঁচশ অশ্বারোহী নিয়ে হিমসের রাস্তায় চলে আসেন, যাতে কোনো একজন রোমীয় শহরের দিকে না আসতে পারে।

রোমীয়রা চাপে পড়েও এত সহসা পলায়নের মত লোক ছিল না। কিন্তু তারা এবার মুজাহিদদের পাতা ফাঁদের পড়ে গিয়েছিল। তারা ছিল সম্পূর্ণ তাজাদম ও উদ্যমী। কতক স্বীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আর কতক নিজেদের জীবন রক্ষার্থে বীর বিক্রমে লড়ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) তাদের সালার হারবীসকে খুঁজছিলেন। তার তলোয়ার দিয়ে তাজা খুন টপকাচ্ছিল। তাঁর সামনে যেই আসছিল দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। এক সময় হারবীস তাঁর নজরে পড়ে।

"আমি ইবনে ওলীদ! হযরত খালিদ (রা.) হুংকার দিয়ে বলেন, "পারস্যদের হত্যাকারী ইবনে ওলীদ .. রোমীয়দের ঘাতক ইবনে ওলীদ!"

হারবীস নামকরা যোদ্ধা ছিল। সে হযরত খালিদ (রা.)-এর আহ্বানে তাঁর মোকাবেলায় সামনে আসে। এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। হযর খালিদ (রা.)-ও ঘোড়া থেকে নেমে আসেন এবং তার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু হঠাৎ এক রোমীয় দু'জনের মাঝে এসে উদয় হয়। তিন-চারজন ঐতিহাসিক এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কেউ ঐ রোমীয় ব্যক্তির নাম লিখেন নি। শুধু এতটুকু পাওয়া যায় যে, তার দেহ পাহলোয়ানের মত বিশাল ছিল এবং সে বাঘের মত গর্জন দিয়ে দিয়ে লড়ত। রোমীয় ভাষায় সে 'বাঘের মত হিংস্র' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

ইতিহাসে এই ঘটনা এভাবে এসেছে যে, এই রোমীয় পাহলোয়ান স্বীয় সালার হারবীসকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে নিজেই হযরত খালিদ (রা.)-এর মোকাবেলায় আসে। যুদ্ধ শুরু হয়। উভয়ে দুই-তিনবার প্রান্ত বদল করে।

হযরত খালিদ (রা.) তলোয়ার দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানেন। তলোয়ারের মাথা পাহলোয়ানের পরিহিত বর্মের উপর গিয়ে পড়ে। বর্ম এত মজবুত এবং আঘাত এত জোরাল ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর তরবারি ভেঙ্গে যায়। তাঁর হাতে শুধু তলোয়ারের বাট রয়ে যায়। এবার হযরত খালিদ (রা.) খালি হাতে হয়ে যান এবং রোমীয় পাহলোয়ানের হাতে তরবারী ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তার মুহাফিজদের কাছে যেতে চেষ্টা করতে থাকেন, তাদের থেকে তলোয়ার নেয়ার জন্য। কিন্তু রোমীয় পাহলোয়ান সিংহের মত গর্জন করতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) যাতে তলোয়ার না নিতে পারেন তার জন্য ঘুরে ঘুরে তার চেষ্টায় বাধা দিচ্ছিল।

এক মুহাফিজ হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে তরবারী ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর পূর্বে রোমীয় পাহলোয়ান তরবারী পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তরবারী পেছনে ছুঁড়ে দেয়। খালি হাতে হযরত খালিদ (রা.)-এর বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রোমীয় পাহলোয়ান হযরত খালিদ (রা.)-এর উপর তরবারীর উপর্যুপরি আঘাত করা শুরু করে দেয়। হযরত খালিদ (রা.) এদিক-ওদিক সরে গিয়ে আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে থাকেন। একবার রোমীয় পাহলোয়ান জোরদার একটি আঘাত করে, যে আঘাত হযরত খালিদ (রা.)-এর গর্দান কিংবা একটু নীচে লাগার কথা ছিল কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) চোখের পলকে বসে পড়ে সে আঘাতও ব্যর্থ করে দেন।

রোমীয় পাহলোয়ানের এই জোরদার আক্রমণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে সে তাল সামলাতে পারে না, বরং নিজেও ঘুরে পড়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) দৌড়ে গিয়ে তাকে জাপটে ধরেন। পাহলোয়ানও চোখের পলকে ঘুরে যায় এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর দু'বাহুর মাঝে পড়ে আটকে যায়। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, উভয়ের বুক একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং রোমীয় পাহলোয়ান ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ।

হযরত খালিদ (রা.) দু'বাহুতে চাপ দিতে থাকেন এবং বন্ধন দৃঢ় করতে শুরু করেন। রোমীয় পাহলোয়ান হযরত খালিদ (রা.)-এর বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর বন্ধন ক্রমেই শক্ত হতে থাকে। বন্ধন এক সময় এত জোরালো হয় যে, পাহলোয়ানের রক্ত চেহারায় উঠে যায় এবং চেহারা পূর্ণ রক্তিম হয়ে যায়।

রোমীয় পাহলোয়ানের দু'চোখ ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়ে যায়। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত হতে থাকে এবং চেহারায় কষ্টের ছাপ এত গভীরভাবে পড়েছিল যে, তার দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ হতে থাকে। ঐতিহাসিক ওকীদী লিখেছেন, এক সময় রোমীয় পাহলোয়ানের পাজরের হাড় মড় মড় করে

ভাঙ্গতে থাকে। এতে রোমীয় আরও ছটফট করতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) তার দু'বাহুকে আরও চাপিয়ে নিয়ে আসেন। এতে পাহলোয়ানের হাড় গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ হয় এবং তার দাপদাপি এক সময় দুর্বল হতে থাকে। পরে তার জীবন পাখি উড়ে যায়।

হযরত খালিদ (রা.) যখন তাকে বাহুবন্ধন থেকে ছেড়ে দেন, তখন সে মাটিতে কাটা কলা গাছের মত আছড়ে পড়ে। সে মারা গিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) ঐ পাহলোয়ানের তরবারী তুলে নেন এবং হুংকার দিয়ে হারবীসকে ডাকেন। কিন্তু হারবীস তার পাহলোয়ানের করুণ পরিণতি দেখে সেখান থেকে আস্তে সরে পড়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ায় চড়ে রোমীয় পাহলোয়ানের তলোয়ার উঁচু করেন এবং নারাধ্বনি দেন।

মল্লযুদ্ধ চলাকালে দু'পক্ষের স্বাভাবিক লড়াইও চলছিল। মুজাহিদদের হাতে রোমীয়দের গণহত্যা চলছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) জানতে পারেন যে, হযরত খালিদ (রা.) রোমীয় পাহলোয়ানকে বাহুবন্ধনে চেপে চেপে তিলে তিলে হত্যা করেছেন, তখন তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে দৌড়ে আসেন।

"খোদার কসম আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে বলেন, "তুমি যা বলেছিলে তা করে দেখিয়েছ। তুমি তার (পাহলোয়ানের) কোমর ভেঙ্গে দিয়েছ।"

ব্যাপারটি এই ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.) যখন গতকাল সালারদের বলেছিলেন যে, তিনি আগামীকাল অবরোধ উঠিয়ে এ এলাকা ছেড়ে যাবেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-সহ অন্যান্য সালাররা এই পরিকল্পনা পছন্দ করেননি। হযরত খালিদ (রা.) তাদের জানান যে, তিনি কোন পরিকল্পনা এঁকেছেন। এরপরও হযরত আবু উবায়দা (রা.) অবরোধ উঠিয়ে নেয়াকে সমর্থন করছিলেন না। তখন হযরত খালিদ (রা.) বলেছিলেন, "আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী চলুন, আমি তাদের হাড়-গোড় ভেঙ্গে দিব। তাদের কোমর ভেঙ্গে দিব।"

হযরত খালিদ (রা.) শুধু এক পাহলোয়ানের নয়, বরং রোমীয় সৈন্যদের হাড় গুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মুসলমানরা আবার বিজয়ীবেশে হিমসে প্রবেশ করেন।

✪✪✪

হিমসের উপর যে ভয় ও ত্রাস সঞ্চারিত ছিল তা ঐ সময় হুলস্থুল ও জীবন রক্ষার প্রতিযোগিতায় পরিণত হয় যখন মুসলমানরা হিমসে প্রবেশ করছিল। শহরবাসী এটা শুনেছিল যে, মুসলমানরা শহরবাসীদের পেরেশান করে না। কিন্তু যে শহরের সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ করে না এবং মুসলমানরা তলোয়ারের

জোরে শহর বিজয় করে, তখন তারা গণিমত হিসেবে প্রত্যেক ঘরের মাল-আসবাব নিয়ে নেয় এবং মহিলাদের বাঁদী বানায়।

মুসলমানরা হিমস অর্জন করেছিল বড়ই কষ্টে। রোমীয়রা অস্ত্র সমর্পণ করেনি; বরং মুসলমানরা অবরোধ তুলে নিলে পাঁচ হাজার রোমীয় সেনা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। এটা ভিন্ন কথা যে, অবরোধ তুলে নেয়া মুসলমানদের একটি কৌশল ছিল। কিন্তু এটাকে রোমীয়রা দুর্বলতা মনে করে তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। এই যুদ্ধে রোমীয়দের মাত্র একশত অশ্বারোহী বেঁচে ছিল এবং শহীদ হওয়া মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৩৫ জন।

এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে মুসলমানরা হিমস বিজয় করেছিল। হিমসবাসী যখন দেখেছিল যে, মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনে যে পাঁচ হাজার সৈন্য গিয়েছিল তাদের থেকে মাত্র কয়েকজন পালিয়ে আসছে, তখন তাদের উপর ভয় ও উদ্বেগ ছেয়ে গিয়েছিল। আর যখন তারা দেখেছিল যে, মুসলমানদের একটি অশ্বারোহী দল রোমীয় ও হিমসের দরজার মাঝামাঝি এসে গেছে এবং রোমীয়রা না পালাতে পারছে আর না শহরে প্রবেশ করতে পারছে, তখন তারা আরও বেশি ভীত ও তটস্থ হয়ে পড়ে। কেননা, শহরে এত সৈন্য ছিল না, যা তাদের সাহায্যে পৌঁছবে। এই রোমীয় সেনারা মুসলিম অশ্বারোহীদের তলোয়ার ও বর্শায় করুণভাবে নিহত হয়।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) যখন হিমসে প্রবেশ করেন, তখন কয়েকজন শহরবাসী তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। উভয় মুসলিম সালারকে দেখে তারা সেজদায় পড়ে যায়। উভয় সালার তাদের ঘোড়া থামান।

"উঠ!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, "সোজা হয়ে দাঁড়াও।"

শহরবাসী সেজদা হতে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যায়। তাদের চেহারায় ভয়, উদ্বেগ এবং দয়া প্রার্থনার গভীর ছাপ ছিল।

"বল!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, "যদি তোমাদের সৈন্যরা আমাদের কথা মেনে প্রথমেই অস্ত্র সমর্পণ করত, তাহলে আজ আমাদের এভাবে সেজদা করার প্রয়োজন ছিল কি?

"আমরা অনুগ্রহ ভিখারী!" একজন অনুনয় করে বলে, "তারা ছিল রোমীয় সৈন্য যারা আপনাদের সঙ্গে লড়াই করেছে। আমরা রোমীয় নই। আমরা আপনার সকল দাবী পূর্ণ করব।"

"আমরা কেবল এতটুকু বলতে এসেছি যে, সেজদা শুধু আল্লাহর সামনে করা হয়" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমরা কাউকে আমাদের গোলাম বানানোর জন্য আসিনি।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নির্দেশে হিমসবাসীদের থেকে জনপ্রতি এক দীনার কর গ্রহণ করা হয় এবং মুসলমানদের পক্ষ হতে ঘোষিত হয় যে, কোনো লোক শহর ত্যাগ করবে না। শহরবাসীদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করবে মুসলমানরা।

এই ঘোষণা মানুষকে অবাক করে দেয়। অনেকে এ ঘোষণাকে মুসলমানদের 'চাল' বলে অভিহিত করে। তারা সারা রাত এই ভয়ে জেগে কাটায় যে, মুসলমানরা রাতে তাদের বাড়ি-ঘরে আক্রমণ করবে। কিন্তু রাত পেরিয়ে যায় অথচ এমন কিছুই ঘটে না।

✪✪✪

রোম সম্রাট হিরাকেল হিমস হতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে ইন্তেকিয়ায় ছিলেন। তিনি যখন এই সংবাদ শোনেন যে, হিমসও হাত থেকে ফস্কে গেছে, তখন তাঁর ঠোঁটে হাল্কা মুচকি হাসির আভা খেলে যায়। যেন তিনি এমন সংবাদেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর সালার হাশীর এবং শাহী খান্দানের সদস্যরা জানত যে, হিরাকেলের এই মুচকি হাসি মূলত মৃত্যুরই মুচকি হাসি এবং এই হাসিতে প্রতিশোধের আগুন ভরা।

"তোমরা কি বলতে পার আরবের মুসলমানরা হিমস কীভাবে অধিকার করল?" হিরাকেল সংবাদবাহীকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি নিশ্চয় সালার নও, কমান্ডার হয়ে থাকবে। যুদ্ধ অবশ্যই বোঝো। ... তোমার নাম কী?"

'মহামান্য রোম সম্রাট! সবই বুঝি" সংবাদবাহক বলে, "আমার নাম সাযীরাস। আমি একদল সৈন্যের কমান্ডার। একটি ধোঁকায় হিমস আমাদের হাত ফস্কে গেছে। আমাদের সালারের বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমানরা ঠাণ্ডার তীব্রতা সহ্য করতে পারবে না এবং অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু মুসলমানরা ঠাণ্ডার তীব্রতা অবরোধ বলবৎ রাখার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয় এবং যখন ঠাণ্ডার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল এবং গাছে গাছে নতুন কড়ি ও মুকুল আসতে শুরু করছিল তখন অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যায়।"

"আর আমাদের সালার তখন কেল্লায় বসে থাকে যখন শত্রুরা বাইরে শীতে থরথর করে কাঁপছিল" হিরাকেল বলে, "আমাদের সালার শত্রুর উপর তখন ঝাঁপিয়ে পড়েনি যখন তীব্র ঠাণ্ডা তাদের রগ-শিরায় রক্ত জমাট করে দিয়েছিল। ... এরপর কী হল?"

"মহামান্য সম্রাট!" সাযীরাস বলে, "তারা যখন অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যায় তখন সালার হারবীস পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীকে নির্দেশ দেন মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য। তিনি বলেন, তোমরা হিম্মতহারা মুসলমানদের পানে ছুটে যাও এবং তাদের একজনকেও জীবিত রাখবে না। ... তাঁর এ নির্দেশে আমরা মুসলমানদের পিছু ছুটে যাই। যখন তাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছি তখন তারা আকস্মিক ঘুরে গিয়ে আমাদের ঘেরাও করে ফেলে" সাযীরাস এভাবে হিরাকেলকে বিস্তারিত জানায় যে, মুসলমানরা তাদেরকে কীভাবে ঘেরাও করে ফেলে এবং তাদের সেনাদের কীভাবে ধ্বংস করে।

"আমাদের সালার হারবীস কোথায়?" হিরাকেল জিজ্ঞাসা করেন, "সে কী ...।"

"তিনি জীবিত আছেন" সাযীরাস বলে, "তিনি তখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে চলে আসেন যখন মুসলমানদের সালার খালিদ বিন ওলীদ আমাদের পাহলোয়ানকে স্বীয় বাহু বন্ধনে জাপটে ধরে ছিল এবং প্রচণ্ড চাপে পাহলোয়ানের চোখ মনিকোঠর হতে বেরিয়ে গিয়েছিল।"

"তবে কি আমাদের পাহলোয়ানকে খালিদ বিন ওলীদ মেরে ফেলেছে?" হিরাকেল আঁৎকে উঠে জিজ্ঞাসা করেন।

সাযীরাস কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে হিরাকেলের দিকে চেয়ে থাকে। অতঃপর সে ডানে-বামে আস্তে করে মাথা দোলায়।

"মুসলমান সালার আমাদের পাহলোয়ানকে বাহুবদ্ধ করে চাপ দিতে দিতে তার হাড়-গোড় ভেঙ্গে দিয়েছিল" সাযীরাস বলে, "অতঃপর সে মারা যায়।"

"ধন্যবাদ!" হিরাকেলের কণ্ঠ চিরে বের হয় "এটা শারীরিক শক্তি নয়।"– এরপর হঠাৎ তিনি নড়েচড়ে বসেন এবং তেজস্বী কণ্ঠে বলেন, "আমি তাদেরকে পিষে ফেলব। ... তাদেরকে আরও সামনে আসতে দাও।" তার কণ্ঠস্বর আরও উচ্চকিত হয় "তাদেরকে আরও এগিয়ে আসতে দাও ... আরও সামনে, যেখান থেকে তারা আর পালিয়ে যেতে পারবে না।"

✪✪✪

সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) আরও সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারা হিমস শহরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু সৈন্য সেখানে রেখে গিয়েছিলেন। তারা হিমস থেকে স্বীয় বাহিনীসহ হিমা অতঃপর আরও সামনে সীরাজ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ইন্তেকিয়ার দূরত্ব ছিল পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের মত। ইন্তেকিয়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ

স্থান। কেননা, হিরাকেল এখানে তার প্রধান সেনাদপ্তর বানিয়েছিলেন এবং এখানেই রোমীয় সৈন্যদের সমাবেশ ও সেনাবিভক্তির কার্যক্রম চলত।

মুসলমানরা সীরাজ থেকে যাত্রা করে। একটু দূরে গেলেই রোমীয়দের একটি কাফেলা তাদের নজরে পড়ে। কাফেলাটির নিরাপত্তা রক্ষায় একটি ক্ষুদ্র সেনাদল ছিল। এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, উট ও গাড়ির ঐ কাফেলায় সমরাস্ত্র ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় রসদ-সামগ্রী যাচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর ইশারায় মুসলমানরা ঐ কাফেলাকে ঘিরে ফেলে। রোমীয় সেনারা প্রতিরোধ করার মত নির্বুদ্ধিতা দেখায় না। তারা জানায় যে, এতে রোমীয় সেনাদের খাদ্য-সামগ্রী আছে, সাথে কিছু অস্ত্রও আছে। তাদের সবাইকে বন্দী করা হয় এবং তাদের বুঝানো হয় যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে।

"আমরা আপনাদের সঙ্গে মোকাবেলায় নামিনি" ঐ রোমীয় সৈন্য কাফেলার কমান্ডার জীবন ভিক্ষার আবেদন জানিয়ে বলে, "আমরা রোমীয় নই। আমরা তাদের প্রজা মাত্র। আমাদের সঙ্গে আপনাদের কোনো শত্রুতা নেই।"

"তাহলে বন্ধুত্বের প্রমাণ দাও" তাদের বলা হয়, "এটা বল যে, ইন্তেকিয়ায় কী চলছে?"

"আপনাদের নির্মূলের পাথেয় প্রস্তুত হচ্ছে" কাফেলার কমান্ডার বলে, "সেখানে বিরাট সংখ্যক ফৌজ জমা করা হচ্ছে। দূর-দূরান্তের ঈসায়ী গোত্রগুলোও আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত হচ্ছে। তাদেরকে রণকৌশল শেখানো হচ্ছে।"

"আপনারা আমাদের জীবন বাঁচালে আমারাও আপনাদের জীবন বাঁচিয়ে দিব" কাফেলার আরেক লোক বলে, "আপনারা সামনে যাবেন না। আপনাদের সৈন্যসংখ্যা খুবই কম। ইন্তেকিয়ায় রোম সম্রাট হিরাকেল যে সেনা জমা করেছেন, তা এত বেশি যে, আপনাদের একজনও জীবিত থাকবে না।"

"তবে কি লাগাতার এত পরাজয় সম্রাটের কোমর ভেঙ্গে দেয়নি?" মুসলমানদের এক সালার জিজ্ঞাসা করে।

"আমরা এত উচ্চ পর্যায়ের লোক নই যে, আমরা সম্রাটের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি" রোমীয় কমান্ডার বলে, "আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলার দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারি না। তবে সালারদের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ আছে তা আপনাদের জানাতে পারি। ...

হিরাকেলের কোমর এত দুর্বল নয় যে, কয়েকটি পরাজয়ে তা ভেঙ্গে যাবে। তিনি স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি নিজের হাতে রেখেছেন। তিনি বিজয় অর্জন করলে উল্লাসে ফেটে পড়েন না। আর পরাজিত হলেও তিনি ভেঙ্গে পড়েন না। তিনি যদিও সুন্দরী, যুবতী নারী পাগল এবং মদের নেশায় ডুবে থাকতে ভালবাসেন

কিন্তু এখন তিনি মদ পান করলেও সুন্দরী-যুবতী নারীদের সামনে আসতে দিচ্ছেন না।"

"তিনি তো এখন রাতে ঘুমানোও বাদ দিয়েছেন" অপর একজন বলে, "এখন তার মাথায় চিন্তা একটাই; সৈন্য জমা করা। তাঁর লোকজন বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে বলছে, মুসলমানরা তুফানের গতিতে ছুটে আসছে এবং তারা তোমাদের ধর্ম ও তোমাদের মেয়েদের নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। ... মানুষ দলে দলে ধর্মের জন্য এবং মহিলাদেরকে মুসলমানদের হাত থকে বাঁচানোর জন্য ইন্তেকিয়ায় জমা হচ্ছে। ... আপনারা সামনে যেতে চাইলে আরও সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যান। নতুবা সামনে যাবেন না। এখন রোম সম্রাট বেশি সময় ব্যয় করছেন সৈন্যদের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিন্যস্তকরণে। তিনি শুধুই বলছেন, মুসলমানদের এগিয়ে আসতে দাও, তাদের আরও আগে আসার সুযোগ দাও।"

"তিনি এ কথাও বলেছেন" আরেকজন বলে, "এবার আমার ফৌজের প্রত্যেক সৈন্য আমার দিলকে মজবুত করছে। আমার ফৌজের প্রত্যেক সিপাহী আরবের মুসলমানদের আমার জালে টেনে নিয়ে আসছে।

✪✪✪

কাফেলা হতে যে তথ্য হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) জানতে পারেন, তা ভুল ছিল না। প্রথমে উল্লেখ হয়েছে যে, হিরাকেল গতানুগতিক সম্রাট ছিলেন না। তিনি তৎকালীন যুগের সমর শাস্ত্রীয় দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি রণাঙ্গনের তুখোড় জেনারেলও ছিলেন।

কাফেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে সেখানেই যাত্রা বিরতি করতে বাধ্য করে।

"খোদার কসম আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেন, "আমরা এখানে বসে থাকব না এবং আমরা হিরাকেলকে এত সুযোগ দিব না যে, তিনি প্রস্তুতি চূড়ান্ত ও পূর্ণ করবেন।"

"আজ রাত পর্যন্ত আমাদের কোনো লোকের আসা উচিত" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আবু সুলাইমান! যতক্ষণ সামনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে না জানা যাবে, ততক্ষণ আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারব না।"

নিজেদের লোক দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ গোয়েন্দা ছিল, যে ইতিপূর্বেই ইন্তেকিয়া পৌঁছেছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সর্বাধিনায়কত্বের যুগে গোয়েন্দাবৃত্তির ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করে দিয়েছিলেন এবং গোয়েন্দাদের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে

দিয়েছিলেন। মুসলিম গোয়েন্দারা জীবন বাজি রেখে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসত।

ঐতিহাসিকদের মতে, হিরাকেল তাঁর সৈন্যদের একের পর এক পরাজয়ের খবরে এই সত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, তিনি মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ে পরাস্ত করতে পারবেন না। এক পরাজয় তো এটা ছিল যা রোমীয় ফৌজকে প্রথমে হযরত খালিদ (রা.) ও পরে হযরত আবু উবায়দা (রা.) দিয়েছিলেন আর দ্বিতীয় পরাজয় ছিল যা অন্যান্য সালাররা সিরিয়ার অন্যান্য এলাকায় রোমীয়দের দিচ্ছিল।

মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার একটিই উপায় ছিল। আর তা হলো, তাদেরকে এক ময়দানে একত্রিত হতে বাধ্য করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কয়েক গুণ বেশি সৈন্য ময়দানে নামিয়ে দেওয়া। সুতরাং এ চিন্তার প্রেক্ষিতে সম্রাট হিরাকেল নতুন নতুন এবং বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করা শুরু করেছিলেন। মুসলমানরা যখন হিমস অধিকার করে তখন পর্যন্ত হিরাকেলের নয়া বাহিনীর সংখ্যা দেড় লাখে পৌঁছে গিয়েছিল।

ইন্তেকিয়া হতে ৪০ মাইল দূরে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) স্ব-স্ব বাহিনীর সঙ্গে যাত্রাবিরতি করে অপেক্ষা করছিলেন। এর দুই দিন পূর্বে যখন তারা রোমীয়দের একটি কাফেলা পাকড়াও করেছিলেন, তখন মুসলমানরা মাগরিবের নামায পড়ার প্রস্তুতি গ্রহণকালে এক অশ্বারোহীকে মুসলিম ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। দূর থেকে চেনা যাচ্ছিল না যে, আগন্তুক রোমীয়দের কোনো সেনা অফিসার নাকি অন্য কোনো মুসাফির। ক্যাম্প হতে কিছু দূরে এসে আগন্তুক তার ঘোড়া ফের ঘুরিয়ে নেয় এবং ক্যাম্পের চারপাশে ঘোড়া ছুটতে থাকে, যেন সে কিছু চেনার চেষ্টা করছে। তার পোশাক মুসলমানদের মত ছিল না।

"তাকে ধরে নিয়ে এসো!" এক কমান্ডার তার সৈনিকদের নির্দেশ দেয়। পশ্চাদ্ধাবনকারীরা ঘোড়ায় জিন পরাচ্ছিল ইতিমধ্যে ঐ আগন্তুক তার ঘোড়া ক্যাম্পের দিকে ঘোরায়।

"আল্লাহু আকবার!" আগন্তুক নারাধ্বনি দেয় এবং কাছে এসে উচ্চকণ্ঠে বলে, "আমি স্বীয় দলের ঝাণ্ডা চেনার চেষ্টা করছিলাম।"

"ইবনে উহুদী!" কেউ এ কথা বলে অতঃপর কয়েকজন মুজাহিদ তার দিকে ছুটে আসে। একজন বলে, "খোদার কসম! আমরা এখনও তোমাকে রোমীয় সৈন্য মনে করছি।"

"এ পোশাক কি ঐ রোমীয় ব্যক্তির যাকে তুমি কতল করেছিলে?" একজন জিজ্ঞাসা করে।

ইবনে উহুদীর জন্য কাউকে এটা বলা উচিত ছিল না যে, সে একজন গোয়েন্দা এবং ইন্তেকিয়া হতে এসেছে। সে সোজা সালার হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর তাঁবুতে চলে যায়। সে ঐ তিন-চার গোয়েন্দাদের একজন ছিল, যারা দেড়-দুই মাস পূর্বে ইন্তেকিয়া গিয়েছিল।

✪✪✪

"তোমার প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক ইবনে উহুদী!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) তার সঙ্গে কোলাকুলি করে বলেন, "আমি ইন্তেকিয়া হতে আগত খবরের অপেক্ষায় বসে আছি।"

ইবনে উহুদী হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে মোসাফাহা করে। হযরত খালিদ (রা.)-ও তাকে বুকে টেনে নেন।

"কী সংবাদ এনেছ?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা, যা ইন্তেকিয়ার প্রান্ত থেকে উঠছে"। ইবনে উহুদী কাব্যের ভঙ্গিতে বলেন, "ঐ কালো মেঘ হতে যে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, তা জমিনকে প্লাবিত করে বিশাল বিশাল উপত্যকাগুলোকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমীনুল উম্মত এবং ইবনে ওলীদ! আল্লাহ আপনাদের ইশারা দিয়েছে সামনে অগ্রসর না হওয়ার।"

"আমাদেরকে এই ইশারা শত্রুদের একটি কাফেলা দিয়েছে" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "এটা ছিল রোমীয়দের ফৌজী কাফেলা; যাদেরকে আমরা পাকড়াও করেছি।"

"এটাকে আল্লাহর প্রেরিত কাফেলা মনে করুন আমীনুল উম্মত!" ইবনে উহুদী বলে, "এখন পুরো ঘটনা আমার থেকে শুনুন। ইন্তেকিয়ার অভ্যন্তরে এবং বাইরে সৈন্য এবং ঘোড়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। ইন্তেকিয়ার আশে-পাশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁবু স্থাপিত হয়েছে। এটা ক্রমেই বাড়ছে। ... হিরাকেল যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা বড়ই সাংঘাতিক।"

"তোমার খবর কী সত্যায়িত?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"আমি হিরাকেলের সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটের কমান্ডার আবু সুলাইমান!" ইবনে উহুদী মুচকি হেসে বলে, "রোমীয়দের বর্তমান অবস্থা এই যে, কেউ ইন্তেকিয়ার দরজায় গিয়ে বলে যে, ফৌজে ভর্তি হতে এসেছি, তাহলে তার জন্য শহরের সমস্ত দরজা খুলে যায়।"

ইবনে উহুদী যেভাবে ইন্তেকিয়ার ফৌজে শামিল হয় তার বিস্তারিত বিবরণ শোনায়। সে তার সঙ্গীদের সাথে ঈসায়ী আরব বেশে ইন্তেকিয়া গিয়েছিল। তাকে তখনই সেনাদের হাওলা করে দেয়া হয়। সেদিন ঘোড়া দৌড়ের মাঠে

অশ্বছুট, তরবারি চালনা এবং ধাবমান ঘোড়ার পিঠ হতে নিশানায় তীর চালানো ইত্যাদির মোকাবেলা হচ্ছিল। এ প্রতিযোগিতায় যে কারো অংশ নেয়ার সুযোগ ছিল। ইবনে উহুদী স্বীয় বাহিনীর প্রখ্যাত বীর যোদ্ধা ছিল এবং সুদর্শনও ছিল খুব। সে ঐ প্রতিযোগিতায় এভাবে অংশ নেয় যে, ময়দানে গিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দেয় এবং তরবারি বের করে তরবারিধারী অশ্বারোহীদের তার মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানায়। এক অশ্বারোহী তার মোকাবেলায় আসে। লোকটি ছিল রোমীয়।

"যদি তোমার নিজের বাহু এবং স্বীয় ঘোড়ার উপর ভরসা থাকে তাহলে তুমি আমার মোকাবেলায় আস হে অপরিচিত অশ্বারোহী!" ইবনে উহুদী তাকে বলে, "আমার তলোয়ার তোমার খুনের পিয়াসী যদিও নয় কিন্তু তার সামনে তোমার তলোয়ার এলে তখন ...।"

"তোমার তলোয়ারের জবাবে আমার বর্শা আসবে হে হতভাগা ভীনদেশী!" অপরজন বলে, "জীবন তোমার কাছে প্রিয় না হলে এসো।"

ইবনে উহুদী তার ঘোড়া চতুর্দিকে ছোটায় এবং তাকে আহ্বান জানায়। রোমীয় অশ্বারোহী তার ঘোড়া কিছু দূর নিয়ে যায় এবং হঠাৎ ঘোড়া ঘুরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। লোকটি বর্শা নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত ছিল। ইবনে উহুদী তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রোমীয় ব্যক্তির গতি আরও বৃদ্ধি পায়। যখন তার বর্শার ফলা ইবনে উহুদীর বক্ষ হতে একটু দূরে রয়ে যায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ার অন্য দিকে এভাবে ঝুঁকে যায় যে, যেন সে ঘোড়ার উপরেই ছিল না।

রোমীয় সৈন্যের বর্শা বাতাসকে চিরে চিরে সামনে এগিয়ে যায়। বর্শা তাকে অতিক্রম করতেই ইবনে উহুদী ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসে এবং ঘোড়ার লাগামে মৃদুঘাত করে। তার ঘোড়া ছুট দেয় এবং একটু পরেই ফিরে এসে রোমীয় ব্যক্তির পিছনে চলে যায়। রোমীয় ব্যক্তির তার ঘোড়া সোজা করছিল ইতিমধ্যে ইবনে উহুদী তার কাছে চলে যায় এবং তলোয়ার দ্বারা তার বর্শা ভেঙ্গে দেয়। রোমীয় ঘোড়া ঘুরিয়ে তলোয়ার টেনে বের করে। কিন্তু সে ইবনে উহুদীর উপর মাত্র একটি আঘাত করার সুযোগ পায়, যা সে সময়মত সামলে নিয়েছিল এবং চোখের পলকে ইবনে উহুদীর তলোয়ার রোমীয় অশ্বারোহীর পার্শ্বদেশে গেঁথে যায়। সে আহত দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল।

তাকে ভূপতিত হতে দেখে আরেক রোমীয় অশ্বারোহী ইবনে উহুদীর মোকাবেলায় নেমে আসে। সে ময়দানে আসতে না আসতেই দর্শকরা তাকে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখে। আরেক অশ্বারোহী ময়াদনে আসে।

“থাম!” হিরাকেলের হুংকার শোনা যায় “এদিকে এসো বীরযোদ্ধা!”

ইবনে উহুদী ঘোড়া হিরাকেলের সামনে নিয়ে থামায়। হিরাকেল একটি উঁচু স্থানে বসা ছিলেন।

“তোমাকে কি বলা হয়নি যে, এটা বাস্তব মোকাবেলা নয়?” হিরাকেল বলে, “তুমি তাদের দু'জনকে আহত করতে পারতে, তাদেরকে জানে মারা ঠিক হয় নি। ... তারপরও আমি তোমার মূল্যায়ন করছি। তুমি কোথা হতে এসেছ?”

“সম্রাট এটা জানতে চাইবেন না যে, কোথা হতে এসেছি” ইবনে উহুদী বলে, এরা আমার দুশমন ছিল না। কিন্তু আমার হাতে যখন তলোয়ার থাকে এবং যখন কেউ আমাকে যুদ্ধে আহ্বান জানায়, তখন আমার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এই ব্যক্তি মুসলমান। আমি যখন তাকে কতল করে ফেলেছি তখন এটা দেখে আমার অনেক আফসোস হয় যে, সে মুসলমান ছিল না। আমার বিবেক আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ... আমি ঈসায়ী আরব মহামান্য সম্রাট! অনেক দূর হতে এসেছি।”

“তোমার অন্তরে কি মুসলমান বিদ্বেষ এত বেশি যে, তুমি তাদের কথা শুনলে অন্ধ হয়ে যাও?” হিরাকেল জিজ্ঞাসা করেন।

“তার চেয়েও বেশি যতটুকু সম্রাট বুঝেছেন” ইবনে উহুদী বলে, সম্রাট কি আমাকে সামনে পাঠাবেন না? আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি।”

“আমরা তোমাকে আগে পাঠাব” হিরাকেল বলেন, তুমি দুইটি বাঘকে হত্যা করেছ এবং তোমাকে সাধারণ বংশের মনে হয় না।”

✪✪✪

“আমীনুল উম্মত!” ইবনে উহুদী হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে বলে, আমার ধারণা ছিল হিরাকেল আমাকে একজন সেনা হিসেবে তার ফৌজে স্থান দিবেন। কিন্তু তিনি আমাকে একশ সৈন্যের কমান্ডার বানিয়ে দেন। এভাবে সালারদের পর্যন্ত আমার পৌঁছানোর সুযোগ হয়। আমার অন্যান্য সঙ্গীরাও কোনো না কোনো এমন স্থানে পৌঁছে গেছে যেখান থেকে তারা মূল্যবান সংবাদ জানতে পারে। আমরা সকলে ঈসায়ী আরব হয়ে থাকি এবং পরস্পরে সাক্ষাৎ করতে থাকি। কিছু কথা তারা আমাকে বলেছে। বাকী অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। ...

“হিমস আমাদের বন্ধুদের কব্জায় এসেছে– এই খবর পৌঁছলে আমার এক সঙ্গী আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে। আমাদের জানা ছিল যে, আপনারা হিমসে বেশি দিন অপেক্ষা করবেন না এবং ইন্তেকিয়া অভিমুখে যাত্রা করবেন। আমরা আপনাদেরকে হিমসেই ঠেকিয়ে রাখতে চাচ্ছিলাম। সামনের অবস্থা সম্পর্কে

আপনাদের অবগত করানোকে জরুরী মনে করি। কেননা ইন্তেকিয়া গেলে স্বীয় বাহিনীর ধ্বংস ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না।"

ইবনে উহুদী সামনের যে চিত্র তুলে ধরে তা এমনটি ছিল যে, হিরাকেল বিরাট সংখ্যক সৈন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা এইভাবে নেন যে, ঈসায়ীদের সমস্ত গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিজ নিজ ঘোড়া, উট এবং অস্ত্র নিয়ে ইন্তেকিয়া জমা হয়েছিল। ঐতিহাসিক লিখেন, ঐ সকল গোত্র ছাড়া ইউরোপের লোকজনও এসেছিল। রোম, গ্রীস এবং আর্মেনিয়ার অধিবাসীরা প্রচুর সংখ্যায় এসেছিল। এসব লোক মিলে হিরাকেলের সর্বমোট সৈন্যের সংখ্যা দেড় লাখ হয়ে গিয়েছিল।

এই বিরাট বাহিনীকে সমান পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতি অংশের সৈন্য হয়েছিল ত্রিশ হাজার। প্রতি অংশের সালার নির্ধারণ করা হয় অভীজ্ঞ সালারদেরকে। ঐ পাঁচ সালারের মধ্যে একজনের নাম ছিল মাহান। সে আর্মেনিয়ার বাদশা এবং তৎযুগের শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার ছিল। দ্বিতীয় জন ছিল গাসসানের প্রশাসক জাবালা বিন আইহাম। সে স্বীয় বাহিনী নিয়ে এসেছিল এবং তাদের সবচেয়ে বড় বীর ছিল। তৃতীয়জন হলো এক রুশী শাহজাদা। তার নাম ছিল কনাতীর। চতুর্থ সালারের নাম ছিল গিরীগিরী এবং পঞ্চম জনের নাম ছিল দেরযান। তারা ঈসায়ী ছিলেন এবং তারা এ যুদ্ধকে ক্রুশ ও চাঁদের যুদ্ধে পরিণত করেছিল। দেড় লাখ সৈন্যের সর্বাধিনায়ক ছিলো মাহান।

হিরাকেল তাঁর এই বাহিনীকে উন্নত অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করে দেন এবং যখন তারা প্রস্তুত হয়ে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তখন হিরাকেল পুরো বাহিনীকে এক স্থানে সমবেত করেন।

"ক্রুশের বীরগণ!" হিরাকেল একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন, "তোমরা যে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছ, তা কোনো দেশ বিজয়ের জন্য নয়। এটা তোমাদের মাজহাব ও ইজ্জত রক্ষার যুদ্ধ। এক নয়া মতবাদ আমাদের মাজহাবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হলো, ঐ নয়া মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। কেননা তা মূলত কোনো ধর্মই নয়। মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশ হাজারের বেশি নয়। তোমরা তাদের হাড়-গোড়ও পিষে ফেলবে। আমাকে জানানো হয়েছে যে, আমাদের বাহিনীতে মুসলমানদের ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলো সবই গুজব। মুসলমানরা যেখানেই আমাদের ফৌজের উপর হামলা করেছে, তা করছে চোরের মত এবং সেখানে আমাদের সংখ্যা কম ছিল। ... তারা কোনো জ্বিন-ভূত নয়। তোমাদের মতই মানুষ। তারা হলো লুটেরা, যারা তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তারা কেবল তোমাদের

মাল-সম্পদই লুটে নেয় না; বরং তারা তোমাদের ধর্মমত ও তোমাদের মান-মর্যাদাও লুটে নিতে এসেছে।"

ঐতিহাসিক ওকীদী, বালাজুরী এবং হেনরী স্মিথ লিখেছেন, হিরাকেল প্রথমেই লোকদেরকে উত্তেজিত করে তার বাহিনীতে শামিল করেছিলেন। এবার তাদেরকে আরও উত্তেজিত করে তোলেন। ইবনে উহুদী হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন যে, হিরাকেল পরে তাঁর সালার, নায়েব সালার এবং কমান্ডারদের সমবেত করেছিলেন। প্রথমে তাদেরকে উত্তেজিত করেন এরপর তাদের প্রতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক সালারের অগ্রযাত্রা এবং তাদের টার্গেট নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল।

এটা ছিল একটি ভয়ংকর পরিকল্পনা, বিরাট সংখ্যক সৈন্য দ্বারা যা সফল করা সম্ভবপর ছিল। প্রথম টার্গেট ছিল হিমস এরপর দামেস্ক। তৃতীয় পরিকল্পনা এটাও ছিল মুসলমানদের সর্বসাকুল্যে ৪০ হাজার সৈন্যকে ঘেরাও করে তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন ও উৎখাত করে দেয়া। হিরাকেল মুসলমানদের ঘেরাও করার সুন্দর পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর এক সালার কনাতীরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তার অনুগত ৩০ হাজার সৈন্য ইন্তেকিয়ার পানি পথে বৈরুত যাবে। সেখান থেকে সৈন্যরা দামেস্ক পৌঁছাবে। এদের কাজ হবে, যদি মুসলমানরা সামনে থেকে হটে দামেস্কের দিকে আসে, তাহলে কনাতীরের বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করবে।

আরেক বাহিনীর সালার জাবালা বিন আইহামের দায়িত্ব ছিল হিমস পানে গিয়ে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোধ করা এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হিমসের উপর আক্রমণকারী সৈন্যদের মাঝে শুধু আরব ঈসায়ীরাই ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। হিরাকেল তাদের বলেছিলেন যে, তিনি আরবদের বিরুদ্ধে আরবদের লড়াতে চান।

"লোহাকে শুধু লোহাই কাটতে পারে" এটা হিরাকেলের ঐতিহাসিক শব্দ। হিমস এলাকায় হিরাকেলের আরেক সালার দেরযানেরও যাবার কথা ছিল। সে জাবালার উল্টো দিকের পথ ধরেছিল। যাতে মুসলমানরা কোনো দিক দিয়ে বেরুতে না পারে।

সালার গিরীগিরীর দায়িত্ব ছিল আরেক দিক দিয়ে হিমসে প্রবেশ করা এবং মুসলমানদের উপর হামলা চালানো। এভাবে হিমস ও তার আশ-পাশের অঞ্চলে মুসলমানদের উপর আক্রমণে নিয়োজিত রোমীয় সৈন্য ছিল ৯০ হাজার। সর্বাধিনায়ক মাহানের হাতে ছিল ৩০ হাজারের এক রিজার্ভ বাহিনী। তার

দায়িত্ব ছিল হিমসের আশে-পাশে কোথাও অবস্থান করা। যাতে কোথাও প্রয়োজন দেখা দিলে এ বাহিনী তৎক্ষণাৎ পৌছে যেতে পারে।

✪✪✪

"তোমার প্রতি আল্লাহর রহম বর্ষিত হোক ইবনে উহুদী!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হিরাকেলের পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ শুনে বলেন, "খোদার কসম, তুমি তোমার ঠিকানা জান্নাতে বানিয়ে নিয়েছ। যদি তুমি এসব খবর নিয়ে না আসতে তাহলে নিজেই চিন্তা করে দেখ, আমাদের পরিণাম কী হত! ... আবু সুলাইমান! হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, "তুমি কি অনুভব করছ না যে, আমরা এই বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে পারব না?"

হযরত খালিদ (রা.) যিনি ময়দানে দুশমনের রগ-রেশায় ছেয়ে যেতেন, তিনি চুপচাপ হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে দেখতে থাকেন।

"আবু সুলাইমান! আমাদের কি পেছনে হটে যাওয়াই শ্রেয় নয়?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, "পেছনে হটে যাওয়া একটি জরুরত ঠিকই কিন্তু পশ্চাদপসরণ আমার স্বভাব নয়।"

"খোদার কসম আবু সুলাইমান! তুমি যা চিন্তা করতে পার তা হয়ত আমার মাথায় আসে না" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "এখন নিজের দিকে চেয়ো না; বরং নিজের সাথী-সঙ্গী ও তাদের পরিণতির কথা ভাব এবং বল, আমাদের এখন করণীয় কী?"

"হ্যাঁ, ইবনে আব্দুল্লাহ!" হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর অপর নাম ধরে ডেকে বলেন, "আমি ঐ বাস্তবতা সামনে রেখে কথা বলব, যা আমাদের সামনে বর্তমান এবং ঐ তুফান যা আসছে তা রোধ করা আমাদের সাধ্য নেই। কিন্তু আমাদেরকে ঐ আল্লাহকেও মুখ দেখাতে হবে, যার নামে আমরা এখানে পর্যন্ত নিজেদের ও শত্রুদের রক্ত প্রবাহিত করে এসেছি। আমাদের জীবন তার দেয়া আমানত। ... প্রথম কাজ এই করুন যে, আমাদের সালাররা যে যেখানে আছে তাদেরকে সৈন্য সমেত এক স্থানে জমা হতে বলুন।"

"তাহলে সেসব স্থানের কী হবে যা আমাদের অধিকারে আছে?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আপনি অবশ্যই দুশমনদের অভিলাষ বুঝেন। তারা চূড়ান্ত লড়াই লড়তে আসছে এবং সব দিক

হতে আসছে। সামনে থেকে ... পেছন থেকে ...। ডান এবং বাম হতে ... এবং আপনি ইবনে উহুদী থেকে শুনেছেন যে, হিরাকেল আমাদের পশ্চাদপসরণের পথ রুখে দেয়ারও ব্যবস্থা নিয়েছেন। ... ইবনে আব্দুল্লাহ! রোম সম্রাট আমাদের বাহিনীকে সেখানে ঘেরাও করতে চান, যেখানে যেখানে তারা অবস্থান করছে। এটা তো আল্লাহর বড় দয়া যে, দুশমনের সব পরিকল্পনা আগাম আমরা জানতে পেরেছি।"

"এর থেকে কি এটা প্রকাশ পায় না যে, আমাদের পরাজয় বরণ আল্লাহ চান না?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন।

"আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছে আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "কিন্তু আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন না, যারা নিজেদের শত্রু এবং পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দেয়। ... হিরাকেল আমাদের বিক্ষিপ্ত রাখতে চান। আমাদের সকল সালারকে ঐ সব স্থান ছাড়তে হবে যা আমাদের কব্জায় আছে। যদি আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেন, তাহলে এসব স্থান আমাদেরই থাকবে।"

"আমাদের কোথায় সমবেত হতে হবে?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"যেখানে মরুভূমি আমাদের পেছনে থাকবে" হযরত খালিদ (রা.) জবাবে বলেন, "যত সহজে এবং দ্রুত আমরা মরুভূমিতে তৎপর হতে পারব, ততটা সহজে ও দ্রুত সেখানে হতে পারব না, যেখানে আমরা বর্তমানে আছি। মরুভূমিতে আমাদের শত্রুরা লড়তে পারবে না। আমরা মরুভূমিকে আমাদের নিকটে রাখলে প্রয়োজনে পেছনে সরা আমাদের জন্য সহজ হবে এবং যখন শত্রুরা আমাদের পেছনে পেছনে আসবে তখন তারা নিজেদের এলাকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।"

"তোমার মতে এমন স্থান কোথায়?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"যাবিয়া!" হযরত খালিদ (রা.) জবাবে বলেন, "সেখান থেকে তিনটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে এবং তার নিকটবর্তী এলাকা হতে মরুভূমি শুরু হয়েছে। ইয়ারমুক নদীও একেবারে কাছে।"

মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.)। কিন্তু তিনি নিজের তুলনায় হযরত খালিদ (রা.)-কে অধিক অভিজ্ঞ, যোগ্য এবং রণকৌশলী সালার মনে করতেন। এই জন্য তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে একান্ত উপদেষ্টা বরং ডান হাত বানিয়ে রেখেছিলেন। এবার হিরাকেল এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলেছিল, যা থেকে উত্তরণের জন্য তাঁর হযরত

খালিদ (রা.)-এর পরামর্শের বিশেষ দরকার ছিল। হযরত খালিদ (রা.) এর চেয়েও ভয়ঙ্কর ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ঘাবড়াতেন না। তিনি যে পরামর্শ দেন হযরত আবু উবায়দা (রা.) তৎক্ষণাৎ তার উপর আমল করা শুরু করে দেন। তখন বেশি ভাবার সময় ছিল না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।

হিরাকেলের বিশাল বাহিনী ইন্তেকিয়া হতে যাত্রা শুরু করেছিল। তখন হিমসের উপর মুসলমানদের অধিকারের তৃতীয় মাস চলছিল।

✪✪✪

হিরাকেলের বাহিনীর যে অংশটি জাবালা বিন আইহামের নেতৃত্বাধীন ছিল তারা ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হিমসের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। হিরাকেলের গোয়েন্দা তাকে জানিয়েছিল যে, সে মুসলিম বাহিনী সীরাজে অবস্থানরত দেখেছেন। কিন্তু জাবালার বাহিনী সেখানে পৌঁছে দেখে যে, সেখানে অবস্থানের চিহ্ন তো আছে কিন্তু একজন সৈন্যও সেখানে ছিল না।

জাবালা সেখানে মুসলমানদের না পেয়ে মন্তব্য করে যে, তারা হিমসে ফিরে গিয়ে একত্রিত হয়েছে। ফলে সে তার বাহিনীর অগ্রভাগকে হিমসে পাঠিয়ে দেয়। হিমসে পৌঁছে তারা দেখে যে, শহরের প্রবেশ মুখ খোলা। প্রাচীরের উপর শহরের লোকজন দাঁড়িয়ে ছিল। কোনো সৈন্য নজরে পড়ে না।

"মুসলমানরা কোথায়?" অগ্রবর্তী বাহিনীর সালার জিজ্ঞাসা করে।

"এখানে কোনো মুসলমান নেই" উপর হতে তারা জবাব পায়।

"তোমরা কি স্বীয় মাজহাবের দুশমনদের সঙ্গে মিশে গিয়েছ?" অগ্রবর্তী বাহিনীর রোমীয় সালার বলে, "দরজা খুলে রেখে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছ?"

"ভেতরে এসে দেখে যাও" দেয়ালের উপর হতে শহরবাসী বলে।

"যদি তোমরাও এই ধোঁকায় শরীক থাক, তাহলে এর পরিণতি মনে রেখো" অগ্রবর্তী বাহিনীর সালার বলে।

সালার তারপরও তার বাহিনীকে শহরের মধ্যে পাঠায় না; বরং সে শহরের বাইরেই সৈন্যদের রেখে সালার জাবালা বিন আইহামের উদ্দেশ্যে দূত পাঠায়। সে দূতের মাধ্যমে জানায় যে, শহরের প্রবেশদ্বার এভাবে খোলা থাকাকে আমার কাছে ধোঁকা মনে হচ্ছে। জাবালার কাছে পৌঁছে দূত বিষয়টা জানালে সেও একই মন্তব্য করে।

"এটা সুস্পষ্ট ধোঁকা" জাবালা গোস্বাভরে বলে, "মুসলমানরা আমাদের বাহিনীকে যেখানেই পরাজিত করেছে, ধোঁকা দিয়ে পরাজিত করেছে। তারা অবশ্যই শহরে আছে। তারা আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্য শহরের দরজা খুলে রেখেছে।"

জাবালা তার ত্রিশ হাজার সৈন্যকে এই নির্দেশ দিয়ে যাত্রা করতে বলে যে, হিমসের দরজা দিয়ে প্লাবনের মত ঢুকবে এবং সারা শহরে ছড়িয়ে পড়বে না। মুসলমানরা শহরবাসীদের ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। তার আশঙ্কা এই ছিল যে, তার বাহিনী শহরে ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানরা তার সৈন্যদেরকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিবে।

জাবালার নির্দেশে তার বাহিনী প্লাবনের মত হিমস শহরে প্রবেশ করে এবং মুসলমানদের আহ্বান জানাতে থাকে যে, তারা যেন বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোনো মুসলমান বাইরে আসে না। জাবালা ঝুঁকি নিয়ে নির্দেশ দেয় যে, ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাও। সৈন্যরা শহরবাসীদের ঘরে ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তল্লাশী করার বাহানায় সৈন্যরা ঘরে ঘরে লুটপাট চালায় এবং মহিলাদের প্রতি হাত বাড়ায়। এতে শহরবাসী চিৎকার করতে করতে বাড়ির বাহিরে চলে আসে।

"তোমাদের চেয়ে তারা ভাল ছিল যারা চলে গেছে।"

"তোমরা স্বীয় মাজহাবের মান-মর্যাদাও রাখনি।"

"আমাদের ধর্মের সম্মান মুসলমানরা রেখেছিল।"

"তারা আমাদের থেকে নেয়া কর ফেরত দিয়ে গেছে।"

"তারাই ভাল ছিল। ... তারাই ভাল ছিল।"

"মুসলমানরা তোমাদের মত লুটেরা ছিল না।"

জাবালা বিন আইহাম শহরের পুরুষ-মহিলাদের চিৎকারের আওয়াজ শুনতে থাকে। তার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, মুসলমানরা চলে গেছে। সে যখন স্বীয় ধর্মাবলম্বীদের মুখ থেকে শুনতে পায় যে, মুসলমানরা ভাল ছিল এবং তারা তোমাদের মত লুটেরা নয় এবং তারা করও ফেরত দিয়ে গেছে, তখন সে স্বীয় বাহিনীকে এক স্থানে জমা করে।

"পরাজয় তোমাদের ভাগ্যের লিখন হয়ে গেছে" জাবালা তার বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলে, "আজ প্রথমবারের মত আমি জানলাম যে, মুসলমানদের বিজয়ের কারণ কী এবং কেন প্রত্যেক গোত্র ও শহরবাসী তাদের অভ্যর্থনা জানায়। এটা ক্রুসেডারদের শহর। মুসলমানরা তা জয় করে তাদের ইজ্জত ও আব্রুর উপর হাত তোলেনি। তোমরাও ক্রুসেডার। কিন্তু তোমরা তাদের ইজ্জত নষ্ট করেছ এবং তাদের ঘর-বাড়ি হতে মূল্যবান জিনিস লুণ্ঠন করেছ। তোমরা লড়তে আসনি; এসেছ লুটপাট করতে। অথচ এটা বলে বেড়াও যে, মুসলমানদের মাঝে কোনো গায়েবী শক্তি আছে। তোমরা লড়াই ব্যতীত এই শহর দখল করেছ। যদি তোমাদের ঈমান থাকত। তাহলে না লুটপাট করতে আর না কোনো মেয়েলোকের প্রতি চোখ তুলে চাইতে। ... তোমরা শহরবাসীদের ঘর-বাড়ি হতে যা যা লুটে এনেছ তা আমার সামনে এনে জমা কর।"

মুসলমানদের পক্ষ হতে হিমসবাসীকে আদায়কৃত কর ফেরৎ দেয়াটা ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ও বাস্তবতা। ঐতিহাসিক বালাজুরি, আবু সাঈদ, ইবনে হিশাম এবং আল্লামা তবারী (রহ.) লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.)-এর পরামর্শের ভিত্তিতে যখন সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা (রা.) বিজিত এলাকা ও শহর ছেড়ে যাবিয়া নামক স্থানে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন, তখন তিনি হিমসের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে পাঠান এবং তাদের জানান যে, তারা হিমস হতে চলে যাচ্ছেন। এতে প্রথমে লোকজন বিষয়টি বিশ্বাস করে না। যখন বিশ্বাস হয়ে যায় যে, বাস্তবেই তারা চলে যাচ্ছে, তখন তারা দুঃখ প্রকাশ করে।

"আমরা প্রথমবারের মত ন্যায়-ইনসাফ দেখেছিলাম" এক শহরবাসী বলে, "আমরা জুলুম, অবিচার এবং বেইনসাফির রাজত্বও দেখেছিলাম। আপনারা ন্যায়-ইনসাফ এবং ইজ্জত-সম্মান হতে বঞ্চিত করে পুনরায় আমাদেরকে জালেমদের হাওলা করে যাচ্ছেন।"

"আল্লাহ চাইলে আমরা আবার আসব" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমি আপনাদের ঐ কর ফেরৎ দিব বলে ডেকেছি যা আমরা আপনাদের থেকে উসূল করেছিলাম।"

"না" শহরবাসীরা সর্বসম্মতভাবে বাধা দিয়ে বলে, "আমরা আমাদের কর ফেরত নিব না।"

"এই কর নেয়া আমাদের জন্য হারাম হয়ে গেছে" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমরা আপনাদের থেকে এই শর্তে কর নিয়েছিলাম যে, আমরা আপনাদের হিফাজতের দায়িত্ব নিব। কিন্তু এখন আমরা আপনাদের সেসব লোকদের দয়া-করুণার উপর ছেড়ে যাচ্ছি, যাদেরকে আপনারা জালেম ও স্বৈরশাসক বলে মনে করেন। আমরা আপনাদের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। আপনারা কর ফেরত নিয়ে যান এবং এটা সারা শহরবাসীদের ফেরৎ দিয়ে দিন।"

ঐতিহাসিক আবু ইউসুফ লিখেছেন, হিমসবাসী পূর্ব হতেই মুসলমানদের আচার-আচরণ, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং ন্যায়-ইনসাফ দেখে প্রভাবান্বিত ছিল। এমনকি হিমসে অবস্থানরত ইহুদীদের নেতা হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেছিলো, হিমসে ভবিষ্যতে সেসব প্রশাসকরাই প্রবেশ করতে পারবে, যারা প্রচুর সেনা শক্তি নিয়ে আসবে। অন্যথায় তারা আর কোনো জাতিকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিবে না। এক ইহুদীর মুখ নিঃসৃত কথা মুসলমানদের পক্ষে এই কারণে বিস্ময়কর যে, ইহুদীরা হলো বিশ্বে মুসলমানদের এক নম্বর শত্রু।

✪✪✪

রোমীয় সৈন্যদের অপর সালার কনাতীর হিরাকেলের পরিকল্পনা অনুসারে দামেস্ক হামলা করতে যায়। কিন্তু সে সেখানে একজন মুসলমানেরও দেখা পায় না। মুসলমানরা দামেস্ক ছেড়ে যাবিয়া চলে গিয়েছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বিজিত এলাকার সকল প্রশাসক বরাবর নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, সেখান থেকে যাত্রা করার পূর্বে মানুষদের থেকে যে কর নেওয়া হয়েছে তা যেন ফেরৎ দেয়া হয়। কারণ, আমরা তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। সুতরাং এই নির্দেশনার আলোকে দামেস্কবাসীকেও তাদের কর ফেরত দেয়া হয়েছিল।

এভাবে মুসলমানরা তাদের পেছনে বিরাট প্রভাব রেখে এসেছিল। তারা সমগ্র বিজিত অঞ্চল ছেড়ে সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুক নদীর থেকে ৭/৮ মাইল দূরে যাবিয়া নামক স্থানে সমবেত হয়েছিল। তাদের মধ্যে শোরাহবিল বিন হাসানা (রা.), হযরত আমর বিন আস (রা.), হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.), হযরত যাররার (রা.) প্রমুখ সালারগণ উল্লেখযোগ্য ছিল। সকলে উপস্থিত হলে সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা (রা.) সবাইকে পরামর্শ করার জন্য ডেকে পাঠান।

"তোমরা সকলে সুখী হও" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "তোমরা কি আমার চেহারায় ঐ পেরেশানি দেখছনা, যা তোমাদের একে অপরের চেহারায় রয়েছে? কিন্তু এই পেরেশানি নিরাশা নয়। ঐ সত্ত্বা হতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়, যার রসূলের আনুগত্য এবং অনুসরণে আমরা দীর্ঘদিন যাবত ঘর ছাড়া হয়েছি। আমরা পিছুটান দেইনি; পেছনে সরে এসেছি মাত্র এবং তা শুধু এ জন্য যে, সম্মিলিতভাবে ঐ দুশমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব, যারা আমাদের ধর্মের দুশমন। ... তোমরা কি শোননি যে, হিরাকেলের সৈন্য সংখ্যা দেড় লাখের মত।"

"হ্যাঁ, আমীনুল উম্মত!" সালারদের আওয়াজ শোনা যায় "শুনেছি।"

"পক্ষান্তরে আমরা কতজন?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "চল্লিশ হাজার। ... তবে কথা হলো তোমরা প্রতি রণাঙ্গনে সংখ্যায় কমই ছিলে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় ওয়াদা পূরণ করেছেন যে, ঈমানদাররা বিশ জন হলে তারা দুইশ কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। তারপরও আমি তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলতে চাই না। নির্দেশ দিব না। তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।"

"এটা কি উচিত হবে না যে, আমরা ফিরে যাই?" এক সালার বলেন, "হিরাকেল সবসময় এত বেশি সৈন্য রাখবে না। যখনই জানা যাবে যে, হিরাকেল সৈন্য হ্রাস করেছে; আমরা পুনরায় চলে আসব। আমরা আগের চেয়ে বেশি প্রস্তুতি নিয়ে আসব।"

এর অর্থ এই হবে যে, আমাদের মুজাহিদ বাহিনী এত রক্ত প্রবাহিত করে এবং এত কুরবানী দিয়ে যেসব এলাকা জয় করেছে তা আবার রোমীয়দের ফেরৎ দেয়া” হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, “যদি আমরা এমন করি তাহলে আমাদের সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে এবং দুশমনদের মনোবল বেড়ে যাবে। রোমীয় বাহিনীর উপর আমরা যে গভীর প্রভাব ফেলেছি, তা শেষ হয়ে যাবে।”

“আমরা চূড়ান্ত লড়াই লড়ব”। আরেক সালার বলেন, “জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে।”

এই মতের উপর বেশির ভাগ সালারগণ লাব্বাইক বলেন।

“লড়াই ব্যতীত ফেরৎ গেলে মদীনাবাসীদের কীভাবে মুখ দেখাব?”

“তখন ‘পিছুটানও’ আমাদের ইতিহাস হয়ে যাবে।”

“আমাদের সন্তানরা এই শিক্ষা পাবে যে, শত্রুরা শক্তিধর হলে পলায়নও করা যায়।”

হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি তাকান। তিনি সম্পূর্ণ নীরবভাবে বসে ছিলেন। তিনি কারো স্বপক্ষে কোনো কথা বলেন না এবং কারো মতের বিরোধিতাও করেন না।

“কী হলো আবু সুলাইমান?” হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, “তুমি কোনো পরামর্শ দিবে না? তোমার দুঃসাহসিকতা এবং যোগ্যতার প্রয়োজন তো এখন। তুমি কী চিন্তা করছ?

“ইবনে আব্দুল্লাহ!” হযরত খালিদ (রা.) বলেন, “যে যাই বলুক না কেন, তা নিজ নিজ স্থানে সঠিক। কিন্তু আমি অন্য কিছু বলতে চাই। আমি এটাও বলতে চাই যে, সকলে মিলে আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিবেন আমি তাও মেনে চলব এবং আপনার প্রতিটি নির্দেশ পালন করব।”

“তুমি যা বলতে চাও বল আবু সুলাইমান!” হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, “তোমার মতামতের বেশি প্রয়োজন আমার।”

“প্রথম কথা হলো, আমীনুল উম্মত!” হযরত খালিদ (রা.) বলেন, “আমরা বড়ই ভয়ঙ্কর স্থানে এসে সমবেত হয়েছি। এখান থেকে সামান্য দূরে কায়সারিয়ায় রোমীয় সেনা বিদ্যমান। তাদের সংখ্যা ৪০ হাজার। তাদের সালার হলো হিরাকেলের এক পুত্র; তার নাম কুসতুনতীন। আমাদের মোট সংখ্যা যা, একা কুসতুনতীনের তাই। আমরা এমন স্থানে অবস্থান করছি যে, তারা আমাদের পশ্চাৎ হতে সহজে আক্রমণ করতে পারে। এমন হামলা তারা তখন করবে, যখন সামনের দিক হতে হিরাকেলের বাহিনী আমাদের উপর চড়াও

হবে। আমাদের উচিত দ্রুত ইয়ারমুকে চলে যাওয়া। স্থানটি অশ্বারোহীদের লড়াইয়ের খুবই উপযোগী। আর এখানে আরেকটি লাভ হলো, মদীনা হতে সৈন্য এবং রসদ আসার পথ খোলা থাকবে।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) অন্যান্য সালারদের দিকে তাকান। সকলেই একযোগে বলেন যে, এর চেয়ে ভাল কোনো প্রস্তাব হতে পারে না। ফলে হযরত আবু উবায়দা (রা.) তৎক্ষণাৎ যাবিয়া হতে ইয়ারমুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। হযরত খালিদ (রা.)-কে পশ্চাৎভাগ সংরক্ষণের জন্য তথায় রেখে দেন। হযরত খালিদ (রা.)-কে ঐ চার হাজার অশ্বারোহীর সালার বানানো হয়, যাদেরকে হযরত খালিদ (রা.) তৈরী করেছিলেন। এরা সবাই ছিল সুদক্ষ বীর যোদ্ধা। এ বাহিনী এক স্থানে থেকে লড়াই করত না; বরং স্থান পরিবর্তন করে করে তারা লড়ত। এটা হযরত খালিদ (রা.)-এর গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনার ফল ছিল যে, তিনি গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পেরেছিলেন, কায়সারিয়ায় হিরাকেলের যে ফৌজ আছে তাদের সংখ্যা ৪০ হাজার আর সে বাহিনীর সালার হলো হিরাকেলের পুত্র কুসতুনতীন।

✪✪✪

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন, সমর রীতি ও যুদ্ধ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য এবারের মত রোমীয় বাহিনীর মুখোমুখী হওয়া উচিত ছিল না। মাত্র ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রায় দেড় লাখ থেকে দু'লাখ সৈন্যের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। রোম সম্রাট সত্যিকার অর্থেই সৈন্য এবং ঘোড়ার এমন তুফান নিয়ে এসেছিলেন, যার সামনে যে কোনো ফৌজ দাঁড়াতেই পারত না। কিন্তু মুসলমানরা ঐ তুফানের সামনে বাঁধ নির্মাণ এবং তাকে রুখে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে। তাদের মূল শক্তি ছিল ঈমানী জযবা ও প্রেরণা।

মুসলমানদের দৃঢ় প্রেরণা এবং প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গীকারের পশ্চাতে এক কারণ এই ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.) তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন আর হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন আপাদমস্তক প্রেরণা ও মনোবলের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর আকীদা-বিশ্বাস ছিল, ঈমানের সামনে কোনো বাতিল টিকে থাকতে পারে না। হযরত খালিদ (রা.) একটি দৃষ্টান্ত সেখানেই স্থাপন করেন। আর তা এভাবে যে, মুসলিম সৈন্যরা যাবিয়া হতে রওনা হয়ে গেলেও হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নির্দেশক্রমে তিনি যাবিয়া থেকে যান।

ওদিকে হিরাকেলের বাহিনী এত দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে যে, তাঁর সালারদের যে এলাকায় পৌঁছে যাবার নির্দেশ ছিল তারা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে

সেসব এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। এতে করে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন হিরাকেলের সৈন্যে ছেয়ে গিয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.) যাবিয়া হতে রওনা হবেন ইত্যবসরে হঠাৎ ডান দিক থেকে রোমীয় একটি বাহিনীকে আসতে দেখা যায়। তারা কোনো বাহিনীর অগ্রবর্তী দল ছিল। তাদের সংখ্যা হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর চেয়ে বেশি ছিল। রোমীয় বাহিনীর পশ্চাৎ দিক সুরক্ষিত ছিল। ফলে তারা পেছনে আসা মূল বাহিনীর ভরসায় হযরত খালিদ (রা.)-এর চার হাজার অশ্বারোহীর উপর আক্রমণ চালায়। হযরত খালিদ (রা.) নিজেই এ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে স্থান পরিবর্তন করে করে যুদ্ধ করার বিন্যাসে বিন্যস্ত করে দেন।

রোমীয় বাহিনীর লোকেরা অত্র এলাকার ঈসায়ী ছিল। তারা যুদ্ধ বিন্যাসে একের পর এক আক্রমণ চালাচ্ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর অশ্বারোহীদের আক্রমণ পদ্ধতি ভিন্নরূপ ছিল। ফলে ঈসায়ীদের প্রতিটি আক্রমণ এভাবে ব্যর্থ হতে থাকে, যেমনভাবে চৌকস ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত ঘুষি সে ব্যক্তির শরীরে না লেগে বাতাসের গায়ে লাগে। যার দরুন সামান্য সময়ের ব্যবধানে ঈসায়ী অশ্বারোহীরা রণাঙ্গনে অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় এবং এই সুযোগে মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের কচুকাটা কাটতে থাকে।

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বিশেষ নারাধ্বনি "আমি খালিদ বিন ওলীদ" প্রদান করলে রণাঙ্গনের চিত্রই পাল্টে যায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর এই নারাধ্বনি পূর্বের থেকে রোমীয় সৈন্যদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই নারাধ্বনির সঙ্গে এক ত্রাসের গভীর যোগসূত্র ছিল। ঈসায়ী সৈন্যদের বিন্যাস ইতিপূর্বেই ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের উপর প্রবল হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর হযরত খালিদ (রা.)-এর এই নারাধ্বনি শেষ শক্তিটুকুও লোপ করে দেয় এবং ঈসায়ীরা এলোপাতাড়িভাবে পলায়ন করতে শুরু করে।

হযরত খালিদ (রা.) এই যুদ্ধ শেষ হতেই স্বীয় বাহিনীর উদ্দেশ্যে চলে যান না; বরং দুই, তিন দিন সেখানেই অবস্থান করেন। তাঁর ধারণা ছিল, রোমীয় বাহিনী তাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আসবে। হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের এটা জানিয়ে দিতে চান যে, মুসলমানরা কোথাও পালিয়ে যায়নি এবং তারা জীবিত থেকে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। কয়েকদিন অবস্থান সত্ত্বেও যখন রোমীয় বাহিনী আসে না, তখন হযরত খালিদ (রা.) মূল বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

ঐতিহাসিক গীবন লিখেছেন, রোমীয় বাহিনী হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে মার খেয়ে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে গিয়ে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। যুদ্ধের জন্য স্থানটি সব দিক চেয়ে মোক্ষম মনে হয়। এভাবে মুসলমানরা যুদ্ধের একটি ভাল অবস্থানস্থল দ্বারা লাভবান হয়। রোমীয়রা দুই কারণে খুব খুশি ছিল। এক হলো, তারা মুসলমানদের হাত থেকে তাদের হারানো শহরগুলো ফিরে পেয়েছে আর দ্বিতীয় কারণ হলো, তারা বর্তমানে একটি বিশাল বাহিনী তৈরী করেছে। এ কারণেই তারা মুসলমানদের ধরতে তাদের পিছু পিছু ছুটছিল।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর পরামর্শক্রমে স্বীয় বাহিনীকে যুদ্ধের বিন্যাসে বিন্যস্ত করেন। সৈন্যরা তাঁবুতে অবস্থান না করে সর্বক্ষণ প্রস্তুতি নিয়ে থাকত। তারা বাম পার্শ্বকে সংরক্ষিত রাখার জন্য পাহাড় দ্বারা লাভবান হয়। মুসলমানদের রণাঙ্গনের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১ মাইলের মত হয়েছিল এবং পুরুত্ব মোটেও ছিল না।

রোমীয়রা নিজেদের বিশাল বাহিনী সত্ত্বেও সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছিল। অথচ তাদের জানা ছিল যে, মুসলমানদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪০ হাজার। এর চেয়ে কম হতে পারে, বেশি নয়। আর কোথাও হতে দ্রুত তাদের সাহায্য পাবারও সম্ভাবনা ছিল না।

রোমীয় বাহিনী কয়েক দিন পরে সামনে আসে। কিন্তু এসেই তারা হামলা করে না। তারা মুসলমানদের থেকে কয়েক মাইল দূরে থেমে যায় এবং সৈন্যদেরকে যুদ্ধের বিন্যাসে ছড়িয়ে দেয়। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, রোমীয় বাহিনীর সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, বাস্তব অর্থে স্থানটি মানুষ ও ঘোড়ার সমুদ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। তাদের রণাঙ্গনের দৈর্ঘ্য ছিল ১৮ মাইল এবং পুরুত্বও ছিল বেশ। এক কাতারের পেছনে ছিল আরেক কাতার।

রোমীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মাহান সামনে এসে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। স্বীয় বাহিনীর উপর তার এত গর্ব ছিল যে, সে মুসলমানদের কাতারের কাছাকাছি চলে আসে। তার চেহারায় দম্ভ এবং ঠোঁটে উপহাসের হাসির ঝিলিক ছিল। মুসলমানরা তাকে নীরবে দেখতে থাকে আর সে তুচ্ছ দৃষ্টিতে মুসলমানদের দেখতে দেখতে সামনে অগ্রসর হয়। তার পেছন পেছন ১২ জন বডিগার্ড ঘোড়ায় চড়ে বড়ই শান-শওকতের সঙ্গে চলছিল।

✪✪✪

রোম সর্বাধিনায়ক মাহান বেশি দূর না যেতেই তার বাহিনীর দিক হতে এক অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত আসে। অশ্বারোহীকে আসতে দেখে মাহান দাঁড়িয়ে যায়। অশ্বারোহী তার নিকটে এসে থেমে যায় এবং রোমীয় রীতিনীতি

অনুযায়ী সালাম দিয়ে তার হাতে কী যেন দেয়। এটা ছিল সম্রাট হিরাকেলের পত্র, যা তিনি ইন্তেকিয়া হতে মাহানের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন। এটা মূলত বাণী নয়, সম্রাট হিরাকেলের ফরমান ছিল।

হিরাকেল উক্ত পত্রে তাকে লিখেন যে, মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার পূর্বে তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চেষ্টা করবে। মুসলমানরা যদি এই শর্ত মেনে নেয় যে, তারা নিরাপদে স্বদেশে চলে যাবে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো রোম সাম্রাজ্যের সীমানার ভেতরে ঢোকার দুঃসাহস করবে না, তাহলে তাদেরকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সম্মানের সঙ্গে বিদায় করে দিবে। নিজেদের পক্ষ হতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, যেন তারা সন্ধি করতে রাজি হয়ে যায়। যদি তারা তোমাদের কথা না মানে তাহলে আরব ঈসায়ীদের ব্যবহার করবে। হতে পারে তারা তাদের বুঝাতে সক্ষম হবে এবং তাঁরা তাদের কথা মেনে যুদ্ধ-বিগ্রহ না করেই স্বদেশ চলে যাবে।

মাহান রাজকীয় বার্তাটি পড়লে রাগে-গোস্বায় তার চেহারা লাল হয়ে যায়। সে দূতকে বিদায় জানায়।

"এই বদ্দুদের সামনে যদি হাঁটু গেড়ে বসতে হয়, তাহলে আর এত বিশাল সৈন্য জমা করার কী দরকার ছিল?" ক্ষোভের সঙ্গে বলে।

সে পেছনে তাকায়। তার বডিগার্ডরা তার কথা শুনছিল। সে মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকায় এবং ঘোড়াকে তাদের দিকে ঘুরায়। মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে ঘোড়া থামায় এবং এক বডিগার্ডকে তলব করে।

"তাদের বলো যে, তাদের সর্বাধিনায়ক যেন সামনে আসে" সে এক মুহাফিজকে বলে "এবং বলবে যে, আমাদের সর্বাধিনায়ক মাহান সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছেন।"

মুহাফিজ সালার মাহানের কথা উচ্চস্বরে কয়েকবার বলে। মুসলমানদের পক্ষ হতে উত্তর আসে "আসছে"।

এখানে প্রশ্ন হলো, মুসলমানদের হাতে হিরাকেলের অর্ধেক সৈন্য মারা পড়েছিল। প্রচুর মাল-সম্পদ গণীমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল এবং মুসলমানরা রোম সাম্রাজ্যের অনেক ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছিল। এত কিছুর পরেও হিরাকেল তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিচ্ছেন কেন? তিনি দেড় লাখ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েও মুসলমানদের সামনে সন্ধির প্রস্তাব দিচ্ছেন কেন?

আপাত দৃষ্টিতে এই উত্তর সামনে আসে যে, তাঁর বাহিনীর উপর মুসলিম বাহিনীর ভীতি ছেয়ে ছিল। এতে তাঁর সন্দেহ জাগে যে, হয়তবা মুসলমানরা তাঁর এই বিশাল বাহিনীকেও পরাস্ত করে দিতে পারে। কিন্তু তৎযুগের ঘটনা বিশ্লেষক,

ঐতিহাসিক এবং পরবর্তী ইতিহাস প্রণেতারা বিভিন্ন সূত্রে লিখেছেন যে, হিরাকেল অসভ্য শত্রু ছিলেন না। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। বীরের জাতিকে তিনি মূল্যায়ন করতেন। হযরত খলিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনি প্রভাবিত ছিলেন। তিনি চান না যে, একটি বীরের জাতির দুঃসাহসিক সৈন্যরা তাঁর বাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। তিনি মুসলমানদের জীবিত ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, মুসলমানরা যদি জযবায় পড়ে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে মুসলমানরা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের শিকার হবে।

হিরাকেল আসলে কী ভেবে সন্ধির প্রস্তাব দেন তা নির্ণয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের ভাবনা ছিল ভিন্ন। যুদ্ধের ময়দানে তারা না কারো প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, না নিজেরা কারো আনুকূল্য চায়। নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রুদের শক্তি কয়েকগুণ বেশি হওয়াটা কখনো তাদের উদ্বিগ্ন করত না।

✪✪✪

রোমীয় সালার মাহানের ডাকে হযরত আবু উবায়দা (রা.) সামনে এগিয়ে আসেন। তার সঙ্গে একজন দোভাষী ছিল।

"হে সালার!" মাহান গম্ভীর কণ্ঠে বলে, "তুমি কী এখান থেকে নিরাপদে চলে যেতে চাও?"

"আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা চাই" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "কিন্তু চলে যেতে চাই না।"

"সম্রাট হিরাকেলের হুকুম পালন করা আমার উপর অপরিহার্য"। মাহান বলে, "তাঁরই নির্দেশে আমি তোমার কাছে এসেছি।"

"কিন্তু আমার রোমীয় বন্ধু!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমাদের জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মানা জরুরী।"

"রোম সম্রাট তোমাকে একটি সুযোগ দিচ্ছেন" মাহান বলে, "আর তা হলো, তোমার বাহিনীকে আমার বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করা হতে বিরত রাখ। ... আমি একজন সালারকে সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করতে পাঠাচ্ছি।" অতঃপর সে চলে আসে।

রোমীয় সৈন্যদের যে সালার সন্ধির আলোচনার জন্য আসে সে ছিল গিরীগিরী।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

"আমি রোম সম্রাট হিরাকেলের পক্ষ হতে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করার জন্য এসেছি" গিরীগিরী বলে, "যদি তোমরা স্বদেশ ফিরে যাও এবং আর কখনও এ মুখো না হওয়ার অঙ্গিকার কর, তাহলে আমাদের শহর ও এলাকাসমূহ হতে

যেসব মালে গণীমত নিয়েছ, তা তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। আমাদের সৈন্যসংখ্যা দেখ আর তোমার সৈন্যসংখ্যা দেখ।

"যদি এই যুদ্ধ আমার ব্যক্তিগত হত তাহলে আমি তোমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতাম।" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমি রাজাধিরাজ নই; রাজাধিরাজ হলেন আল্লাহ তা'আলা। আমরা তাঁরই নির্দেশে এসেছি। আমরা এ মুহূর্তে আপনাদের প্রস্তাব সাড়া দিতে পারছি না।"

গিরীগিরী চলে যায়। হিরাকেল তাঁর ফরমানে লিখেছিলেন, সন্ধিতে মধ্যস্থতা অবলম্বন করবে। এই নির্দেশ পালনার্থে মাহান আরেক সালার জাবালা বিন আইহামকে পাঠায়।

"তবে কী তোমাদের সৈন্যদের সকল সালার পালাক্রমে সন্ধির বার্তা নিয়ে আসবে?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, "কেউ কী এমন আছে যে আমার অস্বীকারকে স্বীকারে পরিবর্তন করবে?"

"সন্ধির বার্তা নিয়ে আগমনকারীদের মধ্যে আমিই সর্বশেষ সালার" জাবালা বলে, "আমি এজন্য এসেছি যে, আমিও একজন আরব। আমি ঈসায়ী হলেও আমার অন্তরে স্বদেশবাসীর মহব্বত রয়েছে। আমি আপনাদেরকে ধ্বংসযজ্ঞ হতে বাঁচাতে এসেছি। আপনারা ফিরে যান। এতে আপনাদের কোনো দাবী থাকলে তা ব্যক্ত করুন। আমি তা পূরণ করব।"

"আমাদের দাবী তোমাদের অজানা নেই" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমরা অনুদান চাই না; কর নিব"।

"হে আরব সালার!" জাবালা অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে "৪০ হাজার সৈন্য কি তাদের থেকে চার গুণ বেশি সৈন্য হতে কর উসূল করতে পারে?"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) শাহাদাত আঙ্গুল আসমান পানে উঁচু করেন এবং তাঁর ঠোঁটে হাল্কা হাসির আভা খেলে যায়। তিনি রোমীয়দের প্রতিটি প্রস্তাব 'না' করে দেন এবং সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানান।

✪✪✪

৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস মোতাবেক ১৫ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসের তৃতীয় সপ্তাহ শুরু হয়েছিল। জাবালা বিন আইহাম স্বীয় সর্বাধিনায়ক মাহানকে গিয়ে বলে, মুসলমানরা কোনো মূল্য এবং শর্তে সন্ধি করতে প্রস্তুত নয়।

"আমরা রোম সম্রাট হিরাকেলের হুকুম তামিল করেছি" মাহান বলে "আমি মধ্যস্থতাও ব্যবহার করেছি। জাবালা! এবার ঐ পদ্ধতি অবলম্বন কর, যা সম্রাট হিরাকেলের পছন্দনীয় ছিল না। ঐ হতভাগা ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী মুসলমানদের উপর আক্রমণ কর। এতে আমাদের শক্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা

আসবে আর আমরাও দেখে ছাড়ব যে, তাদের মাঝে প্রেরণা কেমন এবং তাদের আক্রমণের ধরন কীরূপ।"

রোমীয় বাহিনীর ক্যাম্প কয়েক মাইল জুড়ে ছিল। জাবালা তার বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের সামনে চলে আসে। তার বাহিনীকে রোমীয় অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। এ অস্ত্রগুলো ছিল খুবই দামী ও উন্নত। এ বাহিনীর সৈন্যরা ছিল আরবী ঈসায়ী। তারা যখন সামনে আসে তখন মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। জাবালা এসেই হামলা করে না। সে মুসলমানদের যুদ্ধসাজ দেখে হামলা করতে চাচ্ছিল।

পরিশেষে সে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নির্দেশ দেয়। তারা মুসলমানদের সামনের সারিতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই তার সৈন্যদের দুই পার্শ্বস্থ বাহিনীর উপর হামলা শুরু হয়ে যায়। হামলা চালিয়েছিল মুসলিম অশ্বারোহী ইউনিট।

এ দলের কমান্ডার ছিলেন হযরত খালিদ (রা.)। ঘুরে-ফিরে লড়াইকারী এই বাহিনী নিজেদের বিশেষ ঢং ও পন্থা অবলম্বন করে। এতে জাবালার বাহিনীর বিন্যাসে পতন ঘটে। সম্মুখ দিক দিয়েও মুসলমানরা আক্রমণ করেছিল।

ঈসায়ীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। দুই পার্শ্ব বাহিনীর উপর আক্রমণের ধারণা তাদের ছিল না। মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের বিক্ষিপ্ত করে দেয়। ঈসায়ীদের জন্য পালানো ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। অসংখ্য লাশ আর আহত সৈনিকদের পেছনে ফেলে রেখে তারা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পিছু হটে যায়।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, মাহান মুসলমানদের লড়াই করতে দেখে এবং যে দ্রুত গতিতে মুসলিম অশ্বারোহীরা জাবালার বাহিনীর উপর হামলা করেছিল, তাও সে দেখে এবং এতেই সে বুঝে ফেলে যে, মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করা বড়ই কঠিন এবং তার জন্য আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। মাহান হামলা করার জন্য আর কোনো বাহিনী প্রেরণ করে না।

মাহানের ধারণা ছিল, মুসলমানরা জবাবী হামলা করবে। কিন্তু সংখ্যার স্বল্পতা মুসলমানদের অপারগতা ছিল। জবাবী হামলা করার মত ঝুঁকি নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ওদিকে জাবালাও সতর্ক হয়ে যায়। দিন অতিক্রান্ত হতে থাকে। উভয় বাহিনী পরস্পরকে পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য লোক নিযুক্ত করে।

এই যুদ্ধবিরতি মুসলমানদের পক্ষে যায়। ইত্যবসরে মদীনা হতে আগত ৬ হাজার অতিরিক্ত ফৌজ তারা পেয়ে যায়। এদের সবাই ছিল ইয়ামানী এবং তাজাদম। নতুন সৈন্য আসায় মুসলমানদের শক্তি কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পায়।

মুসলিম বাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ হলো, তাদের সর্বমোট সৈন্য ছিল ৪০ হাজার। তাদের মধ্যে একহাজার ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সাহাবী। এই এক হাজারের মধ্যে একশত এমন মুজাহিদও ছিলেন, যারা নবীজীর সঙ্গে বদর যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাদের মধ্যে নবীজীর ফুফাতো ভাই হযরত যুবায়ের (রা.)ও ছিলেন। আরও ছিলেন দু'জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দা। হিন্দা ছিলেন সেই মহিলা যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)-এর বুক ফেঁড়ে কলিজা বের করে কাঁচা কলিজা চিবিয়ে ছিলেন। হযরত আবু সুফিয়ানের ছেলে হযরত ইয়াযিদ (রা.) পূর্ব হতেই ৪০ হাজার সৈন্যের অন্তর্গত ছিলেন এবং একটি দলের সালারও ছিলেন।

✪✪✪

পর্যবেক্ষণে কেটে যায় এক মাস। ইতিমধ্যে শত্রুরা যখন অনুধাবন করে যে, তাদের সৈন্যরা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে আর ওদিকে মুসলমানদের সংখ্যাও তেমন বাড়েনি। 'তখন তারা আর অপেক্ষা করাকে ঠিক মনে করে না। কিন্তু তারপরও আরেক বার তারা সন্ধির জন্য চেষ্টা করাকে জরুরী মনে করে। তারা এক দূতকে এই বার্তা দিয়ে মুসলিম শিবিরে পাঠায় যে, তাদের সর্বাধিনায়ক যেন আলোচনা করতে আমাদের এখানে আসে।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, "এটা কি ভাল হয় না যে, এবার তুমি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল। নিজস্ব শক্তিমত্তা দেখিয়ে তারা আমাদের সন্ধি করাতে চায়।"

"আমারই যাওয়া উচিত আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তাদের নেতার সঙ্গে আমিই কথা বলব।"

হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ায় চেপে বসেন এবং ঘোড়া ছুটিয়ে দেন।

মাহানকে দেখা যাচ্ছিল না। হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে কয়েকজন মুহাফিজ ছিল। হযরত খালিদ (রা.) রোমীয় শিবিরে চলে যান। মাহান তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তাঁকে তার খাস কামরায় নিয়ে যায়। মাহানের তাঁবুতে গিয়ে বুঝা যাচ্ছিল না যে, এটা কোনো রণাঙ্গন; বরং তা ছিল একটি শাহী কামরা।

"আমিই মাহান!" মাহান নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, "রোমীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।"

"আমি কিছুই নই" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমার নাম খালিদ বিন ওলীদ।"

"আপনিই সব কিছু ইবনে ওলীদ!" মাহান বলে, "যেখানে আপনি যাবেন না সেখানেও আপনার নাম পৌঁছে গেছে। ... আমার ধারণা, আপনি যতটা যোগ্য

এবং দুঃসাহসী সালার তেমনি অত্যন্ত জ্ঞানীও বটে। আপনার কী এটা ভাল লাগবে যে, আপনাদের ৪০ হাজার সৈন্য আমার ঐ সৈন্যদের হাতে মারা যাক, যারা অনেক অনেক দূর পর্যন্ত প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে? জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো পাথরের প্রাচীরের সঙ্গে লড়াই করে না।"

"খুব সুন্দর বলেছেন!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "যেভাবে আপনি কথাগুলো বলেছেন আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা হলাম এমন জ্ঞানী যারা বাতিলের প্রাচীরকে ভয় করে না। আপনি আমাকে এখানে আসার সুযোগ এ জন্য দিয়েছেন যে, আমি স্বচক্ষে আপনাদের বাহিনী দেখে যেন ভড়কে যাই।"

"ইবনে ওলীদ!" মাহান বলে, "আপনার কী সৈন্যদের স্ত্রী এবং সন্তানদের কথাও মনে পড়ে না যারা আপনাদের সৈন্যদের সঙ্গে আছে? আপনারা কি ভাববেন না যে, আপনারা সকলে মারা গেলে আপনাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা আমাদের মালিকানায় চলে আসবে?"

"মাহান!" হযরত খালিদ (রা.) মুচকি হেসে বলেন, "আমরা সব দিকই ভেবেছি" ... সন্ধি হবে না।"

"ইবনে ওলীদ!" মাহান বলে, "আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, আমি আপনাদের উপর দয়া ও কৃপা করছি? ... আমি আপনাদের সকল সৈন্যকে এবং আপনাদের খলীফাকেও এত বেশি অর্থ প্রদান করব যে, আপনারা তা দেখে অবাক হয়ে যাবেন।"

"দয়াকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা; যার কবজায় আমার এবং আপনার জান"। হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমরা তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য ও দয়া চাই। যদি আপনি চান যে, অযথা রক্তক্ষয় ও প্রাণহানী না হোক, তাহলে আপনি ইসলাম কবুল করুন, যেটা আল্লাহর সত্য ধর্মমত।"

"না" মাহান বড়ই গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়।

"যদি আমাকে, আমার খলীফাকে এবং আমার সৈন্যদের পুরস্কার দিতে চান, তাহলে কর প্রদান করুন" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "কিন্তু কর নিয়ে আমরা চলে যাব না; বরং আপনাকে এবং হিরাকেলের প্রজাদের হেফাজত, তাদের ইজ্জত-আব্রু এবং সকল প্রয়োজন পূরণের জিম্মাদার হব। ... যদি এটাও না মানেন, তাহলে যুদ্ধের ময়দানে আমাদের তলোয়ারের সঙ্গে আপনাদের তলোয়ারের দেখা হবে।"

ঐতিহাসিক ওকীদী, বালাজুরী এবং আবু সাইফ লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) মাহানের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আসেন। মাহান সম্পর্কেও হযরত

খালিদ (রা.) সুধারণা রাখেন। কারণ সে কোনো নীচু পর্যায়ের কথা বলে না বা অসৎ ব্যবহার করে না।

হযরত খালিদ (রা.) ফিরে এসে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে এক তো এটা জানান যে, মাহানের সঙ্গে কোন ধরনের কথাবার্তা হয়। দ্বিতীয়ত এটাও বলেন যে, মাহান অত্যন্ত ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত সর্বাধিনায়ক।

"তারপরও তার মধ্যে একটি দোষ রয়েছে" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "তার বিবেক-বুদ্ধি শয়তানের কব্জায় রয়েছে।"

হযরত খালিদ (রা.) মাহানকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে আসেন যে, সন্ধি হবে না।

✪✪✪

হযরত আবু উবায়দা (রা.) সকল সালারদের ডেকে জানিয়ে দেন যে, শত্রুরা সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেছিল কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যার ফলে যুদ্ধ এখন অনিবার্য হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে সকল মুজাহিদদের এটাও জানিয়ে দেয়া হয় যে, রোমীয়রা আমাদেরকে তাদের সৈন্য এবং সমর শক্তি দ্বারা ভয় দেখিয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত খালিদ (রা.) এবং রোমীয় সালার মাহানের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর যখন উভয় দলের সৈন্যদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং আগামীকালই এক বাহিনী অপর বাহিনীর মুখোমুখী হবে, তখন থেকে উভয় বাহিনীর সৈন্যদের মাঝে হুলস্থুল পড়ে যায়। রোমীয় সেনাক্যাম্পে পাদ্রীরা সেনাদেরকে ক্রুশ দেখিয়ে মাজহাবের নামে উত্তপ্ত করে এবং তাদেরকে ক্রুশ ও ঈসা মাসীহ-এর নামে জীবন দিতে অনুপ্রাণিত করা হয়। পাদ্রীদের কথা এবং তাদের বাচনভঙ্গি এতটা উত্তেজনাকর ছিল যে, সিপাহীরা ক্রুশের দিকে হাত তুলে শপথ করে যে, তারা হয়ত বিজয় অর্জন করবে নতুবা মারা যাবে।

মুসলমানরা ইবাদত এবং দোয়ার জন্য রাতকে নির্বাচন করে। তাদের উত্তপ্ত ও উত্তেজিত করতে গরম বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। যে মহান উদ্দেশ্যে তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় নেমেছে ঐ মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রত্যেক মুজাহিদ অবগত ছিল। তারা ইতিপূর্বেই নিজেদের জীবন আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিয়েছিলেন।

সে দিনেই উভয় বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে এবং নিজ নিজ বাহিনীকে আক্রমণ স্থলে পৌছানোর কাজ শুরু করে দেয়। মাহান তার বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করে এবং তাদেরকে সামনে নিয়ে এসে সারিবদ্ধ করে। তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি

ছিল ১২ মাইল এবং গভীরতা ছিল এত বেশি যে, সারির পর সারি ছিল; যা পর্যায়ক্রমে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল।

রোমীয় বাহিনীকে এই বিন্যাসে দাঁড় করানো হয়েছিল যে, এক পার্শ্ব বাহিনী হিসেবে সালার গিরীগিরীর বাহিনী ছিল। আর অপর পার্শ্ব বাহিনী হিসেবে সালার কনাতীরের বাহিনী ছিল। মধ্য বাহিনীতে সর্বাধিনায়ক মাহানের আর্মেনীয় সৈন্য এবং সালার দীরযানের বাহিনী ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যদের চার ভাগে ভাগ করা হয় এবং তাদেরকে এমন স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় যেখানে তাদের সামনে মুসলিম পদাতিক সৈন্য ছিল। রোমীয়দের কাছে অশ্বারোহী এত বেশি ছিল যে, তারা অশ্বারোহীর পেছনেও অশ্বারোহী দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সালার জাবালা বিন আইহামের অশ্বারোহী এবং উষ্ট্রারোহীদেরকে ১২ মাইল যুদ্ধক্ষেত্রের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়।

মাহান আরেকটি কাজও করে। গিরীগিরীর বাহিনী এক পার্শ্বদেশে ছিল। তাতে বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। এই সকল পদাতিককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এক শিকলে দশ দশজন করে বেঁধে দেয়া হয়। শিকল এত লম্বা ছিল যে, তাতে বাঁধা সিপাহীরা স্বাচ্ছন্দে লড়াই করতে পারে। শৃঙ্খলাবদ্ধ করার এক উদ্দেশ্য এটা ছিল, যেন সিপাহীরা পালাতে না পারে। আর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা আক্রমণ করলে তারা এই প্রলম্বিত শিকলে জড়িয়ে পড়বে। ফলে শিকলে বেঁধে বেঁধে পড়ে যাবে এবং সারি ভেদ করে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের সারিবদ্ধ হওয়া দেখছিলেন। সর্বাধিনায়ক ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.)। তাঁর মাঝে সালার হওয়ার সব ধরনের যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতেন এবং ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতেন। ইয়ারমুক যুদ্ধে তিনি সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব হযরত খালিদ (রা.)-এর উপর অর্পণ করেছিলেন। এ যুদ্ধ এমন ছিল যাতে ঝুঁকি ছিল একশ একশ। দুশমনদের বিশাল শক্তির মোকাবেলায় গতানুগতিক যুদ্ধ ছিল এখানে অর্থহীন। সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাই ভাবছিলেন। তিনি উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ভার অর্পণ করেছিলেন হযরত খালিদ (রা.)-এর উপর।

হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেন, তিনি যেন সকল সালার ও কমান্ডারদের একত্রিত করেন। হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে সারিবদ্ধতা এবং যুদ্ধ বিষয়ক কিছু নির্দেশনা দিতে চান। যেহেতু তিনি

সর্বাধিনায়ক ছিলেন না, তাই সালারদের উপর তার নির্দেশ কার্যকরী ছিল না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সকলকে তলব করেন।

হযরত খালিদ (রা.) তাদের জানান যে, আপনারা শত্রুদের সংখ্যা দেখছেন এবং আপনাদের সংখ্যাও আপনাদের সামনে আছে। অতএব এটা হলো জীবন-মৃত্যুর লড়াই। এরপর হযরত খালিদ (রা.) মুজাহিদেরকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেন। মুসলমানদের ৪০ হাজার সৈন্যের মধ্যে অশ্বারোহী ছিল মাত্র ১০ হাজার। হযরত খালিদ (রা.) ৩০ হাজার পদাতিক সৈন্যকে ৩৬ ভাগে ভাগ করেন। প্রতি ভাগে ৮০০ থেকে ৯০০ সৈন্য পড়ে।

অশ্বারোহীদেরকে তিনি দুইশ দুইশ করে তিন ভাগে ভাগ করেন। এক অংশের কমান্ডার বানান কায়েস বিন হুবায়বাকে। দ্বিতীয় অংশের কমান্ডার হন মুসাররা বিন মাসরুক। আর তৃতীয় অংশের কমান্ডারের দায়িত্ব পড়ে হযরত আমের বিন তুফাইল এর উপর।

মুসলমানদের রণাঙ্গনের পরিধি ছিল ১১ মাইল। অর্থাৎ শত্রুদের থেকে এক মাইল কম। প্রকাশ্য এটাই যে, মুসলমনদের সারিবদ্ধতার কোনো গভীরতাই ছিল না। এক পার্শ্ব দেশে হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) ও অপর পার্শ্বে ছিল হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর বাহিনী। তাদেরকে দুইশত করে অশ্বারোহীর এক একটি দল দেয়া হয়েছিল।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) মধ্যম বাহিনীতে ছিলেন। তিনি সালার হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর বাহিনীকে নিজের সঙ্গে ডান দিকে রাখেন। তাঁর সঙ্গে সালার ইকরিমা বিন আবু জাহল (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন খালিদ (রা.)ও ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) চার হাজার অশ্বারোহীকে নিজের কমান্ডে সামনের সারির পেছনে রেখেছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল উড়ে উড়ে সেখানে পৌঁছা, যেখানে শত্রুপক্ষের চাপ বেশি পড়ে। এ চার হাজার অশ্বারোহীর কাজ ছিল ঘুরে ঘুরে লড়াই করা।

সামনের সারির পদাতিক দলকে লম্বা বর্শা দেয়া হয়েছিল। এসব বর্শার মাথা ছিল তিনধারী ও চারধারী এবং খুব দ্রুততর। পদাতিক দলে তীরন্দায বাহিনী বিশেষভাবে রাখা হয়েছিল। কথা ছিল, রোমীয়দের আক্রমণ প্রথমে বর্শা ও তীর দ্বারা প্রতিহত করা হবে। এরপর তলোয়ার হাতে নিয়ে তার কারিশমা দেখাতে হবে।

তৎযুগের রেওয়াজ অনুযায়ী অনেক মুজাহিদের সঙ্গে তার স্ত্রী, সন্তান এবং অনেকের সঙ্গে বোনরাও ছিল। এসব মহিলা ও বাচ্চাদেরকে সৈন্যদের পেছনে রাখা হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেখানে যান।

"জাতির মেয়েরা!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমরা তোমাদের হেফাজত করব। তবে তোমাদের একটি কাজ করতে হবে। নিজেদের কাছে পাথর জমা কর এবং তাঁবুর লাঠি হাতে রাখবে। যদি কোনো মুসলমান পালিয়ে পেছনে আসে তাহলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারবে। ডাণ্ডা তার মুখে মারবে। পলায়নকারীদের সামনে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দাঁড় করিয়ে দিবে।"

মহিলারা তৎক্ষণাৎ তাঁবু হতে লাঠি বের করে নেয় এবং পাথর জমা করতে শুরু করে।

সৈন্যদের সারিবদ্ধ হওয়া সম্পন্ন হলে হযরত আবু উবায়দা (রা.), হযরত খালিদ (রা.) এবং অন্যান্য সালারগণ এক মাথা হতে অপর মাথা পর্যন্ত যান। তাঁরা মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি করতে থাকেন। তারা হাসতেন, মুচকি হাসি দিতেন এবং কোথাও থেমে গেলে হযরত খালিদ (রা.) কিছু কথা বলে তাদের প্রেরণা চাঙ্গা করে দিতেন। তাঁর কথা এ ধরনের ছিল যে, আল্লাহর পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষার সময় এসে গেছে। আল্লাহর মদদ সে-ই লাভে সমর্থ হয়, যে তার পথে অটল-অবিচল থাকে। দুনিয়া এবং আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদা তাদেরই জোটে, যাদের অন্তরে ঈমানের অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত থাকে এবং যারা কাফেরদের ধারালো তলোয়ারের মোকাবেলা নির্ভয়ে করে।

ঐতিহাসিক তবারী লিখেছেন, সালারগণ একটি দলের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে থাকলে এক মুজাহিদ বলে, "রোমীয়রা কত বেশি আর আমরা কত কম।"

হযরত খালিদ (রা.) তার এ কথা শুনে ঘোড়া থামিয়ে দেন।

"আমার বন্ধু!" হযরত খালিদ (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন, "বল, রোমীয়রা কত অল্প আর আমরা কত বেশি!" কারণ শক্তি সংখ্যার দ্বারা হয় না; বরং শক্তি আল্লাহর মদদের দ্বারা সৃষ্টি হয়। রোমীয়দের সংখ্যা আছে কিন্তু আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ যাদের সঙ্গে থাকেন না তারা বড়ই দুর্বল হয়ে যায়।"

বেশির ভাগ ঐতিহাসিক লিখেছেন, সালার ও কমান্ডারগণ যখন স্বীয় বাহিনীর মাঝে ঘুরছিলেন, তখন তারা এ আয়াতটি উচ্চকণ্ঠে পড়ছিলেন :

"অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আল্লাহর ইচ্ছায় বিরাট বিরাট দলের বিপক্ষে বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যশীল ও যারা অটল-অবিচল থাকে তাদের সঙ্গে থাকেন।"

৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ মোতাবেক ১৫ হিজরীর রজব মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের একটি রাত ছিল। এদিন সারারাত মুজাহিদরা আল্লাহর ইবাদত এবং কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকে। আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের

সাহায্য করার ছিল না। বেশির ভাগ মুজাহিদ সূরা আনফাল তেলাওয়াত করতে থাকে।

এ দিন রোমীয়রাও রাতভর জাগ্রত থাকে। সেখানে পাদ্রীরা সিপাহীদেরকে ইবাদত ও দোয়ায় লিপ্ত রাখে। উভয় পক্ষের তাঁবুতে মশাল জ্বলতে থাকে এবং স্থানে স্থানে স্তুপকৃত কাঠ জ্বলতে থাকে। যাতে রাতে শত্রুরা আক্রমণ করতে এলে তাদের দেখা যায়। উভয় বাহিনীতে হুলস্থুল ও তৎপরতা অব্যাহত ছিল।

✪✪✪

মুসলমানদের অবস্থানস্থল হতে প্রভাতে ফজরের আজান শোনা যায়। মুজাহিদরা ওজু করে এবং বেশির ভাগ তায়াম্মুম করে জামায়াতের সঙ্গে নামায পড়ে। নামায পড়ে প্রত্যেক নিজ নিজ স্থানে চলে যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার উপক্রম ছিল। ইতিহাসে এ যুদ্ধ একটি বিরাট যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত।

এদিন সূর্য দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করলে জমিনে ভয়াবহ একটি দৃশ্য অবলোকন করে। মাত্র ৪০ হাজার সৈন্য দেড় লাখ সৈন্যের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে ছিল। হিরাকেলের সিপাহীরা ছিল শান-শওকতের সঙ্গে। তাদের ঝাণ্ডা পতপত করে আকাশে উড়ছিল এবং অনেক ক্রুশ উপর পানে তোলা ছিল। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, দেড় লাখের বিশাল বাহিনী তাদের সামনে দাঁড়ানো ক্ষুদ্র দলটিকে প্লাবনের ন্যায় ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিবে।

জার্জা নামীয় রোমীয়দের এক সালার ছিল। সে মল্লযুদ্ধে খ্যাত ছিল। তার নামডাক ও প্রসিদ্ধি ছিল সর্বত্র। রোমীয়দের সর্বাধিনায়ক মাহানের নির্দেশে সে মল্লযুদ্ধ লড়তে সামনে অগ্রসর হয়।

"খালিদ বিন ওলীদের মাঝে কী এই হিম্মত আছে যে, সে আমার তলোয়ারের সামনে আসতে পারে?" জার্জা হুংকার দিয়ে বলে, "আমিই রোমীয়দের হত্যাকারী!" হযরত খালিদ (রা.) গর্জন করতে করতে সামনে আসেন "আমিই খালিদ বিন ওলীদ!"

হযরত খালিদ (রা.) উভয় বাহিনীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান। তিনি তরবারী বের করেন কিন্তু জার্জা তলোয়ার বের করে না। সে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় ঘোড়াকে তার ঘোড়ার এত কাছাকাছি নিয়ে যান যে, উভয় ঘোড়ার ঘাড় একত্রিত হয়ে যায়। তারপরেও জার্জা তলোয়ার বের করে না।

ঐতিহাসিক তবারী, ওকীদী, হেনরী স্মিথ এবং আবু ইউসুফ এই ঘটনাটি বিস্তারিত লিখেছেন। হযরত খালিদ (রা.) সালার জার্জার কাছাকাছি এলেও জার্জা তলোয়ার বের করে না।

"ইবনে ওলীদ!" জার্জা বলে, "মিথ্যা বলো না। কারণ, যোদ্ধা কখনও মিথ্যা বলে না। ধোঁকাও দিবে না। কেননা সম্ভ্রান্ত লোকেরা কখনও ধোঁকা দেয় না।"

"হে ইসলামের দুশমন! কী জানতে চাও বলো" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "যোদ্ধা মিথ্যা বলবে না। ধোঁকা দিবে না। বল, কী জানতে চাও?"

"এ কথা কী সত্য যে, তোমার রসূলকে আল্লাহ আসমান থেকে তলোয়ার পাঠিয়েছিলেন?" জার্জা জানতে চায়, "আর সেই তলোয়ার তোমার রসূল তোমাকে প্রদান করেছিলেন? যখন এই তলোয়ার তোমার হাতে থাকে, তখন দুশমন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়?"

"এ তথ্য সত্য নয়" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

"তবে তোমাকে 'সাইফুল্লাহ' বলা হয় কেন?" জার্জা জিজ্ঞাসা করে, "তুমি আল্লাহর তরবারী কীভাবে হলে?"

"সত্য কথা হলো, হে ইসলামের দুশমন!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার তরবারী চালনার নৈপুণ্য দেখে আমাকে বলেন, তুমি আল্লাহর তরবারী। তিনি স্বীয় তরবারী আমাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেছিলেন। এখন তুমিও তরবারী বের কর আর তার স্বাদ আস্বাদন কর।"

"যদি আমি তরবারী বের না করি, তাহলে?"

"তবে বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "মেনে নাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।"

"আমি এটা মানতে অস্বীকার করলে তুমি কী করবে?"

"তাহলে তোমার কাছে কর চাইব" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এবং তোমাকে আমার হেফাজতে নিয়ে নিব।"

"যদি আমি কর দিতে অস্বীকৃতি জানাই?"

"তাহলে তোমার তরবারী বের কর!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এবং প্রথম আক্রমণ তুমি কর, যেন পরে তোমার এই আফসোস না হয় যে, আক্রমণ করার সুযোগ তুমি পাওনি।"

জার্জা কিছুক্ষণ চুপ থাকে এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর মুখপানে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে থাকে।

"যদি কেউ বর্তমানে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার মর্যাদা কেমন হবে?" জার্জা জিজ্ঞাসা করে।

"ঐ সম্মান পাবে, যা প্রত্যেক মুসলমান পেয়ে থাকে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "ইসলামে কোনো ছোট-বড় নেই।"

"আমি তোমার ধর্মের অনুসারী হতে চাই" জার্জা বলে, "আমি ইসলাম কবুল করছি।"

জার্জার কথায় হযরত খালিদ (রা.) বড়ই বিস্মিত হন। এমন প্রস্তাব তাকে অবাক করে দেয়।

"হে রোমীয় সালার! তোমার চিন্তা-চেতনা ঠিক আছে তো?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"হ্যাঁ ইবনে ওলীদ!" জার্জা জবাবে বলে, "আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।"

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর ঘোড়ার মুখ মুসলিম শিবিরমুখী করেন। জার্জাও স্বীয় ঘোড়া হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়ার কাছে নিয়ে যায়। এভাবে তারা মুসলিম শিবিরে গিয়ে পৌঁছে। হযরত খালিদ (রা.) তাকে কলেমা পড়ান এবং জার্জা মুজাহিদদের অন্তর্গত হয়ে যায়।

জার্জার মুসলমান হওয়ার ঘটনায় উভয় শিবির উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মুসলমানরা খুশিতে নারাধ্বনি উচ্চকিত করে আর রোমীয়রা উচ্চকণ্ঠে জার্জাকে গালমন্দ ও তার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকে। কিন্তু তাদের এই আচরণ জার্জার মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসটি ছিল মুসলমানদের জন্য কঠিন পরীক্ষার মাস। ইতিমধ্যে রোমীয়দের এক সালার মুসলমান হয়ে ইসলামের পতাকাতলে চলে এসেছিল। মুসলামানরা এ ঘটনায় সীমাহীন আনন্দিত হলেও তাদের ভাল করে জানা ছিল যে, শত্রুদের একজন সালার এ পক্ষে চলে আসায় রোমীয়দের বিশাল বাহিনীতে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা সৃষ্টি হবে না এবং শত্রুদের লড়াই করার প্রেরণায় তা কোনো প্রভাব ফেলবে না।

মুসলমানরা এই প্রথম বারের মত এত বিশাল ও সুশৃঙ্খল বাহিনীর মুখোমুখী হয়। ইসলামের জন্য এটা ছিল বড়ই চ্যালেঞ্জ, যা ইসলামের সৈনিকরা গ্রহণ করেছিল। মুসলমানরা এক আত্মঘাতী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এবারই ছিল প্রথম ঘটনা যে, মুসলিম নারীরাও পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাদের এই কথা বলেছিলেন যে, তারা যেন ডাণ্ডা হাতে রাখে এবং পাথর জমা করে রাখে। যাতে কোনো মুসলমান পালিয়ে পেছনে এলে তারা তাদের প্রতি পাথর বর্ষণ করবে এবং তাদের মুখে ডাণ্ডা মারবে। কিন্তু মহিলারা নিজ উদ্যোগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছিল। উভয় বাহিনীর সৈনিকরা তাদের সামনেই ছিল।

প্রত্যেক নারীর মাঝেই পুরুষসম জযবা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজনের প্রেরণা ছিল অসাধারণ। একজনের নাম হলো হযরত হিন্দা (রা.)। অপরজন হলেন হযরত খাওলা বিনতে আযওয়ার (রা.)। হিন্দার কথা পূর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উহুদ যুদ্ধে তিনি স্বীয় গোত্রের মনোবল বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধের ময়দানে গীত পরিবেশন করেছিলেন। এই গীত কোনো যুদ্ধ কাহিনীর ছিল না এবং তা নিয়মতান্ত্রিক কোনো রণসংগীতও ছিল না। সেদিনের গীতে তিনি পুরুষদেরকে উত্তেজিত করেছিলেন এবং এই ধরনের কথা বলেছিলেন যে, আজ তোমরা পরাজিত হলে তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদেরকে নিজেদের শরীর স্পর্শ করতে দিবে না। হিন্দার চাচা এই যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)-এর হাতে মারা যায়। ফলে প্রতিশোধ নিতে হিন্দা প্রসিদ্ধ বর্শাধারী ওয়াহশীকে নির্দেশ দেয় এবং এর জন্য তাকে বিরাট পুরস্কার প্রদান করেছিল।

ওয়াহশীর বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। তিনি যুদ্ধের ময়দানে হযরত হামযা (রা.)-কে খুঁজে ফেরেন। এক পর্যায়ে খুঁজে পেয়ে গোপন স্থান হতে তার প্রতি বর্শা ছুড়ে মারেন। বর্শা হযরত হামযা (রা.)-এর পেটে আমূল গেঁথে যায় এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। হিন্দা এ খবর শুনে দৌড়ে যান এবং ওয়াহশী (রা.)-কে বলেন, হামযার লাশের পেট ফেড়ে ফেল। ওয়াহশী (রা.) নির্দেশ পালন করলে হিন্দা হযরত হামযা (রা.)-এর কলিজা বের করে মুখে পুরে চিবিয়ে ফেলে দেন। এর কিছু দিন পরে হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-ও তাঁর স্ত্রী হিন্দা ইসলাম গ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধ গীত পরিবেশন করে তিনি যোদ্ধাদের উত্তেজিত করে তুলেছিলেন, এবার ঠিক সেভাবে রোমকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর এক পুত্র হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান এ যুদ্ধের একজন অন্যতম সালার ছিলেন।

দ্বিতীয় বীরাঙ্গনা মহিলা ছিলেন হযরত খাওলা বিনতে আযওয়ার (রা.)। তিনি হযরত যাররার (রা.)-এর বোন ছিলেন। হযরত যাররার (রা.)-এর আলোচনা অনেকবার পূর্বে হয়েছে। তিনি শিরস্ত্রাণ, বর্ম এমনকি গায়ে জামা খুলে রেখে নাঙ্গা শরীরে লড়তেন। তার অসাধারণ বীরত্বের কারণে হযরত যাররার (রা.) রোমকদের কাছে ভয়ঙ্কর এক যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে ছিলেন। দু'বছর পূর্বে হযরত যাররার (রা.) এক যুদ্ধে রোমীয়দের যুদ্ধ সারির এত ভেতরে চলে গিয়েছিলেন যে, অনেক রোমীয় মিলে তাকে ঘেরাও করে ফেলেছিল এবং তিনি জীবিত ধরা পড়েন। হযরত যাররার (রা.) রোমকদের জন্য বড়ই গুরুত্বপূর্ণ শিকার ছিলেন। কেউ চিন্তাই করেনি যে, রোমকরা তাকে বাগে পেয়ে জিন্দা রাখবে। এটাও কেউ ভাবেনি নি যে, হযরত জাররার (রা.)-

এর বোন খাওলা তার ভাইকে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনবে। পূর্বে বিস্তারিত উল্লেখ্য হয়েছে যে, এক যুদ্ধে খাওলা চেহারায় নেকাব এবং মাথায় পাগড়ী বেঁধে রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) তাকে কাছে ডেকে নিলে তিনি জানতে পারেন যে, এ যোদ্ধা পুরুষ নয়; বরং নারী এবং হযরত যাররার (রা.)-এর বোন।

হযরত যাররার (রা.) গ্রেফতার হওয়ার পর এক খবরে জানা যায় যে, তাঁকে চ্যাংদোলা করে অমুক দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রোমীয়দের সংখ্যা বেশ অনেক ছিল। রাফে বিন উমাইয়াকে একশত অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে হযরত যাররার (রা.)-কে মুক্ত করে আনার নির্দেশ দেয়া হয়। তখন খাওলা (রা.)-ও তাদের পেছনে পেছনে যান। তাঁর যাওয়ার বিষয়টি হযরত খালিদ (রা.)-এর জানা ছিল না। যখন খাওলা (রা.) হযরত রাফে এর বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হন, তখন তিনিও তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু খাওলা বাধা মানেননি। তিনি ভাইয়ের মুক্তির জন্য রোমীয়দের উপর যেভাবে উপর্যুপরী আক্রমণ করেন তাতে পুরুষরা অবাক হয়ে যায়। এভাবে তিনি জীবন বাজি রেখে হযরত যাররার (রা.)-কে পেয়ে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে যে কথা বলেছিলেন তা আজও ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

তিনি সেদিন বলেছিলেন, "আমার প্রিয় ভাইজান! আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা দেখুন। আপনার বিরহে তা দাউ দাউ করে জ্বলছে।"

এবার যখন রোমীয়রা সুউচ্চ পাহাড়ের মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন হযরত হিন্দা (রা.), হযরত খাওলা (রা.)-সহ অন্যান্য মহিলারা শুধু স্ত্রী এবং বোন হিসেবে বসে থাকতে পারেন না। তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে শুধু দোয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন না। হযরত হিন্দা (রা.) এবং হযরত খাওলা (রা.) মহিলাদের শিবিরে পুরুষের মত তৎপরতা চালাতে থাকেন। তারা মহিলাদেরকে লড়াই করতে প্রস্তুত করছিলেন। তারা এ সিদ্ধান্তও নিয়ে রেখেছিলেন যে, যেসব মহিলার বাচ্চা আছে, তারাও নিজ নিজ বাচ্চার মায়া কাটিয়ে রণাঙ্গনে নেমে পড়বে।

✪✪✪

রোমীয় সালার জার্জা হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মল্লযুদ্ধ শুরু হয়। রোমীয়রা তাদের সালার জার্জার অপূর্ণতা এইভাবে পূরণ করে যে, তারা তাদের নির্বাচিত যোদ্ধাদের মল্লযুদ্ধের জন্য মাঠে নামাতে শুরু করে। সাধারণত দু'জনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ হত। কিন্তু তারা মল্লযুদ্ধ শেষ হতে দেয় না। মুসলমানদের পক্ষ হতে যখন কোনো সালার, নায়েবে সালার বা

কমান্ডার সামনে এসে হুংকার দিত, তখন তারা তাদের প্রখ্যাত কোনো যোদ্ধা বা পাহলোয়ানকে সামনে পাঠাত। প্রায় সবকটি মল্লযুদ্ধে রোমীয় যোদ্ধা মারা যায় বা পালিয়ে যায়।

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুর রহমান (রা.) মোকাবেলার জন্য সামনে আসেন।

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ছেলে!" হযরত আব্দুর রহমান (রা.) উভয় বাহিনীর মাঝের খালি স্থানে ঘোড়া ছুটিয়ে হুংকার দিয়ে বলেন, "রোমীয়! আমার পর্যায়ের কোনো সালারকে সামনে পাঠাও।"

ইতিহাস ঐ রোমীয় যোদ্ধার নাম সংরক্ষণ করেনি, যে হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর মোকাবেলায় আসে। সে যেই হোক না কেন, অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।"

"বিশাল এই বাহিনীর মাঝে কি আমার মত কোনো সালার নেই?" হযরত আব্দুর রহমান (রা.) রোমীয়দের প্রতি হুংকার ছুঁড়ে বলেন।

রোমীয়দের কাতার ভেদ করে কালো রংয়ের একটি ঘোড়া বের হয়। ঘোড়াটির উচ্চতা বেশী ছিল না। তার মাথা হতে পা পর্যন্ত অন্যান্য ঘোড়ার তুলনায় লম্বা ছিল। তার উজ্জল দেহ বলিষ্ঠ ছিল এবং অস্বাভাবিক মোটা ছিল। ঘোড়াটি দৌড় শুরু করলে মনে হত জমিন দুলছে। ঘোড়াটি আরোহীর নিয়ন্ত্রণে ছিল কিন্তু তার চালচলন ও আচার-ভঙ্গিতে মনে হত, ঘোড়াটি তার মালিকের নিয়ন্ত্রণে নয়। এ ঘোড়ার আরোহী ছিল গাঢ় কালো রংয়ের এবং তার দেহও ছিল বিশাল। তাকে পাহলোয়ান মনে হচ্ছিল।

"হে দুর্ভাগা যুবক!" রোমীয় সালার হুংকার দিয়ে বলে, "রোম পুত্র আইলামুরের নিক্ষিপ্ত বর্শার মুখে তোমাকে ঘোড়ায় কিছু সময় বসে থাকতে দেখা যাবে?"

"খোদার কসম!" হযরত আব্দুর রহমান (রা.) ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে বলেন, "রোমবাসী এখনও এমন বর্শা বানাতে পারেনি, যা ইবনে আবু বকরকে ঘোড়া হতে ফেলে দিবে।"

আইলামুরের বর্শা তার কালো ঘোড়ার মত দ্রুত গতিতে হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর প্রতি আসছিল। হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর হাতে তলোয়ার ছিল। ঘোড়া একে অপরের কাছাকাছি আসে। এ সময় আইলামুর তার ঘোড়ার রেকাবে পা দিয়ে উঁচু হয়ে শরীরের সব ভর হাতে এনে প্রবল গতিতে হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর প্রতি বর্শা ছুঁড়ে মারে। কিন্তু হযরত আব্দুর

রহমান (রা.) তাঁর ঘোড়াকে সামান্য একদিকে ঘুরিয়ে নেন এবং নিজে ঘোড়ার এক পাশে এত ঝুঁকে যান যে, রোমীয় সালারের আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

হযরত আব্দুর রহমান (রা.) সেখানে থেকে ঘোড়া ঘোরান এবং খুব দ্রুত আইলামুরের পেছনে যান। আইলামুর তখনও নিজের ঘোড়া সোজা করছিল ইত্যবসরে হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর তলোয়ার তার বাহুতে গিয়ে লাগে। এতে আইলামুরের যে হাতে বর্শা ধরা ছিল সে হাত বাহু হতে কেটে নীচে পড়ে যায়। কর্তিত হাতের সঙ্গে ঐ বর্শাও মাটিতে পড়ে যায় যা তার হাতে ধরা ছিল। এ ক্ষত সাধারণ ছিল না। এতে আইলামুর কঁকিয়ে ওঠে। হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর ঘোড়া তাকে কেন্দ্র করে চক্কর দিতে থাকে। আইলামুর কর্তিত হাতওয়ালা বাজু উপরের দিকে উঠায়। সে ঐ বাজু হতে গড়িয়ে পড়া রক্ত দেখছিল ইত্যবসরে হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর তলোয়ার তার বোগলের গভীরে আবার ঢুকে যায়। আইলামুর দ্বিতীয় আঘাত খেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং সে ঘোড়ার মুখ করে নিজ পক্ষের শিবিরের দিকে। কিন্তু ঘোড়া শিবিরে পৌঁছার আগেই পথিমধ্যে তার দেহ ঘোড়ার পিঠ হতে ভূতলে আছড়ে পড়ে। তার কালো ঘোড়া আরোহীকে রাস্তায় ফেলে রেখেই রোমীয় শিবিরে গিয়ে পৌঁছে।

হযরত আব্দুর রহমান (রা.) তৃতীয়বারের মত আবার হুংকার দেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) তাঁকে পেছনে ফিরিয়ে আনেন। কেননা, এটা জরুরী ছিল না যে, প্রতিবার তিনিই জিতে যাবেন। একের পর এক ৬/৭ জন মুসলিম সালার ময়দানে যান এবং মল্লযুদ্ধের জন্য প্রতিপক্ষ আহ্বান করেন। তাদের মোকাবেলায় আসা রোমকরা হয়ত মারা যায় অথবা মারাত্মক আহত হয়ে পালিয়ে যায়।

হযরত আব্দুর রহমান (রা.) কাউকে না জানিয়ে আরেকবার ময়দানে যান এবং রোমীয় প্রতিপক্ষ আহ্বান করেন। এক রোমীয় সালার তাঁর মোকাবেলায় আসে কিন্তু আর ফেরৎ যায় না। এটি ছিল রেমীয়দের তৃতীয় সালার যারা হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর হাতে নিহত হয়। এভাবে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) একাই তিন রোমীয় সালারকে হত্যা করেন। হযরত খালিদ (রা.) এবার অত্যন্ত কঠোরভাবে তাকে আর সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করেন।

✪✪✪

"আর কেউ সামনে যাবে না" রোমীয় সর্বাধিনায়ক মাহান নিষেধ করে এবং তার সঙ্গে থাকা সালারদের বলে, "যদি এই মল্লযুদ্ধের ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে আমাদের কাছে কাজের মত একজন সালারও অবশিষ্ট থাকবে না।

আমাদের কি স্বীকার করা উচিত নয় যে, আমাদের কাছে এমন কোনো সালার কিংবা মানুষ নেই, যারা মল্লযুদ্ধে মুসলমানদের পরাস্ত করতে পারে? যদি আমরা আমাদের সালারদের এভাবে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে থাকি, তাহলে এতে সাধারণ সৈন্যদের মাঝে বিরূপ প্রভাব পড়বে।"

"খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে" এক অভীজ্ঞ সালার বলে, "ময়দানের দিকে তাকান। শুধু আমাদের সালার ও কমান্ডারদের লাশ পড়ে আছে। আর মুসলমানরা আমাদের তীব্র ভর্ৎসনা করছে। আমরা এত সৈন্য কেন এনেছি? কয়েক হাজার মুসলমানকে আমরা আমাদের ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করে ফেলব। তখন তাদের লাশ চেনাও দুরূহ হয়ে যাবে।"

"পুরো বাহিনী নিয়ে আমাদের একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত" সম্মুখ দলের এক সালার মন্তব্য করে।

"না" মাহান বলে, "মুসলমানদের হাতে এত বার পরাস্ত হয়েও তোমরা মুসলমানদের চিনতে পারনি। মুসলমানদের সংখ্যা যত কম হয়, ততই তারা ক্ষিপ্ত ও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আমি প্রথমবার আক্রমণ করব অল্প সৈন্য দ্বারা এবং দেখব তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে কেমন কৌশলের আশ্রয় নেয়।"

অর্ধেক দিন এভাবেই পেরিয়ে যায়। সূর্য মাথার উপর চলে এসেছিল। আগস্টের তীব্র গরম শুরু হয়ে গিয়েছিল। মাহান মুসলমানদের সমপরিমাণ সৈন্য সামনে পাঠিয়েছিল। এটা ছিল তার পুরো সৈন্যের চার ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ প্রায় ৪০ হাজার। এরা সবাই ছিল পদাতিক। যখন ৪০ হাজার সৈন্য রণসঙ্গীতের তালে তালে সামনে অগ্রসর হতে থাকে, তখন মনে হচ্ছিল উত্তাল সমুদ্রের তীব্র উর্মিমালা একের পর এক আছড়ে পড়ছে। আর সে ঢেউ তার সামনের সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

"ইসলামের সৈনিকগণ!" এক মুজাহিদের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়, "আজ তোমাদের পরীক্ষার দিন। আল্লাহ তোমাদের দেখছেন। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

মুসলমানদের সৈন্যসারি হতে নারাধ্বনি গর্জে ওঠে। প্রথম সারিতে লম্বা বর্শা ও তীর হাতে যেসব সৈন্য ছিল তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। একটি করে তীর কামানে চলে যায়। বর্শা উঁচু করা হয়। প্রত্যেক মুজাহিদের মুখে আল্লাহর নাম ছিল। কেউ কেউ কুরআনের আয়াতও তেলাওয়াত করছিল।

রোমীয় পদাতিক সৈন্যরা এগিয়ে এলে ইসলামের তীরন্দায বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে তীর বর্ষণ করা শুরু করে। এতে এগিয়ে আসা রোমকরা পড়ে গেলে পেছনে হতে আরেক দল এসে তাদের মাড়িয়ে সামনে চলে আসে। বর্শা

নিক্ষেপকারীদের কাজ তীরন্দাযরা অনেকটা হাল্কা ও সহজ করে দেয়। রোমীয়রা বর্শা নিক্ষেপকদের থেকে তখনো দূরে ছিল ইত্যবসরে তাদের উপর তীরন্দাযরা তীর নিক্ষেপ করা শুরু করে। রোমীয়রা তীরের আক্রমণ ঢাল দ্বারা প্রতিহত করতে চেষ্টা করছিল। তারপরেও কতক রোমীয় তীরাহত হয়। এতে রোমীয়দের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। আরও সামনে এলে মুসলিম বর্শাধারীরা তাদের চালুনী বানাতে শুরু করে। কিন্তু রোমীয়দের আক্রমণ মুসলমানদের সমস্ত সৈন্যদের উপর ছিল না; বরং ১১ মাইল প্রলম্বিত রণাঙ্গনের অংশ বিশেষ সৈন্যদের উপর ছিল।

স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের প্রতি বিরাট সংখ্যক লোকের আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ ছিল না। রোমীয় পদাতিকরা সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। অথচ তাদের ক্ষয়-ক্ষতি বেশ হচ্ছিল। মুসলিম তীরন্দায ও বর্শানিক্ষেপকারীরা যখন দেখে যে, রোমীয়রা মাথার উপর চলে এসেছে, তখন তারা তরবারী বের করে এবং যুদ্ধ প্রচুর রক্তপাত ও প্রাণহানীর দিকে গড়ায়।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) নিজেদের মাথা ঠিক রাখেন এবং মনোবল শক্ত রাখেন। পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছিল যে, রণাঙ্গনের যেখানে জোরদার হামলা চলছিল সেখানে বাড়তি সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর চেয়ে বড় ঝুঁকি নিতেন। তিনি চাপ সত্ত্বেও রণাঙ্গনের কোনো স্থান হতে সৈন্য প্রত্যাহার করে সে স্থান দুর্বল করাকে ভাল মনে করেন না। মুজাহিদদের জানা ছিল যে, তারা কতজন, তাদের শক্তি কেমন এবং তাদের কাছে কী কী অস্ত্র আছে। সাথে সঙ্গে যা আছে তাই নিয়েই লড়তে হবে। এটা সকলের সামনে ছিল যে, এবারের যুদ্ধ হবে চূড়ান্ত কারী। সুতরাং তারা রসদ ও সাহায্যের আশা অন্তর থেকে বের করে দিয়েছিল। সাহায্যের জন্য তারা কেবল আল্লাহকে ডাকত।

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, রোমীয় সালার সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিচ্ছে ও তৎপরতা চালাচ্ছে। রোমীয় সর্বাধিনায়ক দেখছিল যে, তার পদাতিক বাহিনী প্রচুর নিহত হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না, যার জন্য সে হামলা করিয়েছিল। তারপরেও সে পরাজিত পদাতিকদের সাহায্যে অন্য পদাতিক কিংবা অশ্বারোহীদের পাঠায়।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, মাহানের ধারণা ছিল, মুসলমানরা হামলা প্রতিহত করতে তারা তাদের সমস্ত সৈন্য ব্যবহার করবে। কিন্তু তার এই আশা পূরণ হয় না।

বিপদের মুহূর্তে সাহায্য না পাওয়া এবং নিজেদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির একটি বিরাট খারাপ প্রতিক্রিয়া আক্রমণকারীদের উপর পড়ে। তারা নিজেরাই পিছু হটে আসার আগেই সালার তাদেরকে পেছনে সরিয়ে আনে। এর একটি কারণ এটাও ছিল যে, তখন সূর্য ডুবছিল।

✪✪✪

মুজাহিদ বাহিনী রোমীয় বাহিনীকে তাড়িয়ে পিছু হটিয়ে যখন নিজেদের ক্যাম্পের কাছে ফিরে আসে তখন সেখানে এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাদের স্ত্রীরা তাদের উদ্দেশ্যে দৌড়ে আসে। তারা নিজ নিজ স্বামীকে ডাকছিল। স্বামীরা ফিরে এলে স্ত্রীরা তাদের বুকে টেনে নেয়। আহতদের ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধতে তারা নিজেদের পরিধেয় ওড়না ছিড়ে পট্টি বেঁধে দেয়।

মহিলারা পানির পাত্র সঙ্গে নিয়ে রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। তারা সেসব জখমীদের খুঁজে ফিরতে থাকে, যারা নিজেদের শক্তিতে উঠে দাঁড়াবার যোগ্য ছিল না। মহিলাদের অবস্থা ছিল পাগলের মত। তারা মারাত্মক আহতদের পানি পান করাচ্ছিল, তাদের আহতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করে সেখানে ব্যান্ডেজ বাঁধছিল এবং নিজেদের শরীরে তাদের ভর দিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে আসছিল।

সন্ধ্যা গভীর হলে রণাঙ্গনে মশালের আলো দেখা যায়। মহিলাদের পাশাপাশি মুজাহিদরাও মারাত্মক আহত ও শহীদ সঙ্গীদের খুঁজে ফিরছিল। তাদের মনোবল ছিল তুঙ্গে। তারা বিরাট একটি আক্রমণ রুখে দিয়েছিল। রণাঙ্গনে রোমীয়দের লাশ দেখে তাদের মনোবল ও প্রেরণা অধিক বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের তুলনায় রোমকদের ক্ষয়-ক্ষতি ছিল অনেক বেশি।

অনেক রোমীয় একটি গ্রুপ বা দলের আকৃতিতে মশাল নিয়ে যুদ্ধস্থলে আসে। তারা তাদের নিহত-আহত সঙ্গীদের খুঁজতে এসেছিল। তারা এমনভাবে আসছিল, যেন হামলা করতে আসছে। আহতদের উঠিয়ে নিতে যেসব মুসলমান রণাঙ্গনে ঘুরছিল, তারা তাদের আসতে দেখে তলোয়ার বের করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অযাচিতভাবে আরেকটি সংঘর্ষ ঘটে যায়।

"আমরা আহত সঙ্গীদের নিতে এসেছি" রোমীয়দের পক্ষ হতে উচ্চ আওয়াজ আসে।

"তোমরা নিজেরা আহত না হয়ে অন্য আহতদের নিতে পারবে না" মুজাহিদদের পক্ষ হতে জবাব দেয়া হয়।

দুই-তিন স্থানে এমন গোলযোগ হয় এবং রাত অতিক্রান্ত হতে থাকে। গভীর রাতে রোমীয় সালার মাহান অন্যান্য সালারদের তার সামনে বসিয়ে রেখেছিল।

"নিজেদেরকে ধোঁকায় রেখো না" মাহান বলছিল, "আমরা চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়েছি। কেউ কি বলতে পারে এর কারণ কী?

"আমার মনে হয় আমাদের সৈন্যরা তাদের অন্তরে মুসলিম ভীতি সঞ্চার করে রেখেছে" এক সালার বলে।

"না" মাহান বলে, "আমাদের মধ্যে একতা নেই। মুসলমানরা সবাই এক। তারা যদিও বিভিন্ন গোত্রের লোক কিন্তু তারা সকলেই নিজেকে মুসলমান মনে করে। তারা নিজেদেরকে ইসলামের সৈনিক বানিয়ে নিয়েছে। এই চিন্তা-বিশ্বাস তাদেরকে এক সূতোয় গেঁথে দিয়েছে। আমাদের মাঝে তাদের মত একতা নেই। কয়েকটি এলাকা ও গোত্রের লোক আমাদের সঙ্গে আছে কিন্তু আমাদের মাঝে এমন যোগসূত্র নেই, যা আমাদেরকে একতাবদ্ধ করতে পারে।

"এক রাতেই একতা সৃষ্টি করা যায় না মহামান্য সালার!" এক পুরাতন সালার বলে, "আমাদের মাঝে একতা না থাকার অর্থ তো এই নয় যে, আমরা একে অপরকে পছন্দ করি না। এই অবস্থা মেনে নিয়েই আমাদের লড়তে হবে।"

"হ্যাঁ", মাহান বলে, "এই অবস্থার মধ্য দিয়েই আমাদের লড়াই করতে হবে। আমি নিরাশ নই। আমাদের কৌশল ঠিক করতে হবে। ... কাল প্রত্যুষে তখন আমরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করব, যখন তারা হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকবে না; আর সেটা হবে তাদের ইবাদত করার সময়।"

যেসব ঐতিহাসিক ইয়ারমুক যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিতভাবে প্রদান করেছেন, তাদের প্রায় সকলেই রোমীয় সালার মাহানের পরদিন প্রত্যুষের হামলার পরিকল্পনা এভাবে লিখেছেন যে, ধোঁকা হিসেবে মুসলমানদের সম্মুখ বাহিনীর উপর হামলা করা হবে। এর লক্ষ্য এটা হবে যে, মুসলমানদের মধ্যম বাহিনী, যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও ছিল, তাদেরকে লড়াইয়ে ব্যতিব্যস্ত রেখে এক স্থানে ঠেকিয়ে রাখা হবে। এর থেকে এই লাভ হবে যে, মুসলমানদের কেন্দ্র তাদের ডান-বাম বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য রাখার সুযোগ পাবে না।

মাহানের পরিকল্পনা ছিল, মূল আক্রমণটা হবে মুসলমানদের পার্শ্ব বাহিনীর উপর। যার উদ্দেশ্য ছিল, ডান-বাম বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে খতম করে দেয়া। আর যদি মুসলমানরা জমে মোকাবেলা করে, তাহলে তাদের উপর এত চাপ প্রয়োগ করা হবে যে, তারা মধ্যম বাহিনীর দিকে সরে যাবে। এমতাবস্থায় তাদের উপর ডান-বাম ও পেছন হতে আক্রমণ করা হবে।

পরিকল্পনা ছিল বড়ই ভয়ংকর। রোমকদের সৈন্য এত বেশি ছিল যে, সৈন্যের আধিক্যের কারণে তাদের পরিকল্পনা কার্যকর হওয়া সম্ভব ছিল।

"যাও এবং নিজ নিজ বাহিনীকে প্রত্যুষে হামলা করার জন্য তৈরী কর" মাহান বলে, "তবে প্রস্তুতি এমন নীরবতার সঙ্গে হতে হবে যে, কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়। মুসলমানদের গোয়েন্দারা কিন্তু আমাদের আশেপাশেই রয়েছে।"

রাতে মাহান তার তাঁবু উঠিয়ে ফেলে এবং একটি প্রান্তরের সবচেয়ে উঁচু স্থানে নিয়ে স্থাপন করে। সেখান থেকে পুরো রণাঙ্গন মনিটরিং করা সহজ ছিল। সে নিজের সঙ্গে দ্রুতগ্রামী অশ্বারোহী দূত রেখেছিল এবং নিজের বডিগার্ড বাহিনীও সঙ্গে রেখেছিল। এ বাহিনীর সংখ্যা ছিল দুই হাজার।

✪✪✪

উভয় বাহিনীর মাঝে এক-দেড় মাইলের ব্যবধান ছিল। হযরত খালিদ (রা.) সাধারণ রীতি অনুযায়ী দুশমনদের তৎপরতা দেখতে এবং যথাসময়ে তা জানাতে নিজের পক্ষের লোক সামনে পাঠিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শত্রুদের অবস্থান স্থলের অবস্থা এমন ছিল যে, নিকটে গিয়ে কিছু দেখা সম্ভব ছিল না। উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করত।

মুসলমানরা ফজরের নামায পড়ছিল। এ সময় সামনে থেকে এক লোক দৌড়ে আসে এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে বলে যে, রোমীয়রা প্রস্তুতি নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে আসছে।

"বিন্যাস কেমন?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"হামলার মত বিন্যাস মনে হয়েছে" গোয়েন্দা জবাবে বলে, "প্রথমে রণসংগীত বাজছিল। এরপর তাদের বাহিনী দ্রুত সারিবদ্ধ হয়ে যায়। আরোহীরা তাদের অশ্বে চেপে বসেছে।"

"এটা হতে পারে না যে, রোমীয়রা অন্য কোথাও যাচ্ছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তারা হামলা করার জন্যই আসছে।"

হযরত খালিদ (রা.) কিছুটা উদ্বিগ্ন হন কিন্তু তিনি মনোবল হারাবার মত সালার ছিলেন না। প্রস্তুতি নেয়ার সময় ছিল না। প্রস্তুতি নিতে গেলে ততক্ষণে রোমীয়রা এসে অপ্রস্তুত মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত সকল সালারদের এ খবর জানিয়ে দেন যে, শত্রুরা আক্রমণ করতে আসছে।

মুসলমানরা যখন প্রস্তুতি নিতে থাকে ততক্ষণ রোমীয়রা হামলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে দেয়। তাদের চলার গতি দ্রুততর ছিল। রোমীয় সালারদের ধারণা ছিল, তারা মুসলমানদের তাদের অজান্তে ঘিরে ফেলবে। কিন্তু যখন তারা কাছাকাছি আসে, তখন মুসলমানরা পূর্ণপ্রস্তুত ছিল। তারা অতি দ্রুত

নিজেদেরকে প্রস্তুত করে ফেলেছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে কোনো লম্বা নির্দেশ দেন না। শুধু এতটুকু বলেছিলেন যে, শত্রুরা আক্রমণ করতে আসছে। তোমরা নিজ নিজ স্থানে প্রস্তুত থেকো।

প্রভাতের আলো পরিস্ফুট হচ্ছিল। রোমীয়রা প্লাবনের মত তেড়ে আসছিল। তাদের রুট ছিল মুসলমানদের মধ্য বাহিনীর দিকে। তাদের অনেক বাহিনী ডান-বাম পার্শ্বদেশের দিকে আসছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল তারা মধ্যম বাহিনীর উপরই আক্রমণ করবে।

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর মধ্যম বাহিনীকে এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের অভ্যর্থনা জানানোর নির্দেশ দেন। তিনি প্রতিরোধের ব্যবস্থা এভাবে করেন যে, বর্শা নিক্ষেপকারী ও তীরন্দায বাহিনীকে সর্বাগ্রে রাখেন। রোমীয়রা এই আশায় বড়ই দ্রুত গতিতে আসছিল যে, মুসলমানরা অপ্রস্তুত থাকবে এবং সহজে তারা বিজয় অর্জন করবে। মুসলমানদেরকে সার্বিকভাবে প্রস্তুত দেখে তারা একটু দমে যায় এবং তাদের কদম থমকে যেতে থাকে।

মুসলিম তীরান্দাযগণ এত দ্রুত বেগে তীর মারতে শুরু করে যে, শুন্যে শুধু তীরের ছড়াছড়ি দেখা যায়। তীর বর্ষণের হাত থেকে বাঁচতে রোমীয়রা থেমে গিয়ে পিছু হটতে থাকে। তীরান্দাযদের নাগালের বাইরে তারা চলে যান। কিছুক্ষণ পরে তারা ঢাল আগে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। তীরন্দাযরা আরেকবার তীর বর্ষণ করে। এবার রোমীয়রা থমকে দাঁড়ায় না। তারা অগ্রসর হতে থাকে। তীরাহত হতে ভূতলে পড়তে থাকে। এমনিভাবে তারা মুসলিম বর্শানিক্ষেপকারীদের কাছে চলে আসে। রোমীয়দের নিকট মরার জন্য লোকের অভাব ছিল না।

বর্শানিক্ষেপকারীগণ রোমীয়দের অগ্রাযাত্রা রুখতে প্রাণান্তক প্রয়াস চালায়। কিন্তু রোমীয়দের চাপ এত বেশি ছিল যে, তারা তাদের রুখতে পারে না। তখন মধ্যম বাহিনী সামনে অগ্রসর হয় এবং মুজাহিদরা জীবন বাজি রাখে। হযরত খালিদ (রা.) তাঁদের বাধা দেন।

কিছুক্ষণ পর রোমীয়রা আবার এগিয়ে আসে এবং মুজাহিদরা পূর্বের মতই তাদের হামলা প্রতিহত করে। কিছুক্ষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এরপর রোমীয়রা পেছনে সরে যায়। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত থেকে থেকে এমন লড়াই অব্যাহত থাকে। মুসলমান সালারদের জানা ছিল না যে, মাহানের পরিকল্পনা হলো, মুসলমানদের মধ্যম বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে। যাতে তারা ডান-বাম পার্শ্ব বাহিনীর খবর নিতে না পারে এবং তাদের সাহায্য করতে না পারে।

হযরত খালিদ (রা.) প্রথম দিকে এই ধোঁকা ধরতে না পারলেও তিনি প্রতি হামলা এভাবে প্রতিহত করেন যে, যেন কেন্দ্রীয় শক্তি ও মুসলমানদের

সংঘবদ্ধতা ভেঙ্গে না যায়। রোমীয়রা পেছনে সরে গিয়ে মুসলমান সালারদের জবাবী হামলার সুযোগ দেয়। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) এর উদ্দেশ্য ছিল, যেন রোমীয়দের লোকবল এবং তাদের দৈহিক শক্তি হ্রাস পায়।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.) পার্শ্ব বাহিনীর প্রতি নজর দেন না। তিনি সালারদের বলে রেখেছিলেন যে, তারা যেন মদদের আশা না রাখে। সালারদেরও নিজেদের করুণ অবস্থার কথা জানা ছিল। শুধু সালারদের নয়; বরং এই অনুভূতি প্রত্যেক সৈন্যের ছিল যে, পরিস্থিতি যতই করুণ হোক না কেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যতীত কোনো সাহায্য মিলবে না।

রোমীয়দের মূলত আক্রমণ চলছিল মুসলমানদের পার্শ্ব বাহিনীর উপর। আর এটাই ছিল মাহানের মূল পরিকল্পনা যে, মধ্যম বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত রেখে পার্শ্ব বাহিনীর উপর চরমভাবে হামলা করা হবে। মুসলমানদের ডান বাহিনীর উপর হামলা এভাবে হয় যে, রোমীয়রা সেখানে চরম হামলা করে। ডান বাহিনীর কমান্ড ছিল হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর হাতে। মুজাহিদরা রোমকদের হামলা কেবল প্রতিহতই করে না; বরং শত্রুদের পিছপাও করে দেয়। শত্রুরা প্রথমবার হামলাকারীদের পেছনে রেখে নতুন ও তাজাদম সৈন্য দ্বারা আবার হামলা করায়। দ্বিতীয়বারের আক্রমণ প্রথমবারের তুলনায় মারাত্মক ছিল।

মুসলমানরা দ্বিতীয় হামলাও রুখে দেয়। কিন্তু তাদের দেহ নেতিয়ে পড়ে। তারা ইতিমধ্যে রোমকদেরকে নিজেদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ক্ষতি করে। ফলে রোমীয়রা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে পেছনে সরে আসে। কিন্তু মুসলমানদের শারীরিক অবস্থা এত করুণ হয়ে যায় যে, তারা আর যুদ্ধ করার যোগ্য থাকে না।

রোমীয়রা তৃতীয়বার আক্রমণ চালায় সম্পূর্ণ নতুন বাহিনী দ্বারা। এবারের সৈন্যসংখ্যাও পূর্বের তুলনায় বেশি ছিল। মুসলমানরা জযবার উপর ভর করে হামলা প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু শরীর সঙ্গ দেয় না। জযবারও একটি সীমা থাকে, সেই সীমাও পার হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের কদম উপড়ে যায়। তাদের সারিবিন্যাস ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। বেশির ভাগ সৈন্য এভাবে পিছু হটে যে, একেবারে ক্যাম্পের কাছে গিয়ে পৌঁছে। আর যারা পিছু হটে না তারা মধ্যম বাহিনীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

সালার আমর ইবনুল আস (রা.) পালিয়ে যাবার মত সালার ছিলেন না। তার কাছে সংরক্ষিত সৈন্য ছিল দু'হাজার। তারা সেখানেই বিদ্যমান রোমীয়দের উপর আক্রমণ করেন। তাঁর নেতৃত্বেই এ আক্রমণ হয়।

অশ্বারোহীরা দ্রুত এবং কঠোর আক্রমণ করে এবং রোমীয়দের কিছুটা পেছনে হটিয়ে দেয়। কিন্তু রোমীয়রা তাজাদম নতুন বাহিনী এনে ঐ দুই হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদের হামলা ব্যর্থ করে দেয় এবং এত চাপ সৃষ্টি করে যে, মুসলমানরা তাতে খেই হারিয়ে ফেলে। তারা বিশাল আয়তনের চাপের মুখে পড়ে আটকে যায়। তার পরেও এটা তাদের বড়ই বীরত্বের পরিচয় ছিল যে, তারা রণাঙ্গন হতে জীবিত বেরিয়ে আসতে পারে এবং ক্যাম্পের দিকে চলে যায়।

"যারা শত্রুদেরকে পিঠ দেখাবে তাদের উপর আল্লাহর লানত হোক!" এটা ছিল মুসলিম মহিলাদের আওয়াজ, যারা তাঁবুতে লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মহিলারা রণাঙ্গন ছেড়ে আসা মুসলমানদের উপর লাঞ্ছনা-ভর্ৎসনা এবং ধিক্কার দিচ্ছিল। দু'জন ঐতিহাসিকের মতে, মহিলা কিছু সৈন্যকে ডাণ্ডাও মেরেছিল।

"খোদার কসম! মুসলিম স্বামীরা এমন আত্মমর্যাদাহীন হতে পারে না।"

এমন ছিল স্ত্রীদের আওয়াজ। তারা তাদের স্বামীদের লক্ষ্য করে এভাবে বলছিল। "তোমরা কী আমাদের স্বামী হওয়ার যোগ্য, যারা আমাদেরকে অমুসলিমদের হাত থেকে রক্ষা করতে পার না?"

তৎযুগের আরব রীতি অনুযায়ী কতক মহিলা দফ বাজিয়ে তার তালে তালে গান গাইতে শুরু করে দেয়। গানের কথা কোনো নিয়মিত রণসংগীতের ছিল না। মহিলারা নিজেরাই উপস্থিত গান তৈরী করে এবং গাইতে থাকে।

"হায়! তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ আজ গেল কোথায়?

নিজেদের সুন্দরী রূপসী স্ত্রীদেরকে
ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছ, এ জন্য যে,
যেন কাফেররা তাদের মালিক হয়ে যায়,
তাদের মর্যাদাকে বিনষ্ট করে এবং
তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে।"

মুসলমানদের পিছপা হওয়াটা অন্যায় ছিল না। এত বেশি সৈন্যের হামলা প্রতিরোধ করা তাদের জন্য বেশিক্ষণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) মহিলাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মুসলমানরা রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে এলে তাদের ডাণ্ডা মারবে– এর উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামী ইতিহাসকে 'পিছুটান' শব্দ থেকে পাক-পবিত্র রাখা।

তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। মহিলারা ক্যাম্পে চলে আসা মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মনোবল চাঙ্গা করে দেয়। তাদের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। তারা আবার অস্ত্র হাতে ময়দানে চলে যায়।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) তাদেরকে দ্রুততার সঙ্গে বিন্যস্ত করেন এবং রোমকদের উপর জবাবী হামলা করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

✪✪✪

বাম পার্শ্ব বাহিনীর সালার হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) ছিলেন। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান (রা.) পুত্রের অধীনে লড়ছিলেন। এ বাহিনীর উপরও রোমকরা হামলা চালিয়েছিল। মুসলমানরা তাদের আক্রমণ রুখে দিয়ে পিছপা করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার হামলা রোমীয়দের যে দলটি করে তারা ছিল শিকলবদ্ধ। এক একটি শিকলে দশ জন করে বাঁধা ছিল। শিকল এত লম্বা ছিল যে, সিপাহীরা স্বাচ্ছন্দে লড়তে পারত।

যেহেতু এ দলের সিপাহীরা শিকলবদ্ধ থাকায় একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই তাদের আক্রমণ ততটা তীব্র ছিল না। মুজাহিদরা প্রথম আক্রমণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করেছিল এবং রোমীয়দের পিছু হটাতে মুসলমানদের কয়েক ঘণ্টা যাবত একটানা লড়তে হয়েছিল। এর পরপরই নতুন বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে যায়। আক্রমণকারীদের সংখ্যা তিনগুণ হতেও বেশি ছিল। তাই মুসলমানদের দেহ তাদের প্রেরণার সাথে সঙ্গ দেয় না। তাদের পা টালমাটাল হয়ে যায়। একসময় তারা পিছু হটতে শুরু করে।

মুসলমান মহিলাদের তাঁবু একটু পেছনে ছিল। পলায়নকারীদের মধ্যে সালারের পিতা আবু সুফিয়ানও ছিলেন। তিনি কোনো সাধারণ পর্যায়ের লোক ছিলেন না। গোত্রপতিদের অন্তর্গত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং মুসলমানদের ধ্বংস সাধন ও নিশ্চিহ্ন করতে বড়ই তৎপর ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরেও তিনি পূর্বের মত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তারপরেও তিনি রোমকদের প্লাবনের সামনে দাঁড়াতে পারেন না এবং তিনি মহিলাদের তাঁবুর দিকে পালিয়ে যান।

সেখানেও পলায়নপর সৈনিকদের অভ্যর্থনা মহিলারা ডাণ্ডার মাধ্যমে করে। তাদের মাঝে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। তিনি হযরত আবু সুফিয়ানের দিকে দৌড়ে আসেন এবং ডাণ্ডা তাঁর সামনে পেতে ধরে তাঁর গতিরোধ করেন।

“হে ইবনে হারব!” হিন্দা আবু সুফিয়ানকে বলেন, “তুমি কোন দিকে পালিয়ে এসেছ?” এরপর তিনি আবু সুফিয়ান (রা.)-এর ঘোড়ার মাথায় ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করেন এবং বলেন, “এখান থেকেই ফিরে যাও এবং এমন বীরত্ব

দেখিয়ে যুদ্ধ কর, যেমন ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলে। তাহলে তোমার পূর্বের গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন।"

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) তার স্ত্রীকে চিনতেন। তিনি বড়ই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মহিলা ছিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) তাকে এতটুকু বলারও সাহস করেন না যে, তিনি পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা, তিনি জানতেন, তিনি যদি হিন্দার সামনে কিছু বলতে যান এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, তাহলে হিন্দা ডাণ্ডা দ্বারা মারতে মারতে তাকে বেহুঁশ করে ফেলবে।

অন্যান্য মহিলারা এখানেও ঐ চিত্র প্রদর্শন করেন, যা ডান পার্শ্ব বাহিনীর মুজাহিদদের স্ত্রীরা দেখিয়েছিলেন। স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের লজ্জা দেয় এবং তাদেরকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে যে, তারা সকলে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যায়।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মহিলারা তাদের স্বামীদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত যায়। তাদের মধ্যে একজন মহিলা একটু বেশি আগে গিয়েছিল। তার সামনে এক রোমীয় সৈন্য পড়ে। রোমীয় তাকে এক সাধারণ মহিলা মনে করে। কিন্তু মহিলা রোমীয়কে দেখে তলোয়ার বের করে এবং সেই সেনাকে হত্যা করে ফেলে।

সালার ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) এক স্থানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে খুঁজছিলেন। তিনি দেখেন যে, যেসব মুজাহিদ পালিয়ে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে এসেছে। এতে তার চেহারা খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। ইতিমধ্যে রোমীয়রা পেছনে সরে গিয়েছিল। হযরত ইয়াযিদ (রা.) দ্রুত তার বাহিনীকে সংগঠিত করে নেন এবং জবাবী হামলা চালানোর নির্দেশ দেন।

হিন্দা (রা.) উচ্চ আওয়াজে ঐ গীত গাইতে থাকেন, যা তিনি উহুদের ময়দানে তার গোত্রের লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গেয়েছিলেন। তখন হিন্দা (রা.) মুসলমান ছিলেন না। তার গানের কিছু কথা শিষ্ট ছিল না। গানের কলিগুলো এমন ছিল–

"আমরা তোমাদের জন্য শান্তি ও আরামের মাধ্যম হই। যদি তোমরা আজ শত্রুদের পরাভূত করতে পার তাহলে আমরা তোমাদেরকে বুকে টেনে নিব। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পিছু হটে এসো, তাহলে আমরা তোমাদের থেকে ভিন্ন হয়ে যাব।"

ইয়ারমুক যুদ্ধেও হযরত হিন্দা (রা.) ঐ গীত পরিবেশন করেন।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.)-এর দৃষ্টি পুরো রণাঙ্গনের উপর ছিল। তাঁর জানা ছিল যে, ডান ও বাম বাহিনীর উপর কী অবস্থা যাচ্ছে। তাঁর জানা ছিল যে, তাদের মদদ দরকার। কিন্তু তিনি একান্ত নাজুক অবস্থায় সাহায্য করার কথা ভেবে রেখেছিলেন, এর পূর্বে নয়। তিনি দূত মারফৎ জানতে পেরেছিলেন যে, ডান বাহিনী পিছু হটে গেছে এবং বাম বাহিনীও বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটে যাচ্ছে। হযরত খালিদ (রা.) উভয় বাহিনীর সালার বরাবর বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, তারা যেন জবাবী হামলা করে। চাই সৈন্য যতই কম হোক না কেন।

এক সময় হযরত খালিদ (রা.) জানতে পারেন যে, ডান বাহিনীর সালার জবাবী হামলা শুরু করেছে। হযরত খালিদ (রা.) সংরক্ষিত অশ্বারোহীদের সঙ্গে তৎপর বাহিনীর কিছু অংশকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তারা যেন ডান বাহিনীর উপর আক্রমণরত রোমীয়দের উপর পশ্চাৎ দিক হতে আক্রমণ করে।

ডান বাহিনীর সালার হযরত আমর বিন আস (রা.) জবাবী হামলা করেছিলেন। এটা ছিল ক্লান্ত-শ্রান্ত মুজাহিদদের আক্রমণ, যারা নয়া প্রেরণা ও উদ্যম নিয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা খুবই কম ছিল। তারপরেও হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে তারা জবাবী হামলা করে।

"এবার জীবিত ফিরে যাবে না" এটা ছিল রোমীয়দের হুংকার, "এবার আর পালিয়ে যাবারও সুযোগ পাবে না।"

রোমক বাহিনী তাদের সৈন্যের আধিক্যের ভিত্তিতে এমন দাবি করতেই পারে যে, তারা মোকাবেলায় আসা মুষ্টিমেয় মুসলমানদেরকে জীবিত ফিরে যেতে দিবে না। কিন্তু হঠাৎ তাদের উপর প্রচণ্ড হামলা হয়। আক্রমণকারীরা ছিল অশ্বারোহী। তারা নারাধ্বনি দিতে দিতে এবং গর্জন করতে করতে এসেছিল।

"ইবনুল আস!" অশ্বারোহী বাহিনীর সালার উচ্চস্বরে বলে, "আমরা এসে গেছি। মনোবল মজবুত রাখ।"

অশ্বারোহীদের প্রচণ্ড হামলা মুসলিম বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করে এবং তাদের দেহে নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়। পক্ষান্তরে রোমীয়দের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং তারা চোখে সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করে।

রোমীয়রা এবার দ্বিমুখী হামলার মুখে পড়েছিল। ফলে তারা সহজেই হাল ছেড়ে দেয়। মুসলিম অশ্বারোহীরা ছিল সম্পূর্ণ তাজাদম। এ ছাড়া তারা স্বীয় সঙ্গীদের করুণ দুর্দশা দেখে আরও বেশি জ্বলে উঠেছিল। এটা ছিল প্রতিশোধের আগুন ও বিদ্যুৎ, যা বজ্র হয়ে তাদের উপর মুহুর্মুহু পড়ছিল।

যদি উভয়পক্ষের সৈন্য সমান সমান কিংবা দুশমনদের সংখ্যা অল্প কিছু বেশি হত। তাহলে দুশমনদের অচিন্তনীয় ক্ষতি হত এবং তারা ময়দান ছেড়ে

চলে যেত। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা হিসেবে রোমীয়রা ছিল প্লাবনের মত। মুসলিম অশ্বারোহীদের হামলার প্রতিক্রিয়া তাদের উপর এই হয় যে, তারা অসংখ্য লাশ এবং অগণিত আহতদের ফেলে পিছু হটে যায়। কিন্তু পালায় না; বরং সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের তাঁবুর কাছে ফিরে যায়।

✪✪✪

এদিকে কেন্দ্রীয় অবস্থানের অবস্থা এই ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.) শত্রুর চাল ধরে ফেলেন। রোমীয়রা তখনও মুসলমানদের মধ্যম বাহিনীর সামনে বিদ্যমান ছিল। তার হাল্কাভাবে হামলা করে পেছনে সরে যাচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা.) বুঝতে পারেন যে, শত্রুরা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চায়। যাতে তারা তাদের পার্শ্ব বাহিনীর প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ না পায়। হযরত খালিদ (রা.) ডান-বাম বাহিনী সম্পর্কে খবর পেয়ে তিনি রোমীয় সালার মাহানের পলিসি বেকার করতে নয়া কৌশল অবলম্বন করেন। ইতিমধ্যেই তিনি ডান বাহিনীর সাহায্যার্থে মদদ পাঠিয়েছিলেন। এবার বাম বাহিনীর প্রতি মনোনিবেশ করেন, যেখানে সালার ছিলেন হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)।

"ইবনুল আযওয়ার!" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর রিজার্ভ বাহিনীর সালার হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.)-কে ডেকে বলেন, "তুমি কী দেখেছ শত্রুরা কীভাবে আমাদের পার্শ্ব বাহিনীর উপর প্রবল হয়ে উঠেছে?"

"দেখেছি ইবনুল ওলীদ!" হযরত যাররার (রা.) বলেন, "আমি আপনার নির্দেশের অপেক্ষার্থী। আপনি কী দেখছেন না আমার ঘোড়া কেমন অস্থিরভাবে খুর মারছে?"

"বাম বাহিনীর ওখানে জলদি যাও ইবনুল আযওয়ার!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "অশ্বারোহী বাহিনী নিজের সঙ্গে নিবে এবং ইয়াযিদের সাহায্যে পৌঁছে যাও এবং যে রোমীয়দের সঙ্গে সে যুদ্ধে লিপ্ত তাদের পার্শ্বদেশের উপর হামলা করবে।"

"ইয়াযিদ কোন অবস্থায় আছেন?" হযরত যাররার (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"যে অবস্থা আমাকে জানানো হয়েছে তা কীভাবে বলব তোমাকে!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) যিনি কোনো এক সময় কুরাইশ গোত্রের চোখের তারা ছিলেন তিনিও রণাঙ্গন ছেড়ে গেছেন। ... দ্বিতীয় সংবাদ এই জেনেছি যে, যেসব মুসলমান রণাঙ্গন ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু তোমার ভাল করেই জানা আছে যে, একবার আক্রমণে যাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় তারা কখনও দ্বিতীয় আক্রমণের মুখে দাঁড়াতে পারে না।"

"আল্লাহ আমাদের সকলের মনোবল মজবুত করবেন" হযরত যাররার (রা.) বলেন।

হরত যাররার (রা.) প্রখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। অন্তরে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রেম, মুখে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নাম এবং তাঁর তলোয়ার আল্লাহর নামে চলত। জীবনের মায়া তাঁর ছিল না। তাই হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনি স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনী নিজের সঙ্গে নেন। এই বাহিনী উড়ন্ত ধুলির মধ্যে গায়েব হয়ে যায়।

সময়টা ছিল দ্বিপ্রহরের পর। উত্তাপ শরীর ঝলসে দিচ্ছিল। অশ্ব ঘামে গোসল করছিল। পিপাসায় মুসলিম বাহিনীর মুখ হা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের রূহ পানি নয়; বরং শত্রুর খুনের পিপাসী ছিল।

হযরত যাররার (রা.)-এর বাহিনী উড়ে গিয়ে রণাঙ্গনে পৌঁছে। তারা রোমীয়দের ঐ বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালায়, যারা হযরত ইয়াযিদ (রা.)-এর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই রোমীয়রা শিকলবদ্ধ ছিল। এই প্রথমবারের মত তাদের বোধোদয় হয় যে, শিকলবদ্ধতা ক্ষতিও করে।

প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোমীয়রা দশজন করে এক একটি শিকলে বাঁধা ছিল। তারা যখন হামলা করে, তখন শিকলে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের হামলায় ততটা গতি ছিল না। এবার হযরত যাররার (রা.) আক্রমণ করলে তারা পিছু হটতে থাকে। মুসলমানদের তলোয়ার এবং বর্শা হতে আত্মরক্ষার্থে তাদের দ্রুত পেছনে সরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শিকল তাদেরকে দ্রুত পেছনে সরে আসার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত যাররার (রা.)-এর অশ্বারোহীদের হামলা বড়ই অতর্কিত ও জোরদার ছিল। হযরত যাররার (রা.) অত্যন্ত বিজ্ঞ সালার ছিলেন। সালারের পাশাপাশি তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অন্যতম লড়াকুও ছিলেন। তার বীরত্বের অবস্থা এই ছিল যে, তিনি অনায়াসে শত্রুদের কাতার চিরে ভেতরে ঢুকে যেতেন। এ যুদ্ধেও তিনি এমন বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি চুপিচুপি রোমীয়দের সালারকে খুঁজছিলেন।

এক সময় তিনি রোমীয় সালারের দেখা পেয়ে যান। সালারের নাম ছিল দেরযান। তার চারপাশে বডিগার্ড বাহিনীর প্রাচীর ছিল। সেখানে রোমীয়দের কেন্দ্রীয় ঝাণ্ডাও ছিল। হযরত যাররার (রা.) যদি তাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানাতেন, তাহলে আগে তাকে তার বডিগার্ড বাহিনীর মোকাবেলা করতে হত, যা একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। হযরত যাররার (রা.) বডিগার্ড বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে সালার দেরযানের কাছাকাছি পৌঁছে যান এবং তলোয়ার দ্বারা এমন একটি কোপ দেন যে, একই আঘাতে দেরযানের মাথা প্রায় কেটে যায়।

দেরযানের বডিগার্ড বাহিনী হযরত যাররার (রা.)-কে ঘিরে নেয়ার পূর্বেই তিনি সেখান থেকে নিরাপদে গায়েব হয়ে যান। সালার মারাত্মক আহত হওয়ায় বডিগার্ড বাহিনীতে হুলস্থুল পড়ে যায়। তাদের সালার ঘোড়া হতে নীচে ঝুলে যায়। দুই বডিগার্ড তার পড়ন্ত দেহ ধরে ফেলে এবং ঘোড়ার পিঠ হতে পড়তে দেয় না। কিন্তু ততক্ষণে তার জীবন পাখি উড়াল দেয়ার পর্যায়ে এসে গিয়েছিল। মৃত্যুক্ষণ বাকী ছিল মাত্র। সালার জবাইকৃত ছাগলের মত ছটফট করছিল। তাকে ধরে পেছনে সরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয় কিন্তু ইতিমধ্যে তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

সালার দেরযানকে হত্যা করে হযরত যাররার (রা.) এক ভয়ঙ্কর রণমূর্তি ধারণ করেন। রোমীয়দের পক্ষে হযরত যাররার (রা.)-এর হামলা মোকাবেলা করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে হযরত খালিদ (রা.) এই পার্শ্ব বাহিনীর ঐ অংশে আক্রমণ করেন, যেখানে রোমীয়দের আরেক সালার গিরীগিরী ছিল। একদিকে হযরত যাররার (রা.) এবং অপরদিকে হযরত খালিদ (রা.)-এর আক্রমণ রোমীয়দের কোণঠাসা করে ফেলে। বেশি ক্ষতি সেসব সৈন্যদের হয় যারা পরস্পর শিকলবদ্ধ ছিল। কারণ, তাদের পক্ষে দ্রুত পেছনে সরে আসা সম্ভব হয় না।

এই জবাবী হামলার প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, রোমীয়রা পিছু হটে যায়। কিন্তু এটা পলায়ন ছিল না। তারা সরে নিজেদের তাঁবু পর্যন্ত গিয়েছিল। তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল অনেক কিন্তু তাদের কাছে সৈন্যের কোনো ঘাটতি ছিল না। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীতে এই প্রতিক্রিয়া হয় যে, তাদের মনোবল এবং লড়াই করার প্রেরণা পূর্ববৎ হয়ে যায় এবং তাদের মাঝে এই অনুভূতি জাগে যে, এত বিশাল বাহিনীকে যখন পেছনে হটিয়ে দেয়া সম্ভব তখন তাদের পরাজিত করাও সম্ভব।

সেদিন যুদ্ধ আর বেশিদূর অগ্রসর হয় না। কেননা সূর্য ইতিমধ্যে অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল।

সে রাতটি ছিল জাগ্রত থাকার রাত। মুসলিম মহিলারা ময়দানে নেমে সরাসরি যুদ্ধ করার জন্য বড়ই অস্থির হয়ে পড়ছিল। কিন্তু তাদের জিম্মায় আরেকটি কাজ ছিল। আর তা হলো, যুদ্ধরত সৈন্যদের পানি সরবরাহ করা ও প্রস্তুত করা। এর চেয়েও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, আহত সৈন্যদের সেবা করা ও তাদের ক্ষতস্থলে প্রলেপ দেয়া। মেয়েরা আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করত এবং সেখানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিত। এ কাজে তাদের মাঝে যে একনিষ্ঠতা ও অমায়িকতা ছিল তা আহতদের মনোবল আরও বাড়িয়ে দিত। আহতদের যারা সামনের দিন লড়াই করার যোগ্য ছিল না তারাও মহিলাদের সেবা ও আন্তরিকতায় যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত।

মুজাহিদরা রাতভর সঙ্গীদের লাশ খুঁজতে থাকে এবং তাদেরকে তাঁবুতে আনতে থাকে। কতক আহত সৈন্য বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। তারা তাদেরও খুঁজে খুঁজে তাঁবুতে আনতে থাকে।

ওদিকে মাহান তার সালারদের তলব করে তার সামনে বসিয়ে রেখেছিল।

"আমি সম্রাট হিরাকেলকে কী জবাব দিব?" সে ক্ষোভের সঙ্গে বলে, "কয়েক হাজার মুসলমানকে আমরা ঘোড়ার পদতলে কেন পিষ্ট করতে পারছি না?"

কোনো সালার তাকে সান্ত্বনামূলক জবাব দিতে পারে না।

"আমাদের একজন সালারও নিহত হয়েছে" মাহান বলে, "তোমরা তাদের কোনো সালারকে হত্যা করতে পেরেছ?"

তার সকল সালার নীরব ছিল।

"কাওরীন!" সে তার এক সালারকে ডেকে বলে, "তুমি সালার দেরযানের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং মনে রাখবে, পিছু হটলে তোমার জিন্দা মুখ আমাকে দেখাবে না। অন্য কোথাও মরে যাবে।" মাহান তার সকল সালারদের উদ্দেশ্যে বলে, "কালকে সূর্যাস্তের সঙ্গে মুসলমানদের সূর্যও অস্তমিত হয়ে যাবে ... সর্বদার জন্য।"

মাহান আগামীকাল মুসলমানদের নিঃশেষ করার জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সালারদের তা বুঝিয়ে দেয়। মৃত সালার দেরযানের স্থলে সে কাওরীনকে নয়া সালার হিসেবে নিয়োগ দেয়।

মুসলমান সালারগণও রাত জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করেন। আহতদের সেবা করেন এবং মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি করেন।

পরের দিনের যুদ্ধ পূর্বের দিনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি কঠিন ও রক্তক্ষয়ী হয়। মুসলমানদের ডান বাহিনীর সালার ছিলেন হযরত আমর বিন আস (রা.) তাঁর সঙ্গে আরেক সালার ছিলেন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.)-এর বাহিনীও। রোমীয়রা সেখানে হামলা চালায় যেখানে উভয় বাহিনী একত্রিত ছিল। উভয় সালার সম্মিলিতভাবে রোমীয়দের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করে তাদেরকে পিছপা করে দেয়।

রোমীয়রা যুদ্ধের পূর্বের রীতি অনুসরণ করে। নতুন বাহিনী দ্বারা তারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে। এভাবে তারা বারংবার নতুন বাহিনী সামনে আনতে থাকে এবং মুসলমানরা প্রত্যেক হামলা প্রতিহত করতে থাকে। তারা সৈন্যবিন্যাস ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখে। কিন্তু তাদের দৈহিক শক্তি লোপ পেতে থাকে। রোমীয়দের উদ্দেশ্যও ছিল এটা যে, মুসলমানদের উপর বারবার

আক্রমণ করে তাদের ক্লান্ত-শ্রান্ত করে ফেলা, যাতে হামলা প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের না থাকে।

দুপুর বেলায় যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে, তখন রোমীয়রা বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মারাত্মক হামলা করে। মুসলমানরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও এবার জোরদার মোকাবেলা করতে পারে না। হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর পুরো বাহিনী এবং হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর অর্ধেক সৈন্য পিছু হটে যায়। এ দিনও তেমন হয়, যেমন গতকাল হয়েছিল। পলায়নকারীদের গতিরোধ করে মহিলারা। তাদেরকে লাঠি দেখায়। উপহাসও করে। আত্মমর্যাদাবোধ চাঙ্গা করে এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে।

এক ঐতিহাসিক একটি তথ্য লিখেছেন। তা হলো, একজন মুজাহিদ রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসে এবং মহিলাদের কাছে এসে জমিনে পড়ে যায়। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলছিল। মুখ 'হা' হয়ে গিয়েছিল। এক মহিলা দৌড়ে তার কাছে আসে এবং তার শিয়রে এসে বসে পড়ে।

"তুমি আহত?" মহিলা জিজ্ঞাসা করে।

লোকটি কথা বলতে পারছিল না। সে মাথা দ্বারা ইশারা করে জানায় যে, সে আহত নয়।

"তবে তুমি পালিয়ে এসেছ কেন?" মহিলা জিজ্ঞাসা করে, "তোমার কাছে কি তলোয়ার ছিল না?"

মুজাহিদ তলোয়ারের খাপ হতে তলোয়ার বের করে, যার আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পুরোটাই রক্তরঞ্জিত ছিল।

"তোমার দেহে কি অন্তর ছিল না যে, তুমি পালিয়ে চলে এসেছ?" মহিলা জানতে চায়।

মুজাহিদ শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয় এবং কথা বলতে পারে না।

"তোমার স্ত্রী এখানে আছে?"

লোকটি নেতিবাচক জবাব দেয়।

"বোন আছে?" মহিলা জিজ্ঞাসা করে "মা?"

"কেউ নেই" লোকটি অতি কষ্টে বলে।

এসব মহিলা কি তোমার মাতা ও বোন নয়?" মহিলা বলে, "তুমি কি এটা সহ্য করবে যে, কাফেররা তাদের এখান থেকে ধরে নিয়ে যাক?"

"না" মুজাহিদ জোরালো কণ্ঠে বলে।

"তুমি কি আল্লাহর রাস্তায় তোমার জীবন কুরবানী করবে না?"

"অবশ্যই করব" মুজাহিদ জবাব দেয়।

"তবে এখানে এসে ভূমিশয্যা নিলে কেন?" মহিলা বলে।

"ক্লান্তিতে শেষ হয়ে গেছি" মুজাহিদ বলে।

"ধর আমার হাত!" মহিলা বলে, "আমি তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। উঠতে না চাইলে তোমার তলোয়ার আমার হাতে তুলে দাও। তোমার স্থানে তোমার বোন লড়বে।"

মুজাহিদ নিজেই উঠে দাঁড়ায় এবং সোজা ময়দানে চলে যায়।

"ভাই!" মহিলা বলে, "আল্লাহ তোমাকে বিজয়ীবেশে ফিরিয়ে আনুক।"

মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ কাপুরুষতা ছিল না। তারা বীরত্বের সঙ্গেই সামনে এগিয়ে এগিয়ে লড়ছিল। বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের লড়তে যাওয়াটাই ছিল এক বিরাট ব্যাপার। রোমীয়দের পরাজিত করার স্বপ্নটি হয়ে উঠছিল সুদূর পরাহত। মুসলমানদের বারবার পিছু হটা কোনো ভাল লক্ষণ ছিল না। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) পরাজয় স্বীকার করার মত সালার ছিলেন না। অন্যান্য সালারগণও বিজয়ের প্রশ্নে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পিছু হটে যাওয়া সৈন্যদের সালার গুছিয়ে এক স্থানে জমা করছিলেন। হযরত খালিদ (রা.)-ও উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটছিলেন এবং দূতদের এগার মাইল লম্বা রণাঙ্গনের বিভিন্ন সালারদের বরাবর নির্দেশনা পৌঁছানোর জন্য পাঠাচ্ছিলেন। এক মহিলা একবার তাঁর গতিরোধ করে।

"ইবনে ওলীদ!" মহিলা বলে, "খোদার কসম! আরব আপনার চেয়ে অধিক বীর ও জ্ঞানী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কাউকে জন্ম দেয় নি। আপনি আমার একটি কথা ভাববেন কী? ... সালাররা আগে আগে থাকলে সৈন্যরা তাদের পেছনে থেকে জান কুরবান করে। আর সালার মনে মনে পরাজয় বরণ করে নিলে সৈনিকরা দ্রুতই পরাজিত হয়ে যায়।"

"আমার বোন!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমাদের জন্য দোয়া কর। তোমাদের কানে এই খবর পৌঁছবে না যে, ইসলামের সালারগণ রোমীয়দের হাতে পরাজিত হয়েছে।"

ঐ মহিলা হযরত খালিদ (রা.)-কে এমন কোনো পরামর্শ দেয় না যা তার জন্য নতুন ছিল। কারণ হযরত খালিদ (রা.) তো বরাবরই সিপাহীদের সামনে থাকা সালার ছিলেন কিন্তু তারপরেও হযরত খালিদ (রা.) ঐ মহিলার কথায় প্রভাবিত হন। মহিলাদের প্রেরণা প্রতি যুদ্ধেই উদ্দীপ্ত হত কিন্তু ইয়ারমুক যুদ্ধে মহিলাদের প্রেরণা কিছুটা অন্য রকম ছিল। তারা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে ছিল। এটা বাস্তব সত্য যে, ইয়ারমুক যুদ্ধে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা মুজাহিদদের দেহ এবং প্রেরণা চাঙ্গা করে রেখেছিল। তাদেরকে নতুন স্পন্দন যুগিয়েছিল।

এর পরেই হযরত খালিদ (রা.) ঐ অশ্বারোহী বাহিনী সঙ্গে নেন, যাদেরকে তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এ বাহিনীকে তিনি বিশেষ ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তারা স্থান ও পন্থা পরিবর্তন করে লড়াই করার বিশেষ যোগ্যতা রাখত। এ বাহিনী সালার কনাতীরের অধীনে থাকা রোমীয় বাহিনীর উপর হামলা করে। তারা ডান বাহিনীর উপর হামলা করেছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে সালার হযরত আমর বিন আস (রা.) ঐ দলেরই বাম পার্শ্বে আঘাত করেন। তাঁর সঙ্গে হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর বাহিনীও ছিল। এ দলটি ছিল পদাতিক।

রোমীয়রা বড়ই দুর্দান্তভাবে এই উভয়মুখী হামলা প্রতিহত করে। তারা ক্লান্ত বাহিনী পেছনে সরিয়ে এনে সামনে তাজাদম সৈন্য এগিয়ে দিচ্ছিল। ক্লান্ত অবসন্ন মুজাহিদরা যেন কসম করেছিল যে, তারা পিছু হটবে না। এই যুদ্ধে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের প্রাণহানী হয়। শাহাদত বরণকারীদের সংখ্যা কয়েকশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা রোমকদের পরাজিত না করতে পারলেও এই সফলতা অবশ্যই অর্জন করে যে, রোমীয়দেরকে তাদের রণাঙ্গন পর্যন্ত পিছু হটিয়ে দেয়। এর সাথে সাথে সে দিনের সূর্যও রণাঙ্গনের রক্ত-মাটি মেখে অস্ত চলে যায়।

✪✪✪

সেদিনের যুদ্ধ বিগত দিনে তুলনায় কঠোর, তীব্র ও রক্তক্ষয়ী হয়েছিল। এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ যাতে মুসলমানরা শুধু একদিনেই অগণিত শহীদ হয় এবং আহতদের সংখ্যার কোনো হিসাব ছিল না। ইতিহাসে সঠিক সংখ্যা লিখিত হয়নি। তবে রোমীয়দের প্রাণহানী মুসলমানদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ছিল।

যুদ্ধের প্রেরণা এবং মনোবলের অবস্থা এই ছিল যে, মুসলমানরা এক একজন একশজনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অথচ তাদের সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল এবং তাদের সাহায্য লাভের কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। তাদের মনোবল এ কারণে বেড়ে যায় যে, তারা যুদ্ধে পিছপা হয়নি; বরং উল্টো তারাই রোমীয়দের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

রোমীয়দের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, তাদের ধারণা ছিল বিশাল রোমক বাহিনীর সামনে মুসলমানরা প্রথম দিনেই খড়কুটোর মত ভেসে যাবে এবং মুসলমানদের সালার খালিদকে তারা জীবিত গ্রেফতার করে ফেলবে। কিন্তু যুদ্ধের তৃতীয় দিন গত হয়েছিল। মুসলমানরা বেশির থেকে বেশি পিছু হটে যাচ্ছিল। তবে আবার ফিরে এসে হামলা করছিল। তারা কিছুতেই হার মানছিল না।

রোমীয়দের সর্বাধিনায়কের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে আজ রাতে আবার সালারদের জড়ো করে এবং তাদের উপর ক্ষোভ ঝাড়ে। সে তাদের কাছে জানতে চায় যে, কোন কারণে তারা এখনও মুসলমানদের পরাস্ত করতে পারছে না। সালাররা প্রত্যুত্তরে একেক জন একে যুক্তি ও কারণ দেখায়। কিন্তু এসব যুক্তি ও কারণ শুনে সেনাপতি মাহানের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। পরিশেষে রোমীয় সালাররা সম্মিলিতভাবে শপথ করে যে, তারা পরের দিন মুসলমানদের পরাজিত করে তবেই ফিরবে।

গতকালের রাতের মত আজ রাতেও হযরত খালিদ (রা.) ও হযরত আবু উবায়দা (রা.) সৈন্যদের মাঝে পায়চারি করতে থাকেন। হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন যে, যেসব আহত সৈন্যরা চলাচলের উপযোগী হয়েছে তারাও আগামীকাল যুদ্ধে শামিল হবে।

মহিলারা আহদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতে থাকে। রাতের শেষ প্রহরে মহিলারা একত্রিত হয়। উক্ত সমাবেশে হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দা এবং হযরত যাররার (রা.)-এর বোন মহিলাদের জানান যে, আগামী কাল চূড়ান্ত ফলাফলের দিন হবে।

"... আর আমাদের পুরুষদের শারীরিক অবস্থাও আমাদের সামনে রয়েছে" হিন্দা (রা.) বলেন, "আমি আমাদের পরাজয়ের আশঙ্কা করছি এবং এটাও নিশ্চিত যে, কোথাও হতে সাহায্য আসবে না। তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আজকের যুদ্ধে মহিলাদেরও অংশগ্রহণ করার।"

"পুরুষরা কি আমাদেরকে তাদের সারিতে স্থান দিবে?" এক মহিলা জানতে চায়।

"আমরা পুরুষদের থেকে অনুমতি চাইব না" হযরত হিন্দা (রা.) বলেন, "তারা অনুমতি দিবে না। ... আপনারা কি লড়াই করতে প্রস্তুত আছেন?"

সকল মহিলা স্বতস্ফুর্তভাবে জানায় যে, আগামীকাল তারা পুরুষদের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।

পরের দিনের জন্য রোমীয়রা যুদ্ধের যে পরিকল্পনা নেয় তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। মুসলিম মহিলারা হাতে তলোয়ার তুলে নেয়। আগামীকালের যুদ্ধে অংশ নিতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

✪✪✪

রক্ত ও মাটি মাখা রাতের উদর হতে আরেকটি প্রভাতের অভ্যুদয় হয়। এটা ছিল ইসলামী ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর ও রোমহর্ষক যুদ্ধের চতুর্থ দিন। মুসলমানরা ফজরে নামায আদায় করলে হযরত খালিদ (রা.) উঠে দাঁড়ান।

"হে মুমিন জাতি!" হযরত খালিদ (রা.) মুজাহিদদের উদ্দেশে বলে, "আপনারা দিনের বেলা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে এবং রাতের বেলা আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর নন। আল্লাহ দেখছেন যে, আপনারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ আপনাদের ব্যাপারে নিরাশ নন। আপনারা তাঁর দয়া-মায়া হতে নিরাশ হবেন না। আমরা আল্লাহর জন্য লড়াই করছি। ... আজকের দিনে মনোবল দৃঢ় রাখবেন। আজ ইসলামের ভাগ্যের ফায়সালা হবে। যেন এমনটি না হয় যে, আমরা আল্লাহ, রসূল ও আমাদের শাহাদত বরণকারী ভাইদের সামনে লজ্জিত হব, যারা আমাদের সঙ্গে এক সময় ছিল অতঃপর আমরা তাদের রক্তাক্ত দেহ নিজ হাতে জমিনে দাফন করে দিয়েছি। আপনারা কি তাদের এতিম সন্তান এবং বিধবা স্ত্রীদের এবং তাদের বোন ও মাতাদের জন্য লড়াই করবেন না? অস্ত্র ধরবেন না?"

"নিশ্চয় ইবনে ওলীদ!" মুজাহিদরা জোরালো কণ্ঠে বলে, "আমরা লড়াই করব।"

"শহীদদের রক্তের প্রতিটা ফোঁটার প্রতিশোধ নিব।"

"আজ লড়ব। কাল লড়ব। এভাবে যতদিন জীবিত থাকব, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে জীবন পার করব।"

এমনিভাবে মুজাহিদরা হযরত খালিদ (রা.)-এর কথার জবাবে স্বতস্ফুর্তভাবে 'লাব্বাইক' বলে। তবে তাদের আওয়াজে ঐ প্রাণ ছিল না, যা থাকার কথা ছিল। তাদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা মজবুত ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর এই বার্তা সারা রণাঙ্গনে পৌঁছানো হয়। প্রত্যেক সালারের মুখে এই কথা ছিল, "আজকের দিন মনোবল হারিও না; মাত্র আজকের দিনটা।"

ওদিকে রোমীয় বাহিনীর সালাররাও এ নির্দেশ পেয়েছিল, "আজ মুসলমানদের নিপাত করে দাও।"

প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই রোমীয় বাহিনীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাদের গতি এবং পরিকল্পনা ছিল আগের দিনের মতই। তারা এসে মুসলমানদের ডান বাহিনী সালার হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর বাহিনীর উপরে হামলা করে। আক্রমণকারীরা ছিল আর্মেনীয় সৈন্য, যাদের সালার ছিল কনাতীর। হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর বাহিনীতে সালার হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর বাহিনীও ছিল। তাদের উপর আর্মেনীয় সৈন্যরা আক্রমণ করে এবং তাদের সাহায্যের জন্য ঈসায়ী বাহিনীও সঙ্গে ছিল।

হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর জন্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে যায়। তিনি দীর্ঘক্ষণ সামনে টিকতে পারেন না। হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর

সৈন্যরা শৃঙ্খলা এবং বিন্যাসচ্যুত হয়ে যায়। তারা আক্রমণকারীদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মূলত পিছু হটছিল। কিন্তু তারা পিছু হটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা যুদ্ধ সারি ভেঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে লড়াই শুরু করে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) সালার হতে সিপাহী হয়ে যান। তিনি ছিলেন তলোয়ারের রাজা। একা তার তলোয়ার অনেকে আর্মেনীয় সৈন্যকে রক্তের সাগরে স্নান করিয়ে দেয়। তাঁর বাহিনীর প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে লড়ছিল। তাদের উপর সালারের কোন কমান্ড ছিল না। যুদ্ধের চাপে কমান্ড ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। মুজাহিদরা শত্রু বাহিনীর বিন্যাসও লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

রোমীয়দের সমমনা আর্মেনীয় সৈন্যরা এ ধরনের যুদ্ধের তীব্রতা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তারা পিছপাও হচ্ছিল না। এর এক কারণ এই ছিল যে, তাদের পশ্চাতে ঈসায়ী তাজাদম সৈন্যের পাহাড় মজবুতভাবে ছিল। তারা আর্মেনীয় সৈন্যদের পেছনে সরে আসতে দিচ্ছিল না। দ্বিতীয় কারণ ছিল, তাদের সালারের পক্ষ হতে পিছু হটার অনুমতি মিলছিল না। আর তৃতীয় কারণ হলো, মুসলমানরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদেরকে যুদ্ধ হতে বের হওয়ার ফুরসৎ দিচ্ছিল না।

হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর বাহিনীর অবস্থাও ভাল ছিল না। শত্রুরা তাদের অনেক দূর পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছিল। মুজাহিদরা প্রাণপণ লড়াই করে, কিন্তু শত্রুদের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করা তাদের সাধ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.) উদ্ভূত পরিস্থিতি দেখে তা উত্তরণের জন্য এই কৌশল গ্রহণ করেন যে, তিনি হযরত আমর বিন আস (রা.) এবং হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর উপর আক্রমণকারী আর্মেনীয় সৈন্যদের উপর পার্শ্বদেশ হতে আক্রমণ করতে চান এবং তাদের সাহায্যে আসা বাহিনীর রাস্তাও বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দূত তলব করেন।

"আবু উবাইদা এবং ইয়াযিদকে বলো, তারা যেন সামনে অগ্রসর হয়ে রোমীয়দের উপর হামলা করে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এবং তাদের এটাও বলবে যে, শত্রুদের ঐ বাহিনীকেও আটকে রাখবে যাতে তারা আমাদের ডান পার্শ্বদেশে না যেতে পারে। ... তাদের আরও জানাবে যে, অশ্বারোহী দলও তাদের সঙ্গে হামলা করবে।"

দূত ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর কাছে গিয়ে পৌছে। বার্তা পাওয়া মাত্রই উভয় সালার তাদের সামনে থাকা রোমীয় বাহিনীর উপর চড়াও হন।

হযরত খালিদ (রা.) তার বিশেষ বাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করেন। এক অংশের কমান্ডার বানান কায়েস বিন হুবায়রাকে। আর দ্বিতীয় অংশটি নিজের কমান্ডেই রাখেন। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর ডান পার্শ্ব বাহিনীর পেছন কেটে সামনে চলে যান এবং সেদিক দিয়ে আর্মেনীয় সৈন্যদের উপর আক্রমণ করেন।

তাঁর নির্দেশে কায়েস বিন হুবায়রার অশ্বারোহী দলটি আর্মেনীয় সৈন্যদের উপর অপর পার্শ্ব হতে আক্রমণ করে। হযরত শুরাহবীল (রা.) সামনের দিক থেকে আক্রমণ করেন।

এটা ত্রিমুখী হামলা ছিল, যা আর্মেনীয় সৈন্যদের জন্য 'কেয়ামতসম' প্রমাণিত হয়। ঈসায়ীরা তাদের সাহায্যে আসে কিন্তু অগণিত লাশ, ছটফট করা আহত সৈন্য এবং লাগামহীন পলায়নপর ঘোড়া ফেলে পিছপা হয়ে যায়। তারা পিছু হটতে হটতে তাদের তাঁবু পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তখনও পশ্চাদ্ধাবনের সময় আসেনি। হযরত খালিদ (রা.) আত্মরক্ষামূলক লড়াই করছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, শত্রুরা আক্রমণ করে করে ক্লান্ত হয়ে যাক।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত শুরাহবীল (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে যে হামলা করেন, তাতে তাদের চড়া মূল্য দিতে হয়। শত্রুরা উভয় সালারের বাহিনীর উপর তীর বৃষ্টি বর্ষণ করে। এটা কোনো গতানুগতিক তীর বর্ষণ ছিল না; বরং বাস্তব অর্থে টার্গেট নির্ধারণ করে তীর বৃষ্টি ছিল। এ সময় রোমীয়রা তাদের সকল তীরন্দাজদের সামনে নিয়ে এসেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, এত তীর বৃষ্টি হয়েছিল যে, তীরের ঝাঁক সূর্যকে আড়াল করে ফেলেছিল।

তীরন্দাযদের যোগ্যতা ও নিপুণতার অবস্থা এই ছিল যে, সাতশ মুসলমানের চোখে তীর এসে বিদ্ধ হয় এবং চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই সে দিনকে 'ইয়াওমুন নুফুর' বলা হয়। মুসলিম তীরন্দায বাহিনী রোমীয়দের উপর তীর চালিয়ে ছিল কিন্তু মুসলমানদের তীর ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। কেননা মুসলমানদের কামান ছোট ছিল। ফলে তাদের তীর দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারছিল না। এছাড়াও রোমীয়দের তুলনায় মুসলিম তীরন্দাযদের সংখ্যা ছিল অনেক কম।

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর চোখেও তীর লাগে। এতে তার এক চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য ময়দানে টিকে থাকাই ছিল দুষ্কর। ফলে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত শুরাহবীল (রা.)-কে পেছনে সরে আসতে হয়। সাতশ মুসলমান শুধু তারাই ছিল যাদের চোখে তীর লেগেছিল। এ ছাড়া আহতদের সংখ্যাও কম ছিল না।

✪✪✪

রোমীয় সর্বাধিনায়ক মাহান একটি উঁচু টিলার উপর থেকে যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন।

"উপযুক্ত সময় এসে গেছে" মাহান জোরালো আওয়াজে বলে, "এখন এসেছে হামলার মোক্ষম সময়। ... তারা আর টিকতে পারবে না।" সে তার দুই সালারকে ডেকে বলে, "গিরীগিরী! ... কাওরীন! ... তেজেদীপ্ত হামলা চালাও। চূড়ান্ত ফায়সালার সময় এসে গেছে।"

যুদ্ধের শোরগোল এবং অতি দূর হতে মাহানের আওয়াজ তার সালারদের পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ছিল না। তার চিৎকার দূত শুনতে পেত, যারা সর্বক্ষণ তার আশেপাশেই থাকত।

"আর কোনো নির্দেশ!" এক দূত এগিয়ে এসে মাহানকে জিজ্ঞাসা করে।

মাহান তার পুরো নির্দেশ প্রদান করে এবং দূতের ঘোড়া দ্রুতগতিতে টিলা থেকে নেমে যুদ্ধের ময়দানের কেয়ামতসম অবস্থার মধ্যে গায়েব হয়ে যায়।

মাহান মুসলিম বাহিনীকে এ অবস্থায় আনতে চাচ্ছিল যে, তারা যেন হামলা প্রতিহত করার যোগ্য না থাকে। এ অবস্থা এসে গিয়েছিল। মুসলমানদের সংখ্যা হাজারের মত কম হয়ে গিয়েছিল। যারা আহত হয়নি, তারাও দৈহিকভাবে ক্লান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। রোমীয়দের পক্ষে সেই সুবর্ণ সময় এসে গিয়েছিল, যার নির্দেশ মাহান গত রাতে তার সালারদের প্রদান করেছিল।

মাহানের নির্দেশ পৌঁছতেই রোমীয়রা মুসলিম তিন সালার– হযরত আবু উবায়দা (রা.), হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) এবং হযরত ইকরিমা (রা.)-এর বাহিনীর উপর একযোগে আক্রমণ করে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর বাহিনীর উপর বেশি চাপ পড়ে। কেননা, তাদের পা পূর্ব হতেই টলটলায়মান ছিল এবং তারা পিছু হটার উপক্রম ছিল। তাদেরকে যুদ্ধের ময়দান হতে তাড়িয়ে দেয়া রোমীয়দের জন্য কোনো ব্যাপার ছিল না। তারা ক্রমেই পিছু হটছিল।

রোমীয়রা যুদ্ধকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল।

মুসলমানদের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং সে পরাজয়ের ফল শুধু সেসব মুসলমানদের জন্যই ধ্বংসাত্মক ছিল না, যা লড়ছিল; বরং এটা ইসলামের জন্যও মারাত্মক আঘাত ছিল। কেননা, এই রণাঙ্গনেই এটা সুরাহা হওয়ার ছিল যে, এই পৃথিবীতে মুসলমানরা থাকবে নাকি রোমীয়রা থাকবে; ইসলাম থাকবে নাকি খৃষ্টধর্ম থাকবে।

রণাঙ্গনের লীড ছিল খৃষ্টানদের হাতে।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ (রা.)-এর বাহিনীর বাম পাশে ছিল হযরত ইকরিমা (রা.)-এর বাহিনী। তাঁর উপরেও হামলা হয়েছিল। কিন্তু তা ততটা জোরদার ছিল না, যেমনটি অন্য বাহিনীর উপর ছিল। হযরত ইকরিমা (রা.) যখন দেখেন যে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ (রা.)-এর মত বাহাদুর সালারদেরকে পিছপা হতে, তখন তিনি অনুভব করেন যে, তাঁর বাহিনীও টিকতে পারবে না।

"খোদার কসম! আমরা এভাবে ভাগব না" হযরত ইকরিমা (রা.) নারাধ্বনি দেন এবং স্বীয় বাহিনীর মাঝে ঘুরে ঘুরে বলেন, "যারা লড়াই করে মরতে এবং পিছু না হটার কসম খেতে প্রস্তুত তারা পৃথক হয়ে যাও। ... চিন্তা করে কসম কর। কসম ভাঙ্গার শাস্তির কথা মনে কর। ... সিদ্ধান্ত নাও, তোমরা কী চাও। ... পরাজয় না মরণ, অপমান ও জিল্লতির জীবন নাকি সম্মানের মৃত্যু?"

যদি পরিস্থিতি এমন করুণ না হত এবং মুসলমানরা তাজাদম হত তাহলে হযরত ইকরিমা (রা.)-এর এই ঘোষণার প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু মুসলমানরা দৈহিকভাবে যে করুণ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, তার একটি বিরাট প্রতিক্রিয়া তাদের মন-মানসিকতাতেও পরেছিল। এ বাহিনী এই প্রথমবারের মত যুদ্ধ করছিল না। তারা তিন-চার বছর পূর্বে বাড়ি হতে বের হয়েছিল এবং লড়াই করতে করতে এ স্থলে পৌঁছেছিল। এটা ছিল দৃঢ় প্রেরণা যা তারা এ পর্যন্ত সাথে করে নিয়ে এসেছিল। অন্যথা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিতে এমনটা অসম্ভবই ছিল।

উপস্থিত ভাঙ্গা শরীর আর ভগ্ন মন-মানসিকতার মধ্যে হযরত ইকরিমা (রা.)-এর ঘোষণায় মাত্র ৪০০ মুজাহিদ সাড়া দেয় এবং কসম করে যে, এক পাও পিছু হটবে না। বরং লড়াই করতে করতে জীবন দিয়ে দিবে। বাকী যারা ছিল তারা যুদ্ধ হতে বিমুখ না হলেও এমন কসম খেতে চাচ্ছিল না, যা তারা পূরণ করতে পারবে না।

এই ৪০০ মুজাহিদ, যারা কসম করেছিল, তারা হযরত ইকরিমা (রা.)-এর নেতৃত্বে ঐ রোমীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যারা হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ (রা.)-এর বাহিনীকে তাড়িয়ে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই হামলা এত কঠোর ছিল, যেন শিকারের উপর বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এর ফল এই হয় যে, রোমীয়দের ব্যাপক প্রাণহানী ঘটে। হযরত ইকরিমা (রা.)-এর বাহিনীর একজন মুজাহিদও পিছু হটেনি। কিন্তু ৪০০ জানবায মুজাহিদের একজনও সুস্থ ছিল না। বেশির ভাগই শহীদ হয়ে গিয়েছিল। অন্যরা মারাত্মক আহত হয় এবং পরে ক্ষতস্থানের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শাহাদাত বরণ করতে থাকে। অনেকে দৈহিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে গিয়েছিল।

মারাত্মক আহতদের মধ্যে হযরত ইকরিমা (রা.)-ও ছিলেন এবং তাঁর যুবক পুত্র আমরও মারাত্মক আহত হন। তাদেরকে অচেতন অবস্থায় শিবিরে আনা হয়।

✪✪✪

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ (রা.)-এর বাহিনী পেছনে শুধু হটতেই থাকে। রোমীয়রা তাদেরকে পেছনে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাচ্ছিল। বড়ই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছিল। যখন মুসলমানরা পিছু হটতে হটতে তাদের ক্যাম্পের কাছে গিয়ে পৌঁছে, তখন মুসলিম নারীরা হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে হাতে তলোয়ার এবং বর্শা তুলে নেয় তারা চাদরকে পাগড়ির মত বানিয়ে তা মাথায় পরে রোমকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের মাঝে হযরত যাররার (রা.)-এর বোন খাওলাও ছিল, যিনি মহিলাদের যুদ্ধের নেমে পড়ার আহ্বান জানাচ্ছিলেন।

ঐতিহাসিক লিখেন, মহিলারা পুরুষদেরকে অতিক্রম করে সামনে চলে যায় এবং বড়ই বীরত্ব ও বাহাদুরী প্রদর্শন করে রোমীয়দের উপর চড়াও হয়। তারা ছিল তাজাদম। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমীয়রা পশ্চাৎ ঘুরে যেতে বাধ্য হয়। তাদের আক্রমণ ছিল বড়ই কার্যকর। রোমীয়রা মহিলা দলের আক্রমণের শিকার হয়ে ভূপতিত হতে থাকে।

মহিলাদের এভাবে রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করা মুজাহিদদের মাঝে বিরাট প্রভাব ফেলে। তাদের রক্তে আগুন ধরে যায়। নিজেদের মহিলাদের যুদ্ধরত দেখে তাদের রক্ত টগবগ করে ফোটে। ফলে মুজাহিদদের সুপ্ত চেতনার বিকাশ হয়। ঐ শক্তি চাঙ্গা হয়ে যায় যা তাদের মাঝে ঘুমিয়ে ছিল। যার ফলে পিছু হটা মুজাহিদরা ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত ক্ষেপে যায় এবং রোমীয়দের জন্য তারা ত্রাসে পরিণত হয়। মুসলমানরা যুদ্ধ বিন্যাস ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং সালারদের কমান্ড মুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত রণনৈপুণ্য প্রদর্শন শুরু করে। তাদের এবারের আক্রমণে রোমীয়রা বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটতে থাকে। তারা তাদের আহতদের দলিত-মথিত করে পিছপা হচ্ছিল।

মুসলিম সালাররাও সিপাহী হয়ে যায় এবং মহিলারাও নিয়মিত লড়ছিল। দিনের শেষ লগ্ন ছিল। লড়াই বড়ই উত্তপ্ত এবং রক্তক্ষয়ী হয়। রোমীয়দের পা উপড়ে গিয়েছিল। ঘোরতর এই লড়াইয়ে হযরত যাররার (রা.)-এর বোন হযরত খাওলা কয়েকজন রোমীয়কে জাহান্নামে পাঠিয়ে নতুন এক রোমীয় ব্যক্তির মুখোমুখি হন। প্রথম আক্রমণ হযরত খাওলা করেন, যা রোমীয় ব্যক্তি প্রতিহত করে। এর সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় এমন এক জোরদার আঘাত করে যে, তার তলোয়ার হযরত খাওলার মাথার পাগড়ী কেটে দেয় এবং মাথা মারাত্মক

আহত হয়। হযরত খাওলা বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান অতঃপর তাকে আর উঠতে দেখা যায় না।

এর পরেই সূর্য অস্ত যায়। উভয় বাহিনী নিজ নিজ শিবিরে চলে যায় এবং নিজেদের আহত-নিহতদের তুলে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়ে যায়। রোমীয়দের লাশ এবং বেহুঁশ আহতদের সংখ্যা ছিল অগণিত। ক্ষতির পরিমাণ মুসলমানদেরও কম ছিল না। তবে একথা সত্য যে, তাদের ক্ষতি রোমীয়দের ক্ষতির থেকে অনেক কম ছিল।

হযরত খাওলাকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। তাকে মহিলা শিবিরে তালাশ করা হয়। কিন্তু পাওয়া যায় না। এরপর নিহত ও আহতদের মাঝে খোঁজ নেয়া হয়। সেখানেও তিনি ছিলেন না। পরে বেহুঁশ অবস্থায় তাকে রণাঙ্গনে পাওয়া যায়। তার মাথায় তলোয়ারের গভীর আঘাত ছিল। মাথার চুল রক্তে জমাটবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

"তার ভাইকে খবর দাও" কেউ বলে, "ইবনুল আযওয়ারকে বল যে, তোমার বোন গুরুতর আহত। শাহাদাত বরণ করতে চলেছে।"

হযরত যাররার (রা.) অনেক দূরে ছিলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে পাওয়া যায়। বোনের কথা শুনে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। যখন তিনি বোনের কাছে আসেন তখন ইতিমধ্যে বোনের হুঁশ ফিরে আসে। তাঁর দৃষ্টি ভাইয়ের উপর পড়লে তার ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে যায়।

"খোদার কসম! তুমি জীবিত" হযরত যাররার (রা.) আবেগমাখা কণ্ঠে বলেন, "তুমি অবশ্যই জীবিত থাকবে।"

হযরত যাররার (রা.) দাঁড়িয়ে বোনকে কোলে টেনে নেন। হযরত খাওলার মাথায় কাপড় কয়েক ভাজ করে বাঁধা ছিল, যা শত্রুর আঘাতকে দুর্বল করে দিয়েছিল। মাথায় যদি শুধুই ওড়না থাকত তাহলে মাথার খুপড়ি কেটে যেত। তখন জীবিত থাকা অসম্ভব হত।

ভয়াবহ যুদ্ধের একটা দিন অতিবাহিত হয়। রোমীয়দের এই উদ্দেশ্য একশত ভাগ ব্যর্থ হয়ে যায় যে, আজই তারা চূড়ান্ত ফলাফলে পৌঁছে যাবে। তাদের সংখ্যা যদিও অনেক ছিল কিন্তু এদিন তাদের যত সংখ্যক সৈন্য মারা যায় তাতে তাদের এই গর্ব ধুলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের চিরদিনের জন্য শেষ করে ফেলবে। মুসলমানরা যেভাবে তাদের সালারদের কমান্ড মুক্ত হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাতে তারা ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে গিয়েছিল।

রোমীয় সৈন্যদের মাঝে যারা সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছিল কিংবা গুরুতর আহত হয়েছিল তারা ছিল ঈসায়ী, আর্মেনীয় এবং অন্যান্য গোত্রগত সৈন্য, যারা রোমকদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে রণাঙ্গনে এসেছিল। রোমীয় সালার মাহান তাদেরকে সামনে পাঠায় এবং বারবার তাদের দ্বারাই হামলা করাচ্ছিল। নিজেদের চোখের সামনে তাদেরই লোকজনের এত লাশ এবং হাজার হাজার আহতদের দেখে তাদের মনোবল টুটে গিয়েছিল।

✪✪✪

সেদিন আরেকটি ঘটনা ঘটে। হযরত খালিদ (রা.) পেরেশান হয়ে কী যেন খুঁজে ফিরছিলেন। যুদ্ধের কারণে তার চেহারায় দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কভাব তো থাকতই কিন্তু এবার তাকে যেভাবে উদ্বিগ্ন দেখা যায় এমনটি কখনও দেখা যায় নি। তাকে উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়।

"আমার টুপি!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমার লাল টুপি কোথায় যেন পড়ে গেছে। সেটাই হন্যে হয়ে খুঁজছি।"

এটা ছিল দিনের বেলার ঘটনা, যখন হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীকে রোমকদের বিরুদ্ধে লড়াচ্ছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু সময়ের জন্য অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এটা শুনে সকলেই হয়রান ও অবাক হয়ে যায় যে, শত্রুরা বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত তেড়ে আসছে এবং মুসলমানদের জয়ের কোনোই লক্ষণ নেই অথচ এই সময় হযরত খালিদ (রা.)-এর মত দায়িত্ববান সর্বাধিনায়ক একটি সাধারণ টুপির জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন। হযরত খালিদ (রা.) সবাইকে টুপিটি খোঁজ করার জন্য বলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর লাল টুপির হদিস মেলে। ঐতিহাসিক লিখেন, টুপি পাওয়া যাওয়ার হযরত খালিদ (রা.)-এর চেহারায় খুশির আভা এবং ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা যায়।

"ইবনুল ওলীদ!' এক সালার কৌতুহল দমাতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে– "আপনার মাঝে কী তাদের ব্যাপারে কোনো চিন্তা-শোক নেই, যারা চিরদিনের জন্য আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে? আপনি একট টুপির জন্য এত কাতর হয়ে পড়লেন যে!"

"এই টুপির মূল্য ও মর্যাদা কেবল আমিই জানি" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "বিদায় হজ্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার চুল মুণ্ডালে কিছু চুল আমি সংগ্রহ করে রাখি। নবীজী এতে অবাক হয়ে জানতে চান, তুমি এই চুল নিয়ে কী করবে? আমি বলি, আমার কাছে রাখব। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এই চুল আমার মনোবল বৃদ্ধি করবে। তখন নবীজী মুচকি হেসে

বলেন, "এই চুল তোমার কাছেই থাকবে। সাথে সাথে আমার দোয়াও তোমার সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ তোমাকে প্রত্যেক যুদ্ধে বিজয় দান করবেন।"

... আমি নবীজীর চুলগুলি এই টুপিতে রেখেছিলাম। এই টুপি আমি বেহাত করতে পারি না। কারণ এর বরকতেই আমার শক্তি এবং আমার মনোবল অটুট থাকে।"

টুপি পাওয়া যাওয়ায় হযরত খালিদ (রা.) খুব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু সে রাতটি ছিল তাঁর জন্য শোক-দুঃখের রাত। তিনি এক স্থানে বসা ছিলেন। তাঁর এক রানের উপর সালার হযরত ইকরিমা (রা.)-এর মাথা ছিল আর অপর রানের উপর হযরত ইকরিমা (রা.)-এর যুবক পুত্র আমরের মাথা ছিল। পিতা-পুত্র সেদিনের যুদ্ধে এত গুরুতর আহত হয়েছিলেন যে, তাদের চেতনা ফিরছিল না। শরীর হতে অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছিল। ক্ষত এত বেশি ও গভীর ছিল যে, সেখানে ব্যান্ডেজ বাঁধার উপায় ছিল না। সেদিন পিতা-পুত্র এই কসম করে লড়েছিলেন যে, মরে যাবেন তবুও পিছু হটবেন না।

হযরত ইকরিমা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর ভাতিজাও ছিলেন এবং প্রিয় বন্ধুও ছিলেন। তাঁর বহু পুরাতন সঙ্গী ছিলেন তিনি। উভয়েই নামকরা বীর ও অশ্বারোহী ছিলেন। এত প্রিয় সঙ্গীর বিচ্ছেদ যাতনায় হযরত খালিদ (রা.) বড়ই মর্মাহত হন। হযরত ইকরিমা (রা.)-এর নওজোয়ান পুত্র আমরও দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার উপক্রম হন। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর কাছে পানির পাত্র রেখেছিলেন। তিনি পানিতে আঙ্গুল ডুবিয়ে একবার হযরত ইকরমা (রা.)-এর আধাখোলা ঠোঁটে স্থাপন করেন আরেক বার তাঁর পুত্র আমরের ঠোঁটে স্থাপন করেন। কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা পানি যা পিতা-পুত্রের মুখে যাচ্ছিল তা আর ভেতরে প্রবেশ করছিল না। পিতা-পুত্র দুনিয়ার পানি পান করা হতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন।

এমনিভাবে হযরত ইকরিমা (রা.) এবং তাঁর একটু পরেই তাঁর যুবক পুত্র হযরত খালিদ (রা.)-এর কোলে মাথা রেখে পরকালে পাড়ি জমান। উভয়ের মাথা দু'দিকে হেলে যায় এবং তাদের দেহ নিথর হয়ে যায়। প্রায় একই সময়ে পিতা-পুত্রের বিদায়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি দু'বার ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলেন।

"এখনও কী ইবনে হানতমা বলবেন যে, বনু মাখযুম জীবন কুরবানী দেয় নি?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

'হানতমা' খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.)-এর মাতার নাম ছিল।

খালিদ (রা.) এবং হযরত ইকরিমা (রা.) উভয়ে বনু মাখযুম গোত্রের

ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর সম্ভবত এই ধারণা ছিল যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, ইসলামের জন্য বনু মাখযুমের জীবন বিসর্জন খুবই কম। হযরত ইকরিমা (রা.) এবং তাঁর পুত্রের শাহাদাত কোনো মামুলি কুরবানী ছিল না।

সে রাতটি আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছিল, যেন প্রতিটি ক্ষণ এক ধরনের ভীতি ও আশঙ্কার মধ্য দিয়ে পার হয়। আহতদের কাতর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। কয়েকজন শহীদের স্ত্রী সেখানেই ছিলেন কিন্তু কোনো মহিলার কান্নার আওয়াজ শোনা যায় না। পরিবেশ রক্তের গন্ধে ভারাক্রান্ত ছিল। দিনের বেলায় অশ্বারোহীদের খুরে উড়ন্ত ধূলা-বালু মধ্য রাতে আবার জমিনে ফিরে আসছিল।

শহীদদের জানাযা পড়ে তাদের দাফন করা হচ্ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে, রাতের বেলায় কোনো এক সালারকে এই কাজে নিযুক্ত করতেন যে, সে সকল তাঁবুর আশপাশ ঘুরে-ফিরে প্রহরীদেরকে পর্যবেক্ষণ করবে অতঃপর সেসব মুজাহিদদেরও খোঁজ-খবর নিবে, যাদেরকে শত্রুদের তাঁবুর উপর নজর রাখার জন্য সামনে পাঠানো হয়েছিল। সে রাতে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই চিন্তায় কোনো সালারকে উক্ত কাজে পাঠান না যে, তারা সারা দিন যুদ্ধ করে ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তাই তিনি কাজটি নিজেই করার জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু তিনি যেদিকেই যান, সেখানে কোনো না কোনো সালারকে পায়চারী করতে দেখেন। এমন কি সালার হযরত যুবায়ের (রা.) তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে খোঁজ-খবর নিতে বের হয়েছিলেন। উভয়ে অশ্বের পিঠে আসীন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও দিনের বেলায় যুদ্ধ করেছিলেন। এক সময় দুঃখের রাতও পেরিয়ে যায়। ইয়ারমুক যুদ্ধের পঞ্চম দিবসের অভ্যুদয় ঘটে। হযরত খালিদ (রা.) ফযরের নামায শেষ করেই সালারদের ডেকে পাঠান।

"আমার বন্ধুগণ!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আজ গতকালের তুলনায় ভয়ঙ্কর দিন হবে। আমাদের সংখ্যার দিকে তাকালে তা অবশ্যই কম এবং যারাও বা রয়েছে তাদের অবস্থাও তোমাদের সামনে। আজ আহত সৈনিকও লড়বে। শত্রুদেরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া তাদের জন্য কোনো ব্যাপার নয়। তোমরা শত্রুদের লড়াই করার ধরন প্রত্যক্ষ করেছ। শুধু এতটুকু খেয়াল রাখবে, যেন কেন্দ্রীয় অবস্থানস্থল ঠিক থাকে। এখন আমরা জীবন-মরণ লড়াই করছি।

হযরত খালিদ (রা.)ঃ সালারদের কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়ে বিদায় করেন। সাথে সাথে মুসলিম বাহিনীর নিজ নিজ পজিশনে চলে যায়। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, দৈহিক দিক দিয়ে যত জন অক্ষত ছিল, ঠিক ততজন আহত সৈন্যও

তাদের সঙ্গে ছিল। আহতদের অনেকেই এমন ছিল, যারা একটি পর্যায় পর্যন্ত যুদ্ধ করার যোগ্য না থাকলেও তারা সঙ্গ ছাড়তে চাচ্ছিল না। মহিলারাও আজ লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

মুসলমানদের এই নাজুক অবস্থার কথা শত্রুপক্ষের কাছে গোপন ছিল না। তারা মুসলমানদের ভঙ্গুর অবস্থা হতে পুরোপুরি ফায়দা তুলতে চাচ্ছিল। মুসলমান সালাররা রোমীয়দের অবস্থানস্থলের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের ধারণা ছিল, আজ রোমীয়রা অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে হামলার গোড়াপত্তন করবে। মুসলমান সালারদের এই আশঙ্কাও ছিল যে, আজ রোমীয়রা পুরো বাহিনী নিয়ে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

প্রভাত আলো ঝলমল হয়ে গিয়েছিল। তথাপিও রোমীয়রা সামনে এগিয়ে আসে না। এক সময় সূর্য ওঠে। তবুও রোমীয়দের নড়চড় দেখা যায় না।

রোমীয়দের এই নীরবতা প্রলয়ঙ্করী মনে হচ্ছিল। এটা অনেকটা তুফানের পূর্ববর্তী নীরবতার মত ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে হয় যে, আজ হয়ত রোমীয়রা মুসলমানদের প্রথমে হামলা করার সুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) আক্রমণের সূচনা ঘটতে চান না। তিনি আরও কিছু সময় প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করাকেই শ্রেয় মনে করছিলেন।

পরিশেষ রোমীয় শিবির হতে এক অশ্বারোহীকে আসতে দেখা যায়। রোমীয় বাহিনী কোনো তৎপরতা দেখায় না। অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনীর সামনে এসে থেমে যায়। আগন্তুক এক ঈসায়ী আরব ছিল। আরবের ভঙ্গিতে কথা বলছিল।

"আমি আমার সেনাপতি মাহানের একজন দূত" ঈসায়ী ঘোষণা করার ভঙ্গিমায় বলে, "তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই।"

ইয়ারমুক যুদ্ধ হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে চললেও সর্বাধিনায়ক ঠিকই ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.)। তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে এ যুদ্ধের পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মূল জিম্মাদার ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল তাঁরই। রোমীয় দূতের আহ্বানে হযরত আবু উবায়দা (রা.) সামনে অগ্রসর হন।

হযরত খালিদ (রা.) সে স্থান হতে সামান্য দূরে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) দূতের দিকে এগিয়ে গেলে তাঁর কান খাড়া হয়ে যায় এবং তিনি তাদের দিকে কিছুটা এগিয়ে আসেন।

"বল, রোমীয় দূত!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, "কী বার্তা এনেছ?"

"সেনাপতি মাহান বলেছেন যে, কয়েকটা দিনের জন্য যুদ্ধ মূলতবী করা হোক" দূত বলে, "এতে আপনি সম্মত আছেন?"

"তোমাদের সেনাপতি এর কোনো কারণ বলেছে কী?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"এটা হবে সাময়িক সন্ধি" দূত বলে, "এ সময়ের মাঝে ফায়সালা হবে যে, পরিপূর্ণ সন্ধির জন্য আলাপ-আলোচনা হবে কি না?"

"আমরা সাময়িক সন্ধি সমর্থন করতে পারি" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "কিন্তু আলাপ-আলোচনার ফায়সালা কে করবে?"

"আপনি যুদ্ধ বিরতি দিতে সম্মত?" দূত জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "কিন্তু ... ।"

"নয়!" একটি গর্জন শোনা যায়।

আওয়াজের উৎসস্থলের দিকে উভয়ে তাকায়। এটা ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর বজ্রকণ্ঠ। তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কথা শুনেছিলেন।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "তাদের সেনাপতি সাময়িক সন্ধি করতে চায়।"

"আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কানে কানে বলেন, "তারা মূলত 'সাময়িক সন্ধির' আড়ালে পরিপূর্ণ হামলা করার প্রস্তুতি নেয়ার অবকাশ চায়। তাদের ক্ষয়ক্ষতি এত বেশি হয়েছে যে, এখনিই আর হামলা করতে চায় না। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিই।"

"হে রোম সাম্রাজ্যের দূত!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) দূতকে লক্ষ্য করে বলেন, "সন্ধি-সমঝোতার সময় পেরিয়ে গেছে। এত লোকের জীবন দানের পর আমি এ কথা বলতে চাই না যে, আমি আমার মুজাহিদ বাহিনীর রক্ত অহেতুক ক্ষয় করে এসেছি। ... যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেন এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে মুসলিম শিবিরের দিকে চলতে থাকেন।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমার বাহিনীর নাজুক অবস্থা দেখে আমি এই উদ্দেশ্যে তাদের 'যুদ্ধ বিরতি' প্রস্তাব সমর্থন করছিলাম যে, এ সময়ে মুজাহিদরা বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পাবে এবং কতক আহত সৈন্য সুস্থও হয়ে যাবে। তুমি কি দেখছ না যে ... ।"

"সব কিছুই আমার সামনে আছে ইবনুল যাররাহ!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তবে কথা হলো, আমাদের শত্রুদের অবস্থাও ততটা সুবিধাজনক নয়।

নতুবা তারা সন্ধির নামে ধোঁকা দিত না। রোমীয়দের সঙ্গে অনেক গোত্র এসেছিল। রোমীয় সালার তাদেরকেই শুধু বারবার সামনের সারিতে দিয়ে পাঠাচ্ছে। এতে হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। অথচ রোমীয়দের নিয়মিত সৈন্যদের বেশি ব্যবহার না করায় তারা এক প্রকার নিরাপদেই রয়েছে। এতে মাহানের কারচুপি ধরা পড়ায় হয়ত গোত্রীয় লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে গেছে নতুবা বারবার আক্রমণের শিকার হয়ে তাদের মনোবল দারুণভাবে ভেঙ্গে গেছে। বাস্তবতা যেটাই হোক, যুদ্ধ বিরতি দিয়ে আমরা তাদের পরিস্থিতি সামলে নেয়ার সুযোগ দিব না।"

"তবে কি তুমি তাদের উপর হামলা করার চিন্তা করছ?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"আপনি কী চিন্তা করতে সক্ষম নন আমীনুল উম্মত?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আসুন, দু'জনে মিলে চিন্তা করি।"

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.) যা চিন্তা করেন তা ছিল বড়ই ভয়ঙ্কর এবং দুঃসাহসী পদক্ষেপ।

যুদ্ধের পঞ্চম দিন লড়াই ছাড়াই পার হয়। এতে সৈন্যরা বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পেলেও সালাররা বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পান না। হযরত খালিদ (রা.) সালারদের ব্যতিব্যস্ত রাখেন। আট হাজার অশ্বারোহীকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র বাহিনী তৈরী করেন। হযরত খালিদ (রা.) তাদের স্বীয় পরিকল্পনা বোঝান। তিনি এই বাহিনী যেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা তৈরী করেছিলেন। তাদের অর্ধেকেই ছিল আহত। তারপরেও এমন দুঃসাহসিক পরিকল্পনার ঝুঁকি হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষেই নেয়া সম্ভব ছিল।

সূর্যোদয়ের মাধ্যমে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হয়। রোমীয় সৈন্যরা সামনে এগিয়ে আসে। মুসলমানরা নয়া বিন্যাসে ময়দানে পূর্বের থেকেই উপস্থিত ছিল। রোমীয় সালার গিরীগিরী অশ্বে চেপে সামনে আসে। গিরীগিরী সেই বাহিনীর সালার ছিল, যার দশজন করে সৈন্য এক একটি শিকলে বাঁধা ছিল। গিরীগিরী উভয় বাহিনীর মাঝে এসে তার ঘোড়া দাঁড় করায়।

"তোমাদের সেনাপতির কী এই সাহস আছে যে আমার মোকাবেলায় আসবে?" গিরীগিরী হুংকার দিয়ে বলে।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর ঘোড়ায় মৃদু আঘাত করেন এবং গিরীগিরীর দিকে এগিয়ে যান।"

"থামুন ইবনুল যাররাহ!" হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে ডাক দেন এবং ঘোড়ার ছুটিয়ে তার কাছে গিয়ে বলেন, "আপনি সামনে যাবেন না। আমাকে যেতে দিন।"

"আহ! আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "সে তো আমাকেই ডাকছে।"

"আমীনুল উম্মতকে থামান!" কয়েকজন সালার একযোগে বলেন, "ইবনে ওলীদকে যেতে দিন।"

ঐতিহাসিক লিখেন, গিরীগিরী মুসলমান সালারকে তলোয়ার চালনায় দক্ষ মনে করত। তলোয়ার চালনায় হযরত আবু উবায়দা (রা.)-ও কম পারদর্শী ছিলেন না। তারপরেও সবাই হযরত খালিদ (রা.)-কে গিরীগিরীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য যোগ্য মনে করে। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) কারো মানা শোনেন না এবং গিরীগিরীর মোকাবেলায় চলে যান।

গিরীগিরী হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে তার দিকে আসতে দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং সে এভাবে ঘোড়াকে একদিকে নিয়ে যায় যেন সে পার্শ্ব দিক হতে এসে তলোয়ারের আঘাত হানতে চায়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়া থামান এবং গিরীগিরীকে চোখের কোণ দ্বারা দেখতে থাকেন। গিরীগিরী নিজস্ব ভঙ্গিতে ঘোড়া ঘোরায় এবং ছুটে গিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর উপর আঘাত করে। আঘাত এমন জোরালো ছিল যে, মনে হচ্ছিল, তা প্রতিহত করা যাবে না। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) অবিশ্বাস্যভাবে আঘাত প্রতিহত করেন এবং ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে আক্রমণ করেন। গিরীগিরী আঘাত ফিরিয়ে দেয়।

এরপর তলোয়ারের ঠুকাঠুকি, অশ্বারোহীদের প্রান্ত বদল ইত্যাদি চলতে থাকে। উভয়কেই সমানে বীর যোদ্ধা মনে হচ্ছিল। উভয়ের আঘাতে তীব্র গতি ছিল এবং প্রত্যেক আক্রমণে মনে হচ্ছিল প্রতিপক্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। উভয় বাহিনীর নিজ নিজ পক্ষের সৈন্যরা তাদের সালারকে করতালি ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহ যোগাচ্ছিল। কখনও উভয় শিবিরে নেমে আসত এমন সুনসান নীরবতা, যেন সেখানে কোনো মানুষ-জন নেই।

এক সময় গিরীগিরী একটি আক্রমণ করে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) তা দক্ষতার সঙ্গে প্রতিহত করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) আক্রমণ করতে উদ্যত হলে গিরীগিরী তার ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং আবু উবায়দা (রা.)-কে ঘিরে ঘুরতে থাকে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে, গিরীগিরী আক্রমণ প্রতিহত করার পরিবর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে দিত। হযরত আবু

উবায়দা (রা.) তাকে আক্রমণ করার বহু চেষ্টা করেন কিন্তু গিরীগিরী আক্রমণ হতে পালিয়ে ফিরছিল। দৃশ্যত মনে হচ্ছিল, গিরীগিরী মোকাবেলা হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তার পেছনে ধাওয়া করেন।

পরিশেষে গিরীগিরী অশ্বের মুখ তার শিবিরের দিকে ফেরায়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তার পেছনে আঠার মত লেগে থাকেন। গিরীগিরী ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-ও তাঁর ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেন। রোমীয় বাহিনী নীরবতার সঙ্গে দেখছিল। কিন্তু মুসলমানরা খুশিতে নারাধ্বনি দিতে থাকে। কারণ রোমীয় সালার মোকাবেলা ছেড়ে স্বীয় শিবির পানে পালিয়ে যাচ্ছিল।

গিরীগিরী ঘোড়া এক দিকে ঘোরায় এবং গতি বাড়িয়ে দেয়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়ায় পদাঘাত করেন এবং গিরীগিরীর কাছাকাছি চলে যান। গিরীগিরী হঠাৎ ঘোড়া ঘুরিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সামনে চলে আসে। এটা ছিল তার চাল। সে পালিয়ে যাবার নামে ধোঁকা দিচ্ছিল। ধোঁকা এই ছিল যে, তার নিয়ত ছিল, চলতে চলতে হঠাৎ ফিরে আবু উবায়দা (রা.)-এর উপর আক্রমণ করবে এবং তাকে আঘাত ঠেকানোর সুযোগ দিবে না।

ঐতিহাসিক তবারী এবং বালাজুরী লিখেছেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.) সচেতন ছিলেন এবং গিরীগিরীর ধোঁকা ধরে ফেলেছিলেন। গিরীগিরী হঠাৎ ঘোড়া ঘুরিয়ে আক্রমণ করতে চাইলে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর তলোয়ার প্রথমে নড়েচড়ে ওঠে। গিরীগিরীর ঘাড় আঘাত করার মোক্ষম স্থান ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর আঘাত সোজা গিরীগিরীর ঘাড়ে গিয়ে লাগে। এতে ঘাড় কেটে যায় এবং ঘাড় একদিকে ঢলে পড়ে। গিরীগিরী ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে যায়।

মুসলিম শিবিরে জয়জয়কার রব ওঠে। নিয়মানুযায়ী করণীয় ছিল, হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়া থেকে নেমে গিরীগিরীর তলোয়ার, শিরস্ত্রাণ এবং বর্ম খুলে নিবেন কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়ার পিঠ হতে নামেন না। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে থেকেই কিছুক্ষণ গিরীগিরীকে ছটফট করতে দেখেন। যখন তার দেহ নিথর হয়ে যায় তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং মুসলিম শিবিরে চলে আসেন।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বাহবা দিতে সেখানে অপেক্ষা করেন না। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর নিকট চলে যান, যাদেরকে তিনি সেদিনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। আট হাজার অশ্বের বাহিনীকে হযরত

আমর বিন আস (রা.)-এর বাহিনীর পার্শ্বদেশের পেছনে এমন স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, যেখানে তাদেরকে শত্রুরা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

হযরত খালিদ (রা.) বাকী সমস্ত সৈন্যকে একযোগে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। রোমীয় সালার এই ভেবে হতবাক হয়ে যায় যে, মুসলমান সালারদের আজ মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেননা, তারা সমস্ত সৈন্যকে একত্রে হামলা করার নির্দেশ দিয়েছে। রোমীয়রা এটা দেখে না যে, মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনী হামলায় শরীক নেই। রোমীয়দের এ দিকটা ভেবে দেখার অবকাশই হয় না। কেননা, হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে খুব দ্রুত গতিতে হামলা করা হচ্ছিল। এতে রোমীয়দের অনেক অনেক সৈন্য নিহত এবং মারাত্মক আহত হয়ে পড়েছিল। তারপরেও মুসলমানদের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল তিন গুণ। মুসলমানদেরও প্রাণহানী ঘটেছিল। অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এত অধিক সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করাটাও ছিল এক প্রকার আত্মহত্যার শামিল।

"তাদের আসতে দাও" রোমীয় সালার মাহান উচ্চকণ্ঠে বলছিল, "আরও এগিয়ে আসতে দাও। ... তারা আমাদের হাতে মরতে আসছে।"

হযরত খালিদ (রা.) আট হাজার অশ্বারোহীকে পেছনে নিয়ে গিয়ে রোমীয়দের বাম পার্শ্বদেশের কোথাও নিয়ে রাখেন। তিনি সালার হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে বলে রেখেছিলেন যে, তিনি যেন রোমীয়দের ঐ পার্শ্ব বাহিনীর উপর জোরদার হামলা করেন। হযরত আমর (রা.) নির্দেশ পালন করেন এবং জীবন বাজি রাখেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর ইচ্ছা ছিল, শত্রুপক্ষের পার্শ্ব বাহিনীকে সম্মুখ থেকে ব্যতিব্যস্ত রাখবেন।

হযরত আমর বিন আস (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর এ ইচ্ছা পূরণ করেন। হযরত খালিদ (রা.) আট হাজার অশ্বারোহীদের মধ্য হতে দুই হাজার সৈন্য পৃথক করেছিলেন। তিনি যখন দেখেন যে, দুশমনের পার্শ্ব বাহিনী হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর বাহিনীর মাঝে পূর্ণভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, তখন তিনি ছয় হাজার অশ্বারোহী দ্বারা রোমীয়দের পার্শ্ব বাহিনীর উপর এক দিক থেকে প্রচণ্ড হামলা শুরু করেন। রোমীয়দের জন্য এই হামলা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ফলে নতুন বাহিনীর হামলায় তাদের অবস্থান টলটলায়মান হয়ে যায়। হযরত আমর বিন আস (রা.) শত্রুপক্ষের রণে চিড় ধরায় হামলা আরও জোরদার করেন।

শত্রুদের এই বাহিনীর উপরেই সামনে হতে হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.)-ও হামলা করেছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) যে দুই হাজার অশ্বারোহীকে পৃথক করে রেখেছিলেন, তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন শত্রুদের ঐ

অশ্বারোহী দলের উপর আক্রমণ করে, যারা তাদের পার্শ্ব বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ঐ দুই হাজার অশ্বারোহীদের প্রতি নির্দেশ এই ছিল যে, তারা যেন শত্রুদের অশ্বারোহীদেরকে আটকে রাখে অর্থাৎ বেশি জোরদার হামলা করবে না; বরং শত্রুদের ধোঁকার মধ্যে রাখবে।

পরে জানা গিয়েছিল যে, রোমীয়দের এই বিশেষ অশ্বারোহী দল, যাদের কাজ ছিল, যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে সেখানে পৌঁছে যাওয়া। মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদেরকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখে যে, তারা হামলা করে ডানে-বামে চলে যাচ্ছিল। প্রান্ত পরিবর্তন করে আবার এসে হামলা করছিল এবং হালকাভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে আবার এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছিল।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.)-এর এই কৌশল খুবই কার্যকরী হয়। তিনি শত্রুদের মোকাবেলায় স্বল্প সংখ্যক সৈন্যকে এমন সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছিলেন যে, দুশমনের পার্শ্ব বাহিনীর পা নড়ে গিয়েছিল। শত্রুদের আশা ছিল যে, কঠিন পরিস্থিতিতে অশ্বারোহী দল তাদের সাহায্যে আসবে। কিন্তু সাহায্যে আসা অশ্বারোহী দলকে হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্বাচিত দুই হাজার অশ্বারোহী টিম সুকৌশলে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। যার ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা পার্শ্ব বাহিনীর সাহায্যে যেতে পারে না।

শত্রুদের পার্শ্ব বাহিনী পিছু হটলে হযরত খালিদ (রা.) ছয় হাজার অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক হামলা আরও জোরদার করেন। মাহান নিজে এসে স্বীয় বাহিনীকে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু তার সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত ও পিছু হটতে থাকে। পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্য ছাড়া লড়তে পারে না। ফলে তারা সংঘবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে এবং রণে ভঙ্গ দিতে থাকে।

পলায়নরত বাহিনী ছিল আর্মেনীয় সৈন্য। ঐতিহাসিক লিখেন, তাদের পলায়নের এক কারণ এটা ছিল যে, তাদের উপর মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী হামলা চালিয়েছিল এবং তাদের উপর সামনের দিক থেকেও প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। আর দ্বিতীয় কারণ এই ছিল যে, আর্মেনীয় সালাররা অনুভব করে যে, তাদেরকে অভিজ্ঞ অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা সাহায্য করা হতে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। তাদের পেছনে ছিল ঈসায়ী আরব, যাদের সালার ছিল জাবালা বিন আইহাম। তিনিও অশ্বারোহী বাহিনী না আসায় ভুল বুঝেন এবং যুদ্ধ হতে মুখ ফিরিয়ে নেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, আর্মেনীয় ও ঈসায়ী আরবদের পিছুটান ছিল পলায়নের মত। দুই ঐতিহাসিক এটাকে এক ধরনের প্লাবন বলেছেন, যার সামনে যা কিছুই আসুক তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রোমীয়দের বাম পার্শ্ব বাহিনী হতে যারা পলায়ন করে তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারের মত। চল্লিশ হাজার মানুষের পলায়ন এমন বাধ ভাঙ্গা সয়লাবের মত ছিল, যা তাদের সালারদেরও তাদের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এমনকি প্রধান সেনাপতি মাহান, যিনি কখনও রণাঙ্গন ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনিও স্বীয় বডিগার্ড বাহিনীসহ ঐ প্লাবনের সামনে পড়ে যান এবং স্রোতের তালে তালে ভেসে যেতে থাকেন।

এটা ছিল হযরত খালিদ (রা.) এবং সমর কুশলতা ও রণ প্রজ্ঞার ফল। তিনি শত্রুদের পদাতিক বাহিনীকে অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিলেন এবং অশ্বারোহীদের দ্বারা পদাতিক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর এবারের টার্গেট ছিল শত্রু সেনাপতি মাহান এবং তার দুই হাজার বডিগার্ড বাহিনী।

✪✪✪

ওদিকে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) তাঁদের সামনে থাকা বাহিনীর উপর এক নয়া আঙ্গিকে হামলা করছিলেন। তারা জোরালোভাবে আক্রমণও করছিলেন না আবার পিছুও হটছিলেন না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) শত্রুদের অগ্রযাত্রা আটকে রেখেছিলেন। শত্রুদের এই বাহিনীটা ছিল শিকলবদ্ধ। ফলে তাদের পক্ষে স্বাচ্ছন্দে ও দ্রুতগতিতে সামনে অগ্রসর হওয়া কিংবা পেছনে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের ঐ অশ্বারোহী দলটিকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন, যাদের দায়িত্ব ছিল উড়ে উড়ে গিয়ে সৈন্যদের মদদ যোগানো। এই বাহিনীকে স্বাচ্ছন্দে লড়ার সুযোগই দেয়া হচ্ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) এবার স্বীয় নির্বাচিত অশ্বারোহী দলটি নিয়ে রোমীয়দের পশ্চাতে চলে যান। তিনি পেছন থেকেও আক্রমণ চালান। এটা ছিল রোমীয় সৈন্যদের দ্বিতীয় অংশ। এদের উপরে বাম পার্শ্ব বাহিনীর এবং অশ্বারোহী বাহিনীর পলায়নে মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়েছিল। সেনাপতি মাহান গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় কমান্ডও বাকী ছিল না। এবার সালাররা নিজেদের মত করে লড়ে চলছিল। তারা বর্তমানে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করছিল।

যখন কোনো বাহিনীর এক বিরাট অংশ পালিয়ে যায় এবং তাদের সাহায্য পৌঁছার আশা না থাকে, তখন উদ্ভূত পরিস্থিতি এমনই হয় যে, তখন প্রত্যেক সৈন্য নিজ নিজ জীবন রক্ষা করার জন্য লড়াই করে এবং সুযোগ পেলেই পিছুটান

দেয়। রোমীয় সৈন্যদের জন্য এমন পরিস্থিতি সামনে চলে এসেছিল। হযরত খালিদ (রা.) পলায়নপর রোমীয় সৈন্যদের পালানোর একটি পথ ব্যতীত সমস্ত পথের গতিরোধ করেছিলেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর এই চেষ্টাও ছিল যে, রোমীয় সৈন্যরা যেন শুধু ঐ এক খোলা পথেই পলায়ন করে। সুতরাং পরিকল্পনা মত রোমীয় সৈন্যরা ঐ এক রাস্তা দিয়েই প্লাবনের মত পালিয়ে যাচ্ছিল।

বিভিন্ন গোত্র হতে যুদ্ধ করতে আসা সৈন্যরা পালায় বিক্ষিপ্তভাবে। কিন্তু মূল রোমীয় সৈন্যরা পালায় না। তারা পিছু হটলেও তা ছিল সুশৃঙ্খল এবং সুবিন্যস্ত ভাবে। রোমীয় কিছু সৈন্য পলায়নকারীদের মিছিলে শামিল থাকলেও বেশির ভাগ সৈন্য ছিল সুনিয়ন্ত্রিত।

হযরত খালিদ (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশের এলাকা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি অত্র এলাকা হতে ফায়দা লাভের জন্য যা যা চিন্তা করেছিলেন, তা কোনো সাধারণ ব্রেনে আসার কথা ছিল না। রোমীয় সৈন্যরা যখন পালাচ্ছিল, তখন হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে তাঁর বাহিনী পলায়নকারী সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে একটি বিশেষ এলাকার দিকে যেতে বাধ্য করছিল। সেদিকে একটি উপত্যকা ছিল, সেখান থেকে একটি নদী বহমান ছিল এবং ঐ উপত্যকার আশপাশ অনেকটা এমন ছিল যে, আশপাশ হতে উপত্যকা ক্রমেই গভীর খাদের দিকে চলে গিয়েছিল। উপত্যকার এক দিকে ঢালু থাকলেও ঠিক তার বিপরীত দিকের ঢালু অঞ্চল ছিল বেশি সোজা। সেখান থেকে উপরে উঠা গেলেও তা খুব কঠিন ছিল।

রোমীয় সৈন্যরা ঐ কঠিন দিকে চলছিল। তাদের সামনে কেবল একটি রাস্তাই ছিল যে, তারা সহজসাধ্য ঢালু পথে সহজে নেমে যায় এবং নদীও পার হয়ে যায়। যখন তারা দ্বিতীয় ঢালু পথে চলতে থাকে তখন কঠিন অবস্থা সামনে আসে। তারা আস্তে আস্তে উপর দিকে ওঠে। হঠাৎ উপর দিক হতে নারাধ্বনি উচ্চকিত হয় এবং হুংকার ভেসে আসে।

নারাধ্বনি দানকারী সৈন্যরা ছিল অশ্বারোহী এবং তাদের সালার ছিল হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রা.)। তাঁর দেহ নাভী থেকে উপর পর্যন্ত নগ্ন ছিল। হযরত খালিদ (রা.) রাতে যে পরিকল্পনা করেছিলেন সে অনুযায়ী তিনি সে সময়ই হযরত যাররার (রা.)-কে পাঁচশ অশ্বারোহী দিয়ে রিকাদ উপত্যকার উপর কিনারায় পাঠিয়ে দেন এবং কর্তব্য করণীয় কী তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেন, তাদের কর্তব্য-করণীয় কী।

হযরত খালিদ (রা.) যেমনটি ভেবেছিলেন, ঠিক তেমনটিই ঘটেছিল। রোমীয় সৈন্যদের মূল চেষ্টা ছিল, তাদের পশ্চাদ্ধাবনে যে মুসলমানরা আসছে তাদেরকে অনেক দূরত্বে রাখা। ফলে তারা দ্রুত রাস্তা অতিক্রম করছিল। হযরত

খালিদ (রা.) পশ্চাদ্ধাবন এই জন্য অব্যাহত রেখেছিলেন যে, রোমীয় সৈন্যরা যেন গতি দ্রুততর করে। এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় যে, রোমীয়র উপত্যকার উপরে উঠলে হযরত যাররার (রা.)-এর পাঁচশ অশ্বারোহীকে বর্শা উঁচিয়ে সেখানে প্রস্তুত দেখতে পায়। যেসকল রোমীয় সৈন্য উপরে উঠেছিল তারা বর্শা ও তীরের শিকার হয়ে বেঘোরে মারা যায়। যারা তখনও উপরে উঠেনি তারা অগ্রবর্তীদের পরিণতি দেখে পেছন পানে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু পথ উঁচু-নিচু হওয়ায় তাদের পক্ষে দ্রুত নিচে নামা সম্ভব হচ্ছিল না। পেছনে আসা মুসলমানরা তাদের উপর পাথর ছোঁড়া শুরু করে, যা তারা ইতোপূর্বে এ উদ্দেশেই সংগ্রহ করে রেখেছিল। উপরে উঠা রোমীয় সৈন্য পাথরের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে হেলে-দুলে নিচে গড়াতে গড়াতে এসে পড়ছিল। উপর থেকে তাদের উপর ভারী পাথর বর্ষিত হচ্ছিল। অশ্বারোহীও ভূপাতিত হচ্ছিল। ঘোড়াও পড়ে যাচ্ছিল আর তাদের নীচে চাপা পড়ে পদাতিকরাও প্রাণ হারাচ্ছিল।

✪✪✪

রোমীয়রা কোনো অংশে কম ছিল না। তখনও এক বিরাট সংখ্যক সৈন্য নদী পার হয়নি। রোমীয় সালার অগ্রসরমান সৈন্যদের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে পেছনের সৈন্যদের সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখে এবং উপত্যকায় নামার পরিবর্তে তাদেরকে সেখানেই কাতারবদ্ধ করে। তারা লড়াই করে মরে যেতে চাচ্ছিল। আর্মেনীয় এবং ঈসায়ী আরবদেরও কিছু সৈন্য তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিল। এসব সৈন্য পালাচ্ছিল আর মুসলমানরা তাদেরকে উপত্যকার দিকে আনছিল।

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি শত্রুদেরকে সারিবদ্ধ দেখে তাঁর সালারদের ডেকে বলেন, শত্রুদের উপর পরিকল্পিত হামলা চালাও।

"তাদের মাঝে লড়াই করার হিম্মত নেই" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, সোজা আক্রমণ কর। আমার নির্দেশের অপেক্ষা করবে না। তাদের জন্য পিছু হটার জায়গা নেই। একদিকে ইয়ারমুক নদী অপরদিকে গভীর উপত্যকা। সামনে আমরা দাঁড়ানো। তাদের উপর আক্রমণ কর।"

রোমীয়রা ফাঁদে পড়েছিল। লড়াই করার প্রেরণা তাদের অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন ঐতিহাসিক মুসলমানদের সংখ্যা হাজার এবং দুইজন ঐতিহাসিক এর থেকে কিছু কমের কথা লিখেছেন। শাহাদাত এবং মারাত্মক আহত হওয়ার কারণে মুসলমানদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। একটি দলকে মহিলা এবং বাচ্চাদের হেফাজতের জন্য পেছনে রেখে যাওয়া হয়েছিল।

মুসলমানরা হামলা চালায়। এখানে কোনো চাল চলে না। এই হামলার ধরন ছিল একযোগে হামলা করার মত। অশ্বারোহী এবং পদাতিকরা একে অপরের মাঝে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। রোমীয়রা জীবন এবং মৃত্যুর লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত সৈন্য। এই বাহিনীর প্রথম সারির সৈন্যরা দৃঢ়তার সঙ্গে মুসলমানদের মোকাবেলা করে। কিন্তু স্থানটি এমন ছিল যে, সেখানে ডানে-বামে ঘুরে এবং স্বাচ্ছন্দে লড়াই করার কোনো সুযোগ ছিল না। এই জন্য রোমীয়রা নিজেদের সঙ্গেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছিল এবং তারা পরস্পরে একে অপরের পথে অন্তরায় হয়ে যায়।

এই উদ্ভুত পরিস্থিতি মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। রোমীয়দের প্রথম সারির সৈন্যরা দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করে ঠিকই কিন্তু তাদের এক জনও জীবিত থাকে না। মুসলিম অশ্বারোহীরা পদাতিকহ রোমীয়দের উপর ঘোড়া নিয়ে চড়াও হয় এবং তাদেরকে জ্যান্ত পিষে মারতে থাকে। যেখানে স্থান প্রশস্ত ছিল, সেখানে রোমীয়রা দৃঢ়পদে মোকাবেলা করে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের তথ্য মতে, সেখানে দু'পক্ষের দৌড়াদৌড়িতে এত বেশি ধুলা ছড়িয়ে পড়ে যে, ধুলায় চারদিক ছেয়ে যায়। ফলে এক পক্ষ অপর পক্ষকে চিনতে না পারায় রোমীয়দের হাতেই রোমীয়রা নিধন হতে থাকে।

এটা বড়ই ঘোরতর যুদ্ধ ছিল। যুদ্ধ ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এ যুদ্ধে রোমীয়, ঈসায়ী আরব এবং তাদের সমমনা গোত্রগুলোর গণহত্যা চলে।

"ঘোড়া উঁচিয়ে তাদের উপর আছড়ে ফেল" এটা ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর হুংকার, "মুমিনীন! কুফরের দেয়াল ভেঙ্গে ফেল এবং কাফেরদেরকে পিষে ফেল।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়। যখন মুসলমান অশ্বারোহীরা তাদের ঘোড়ার লাগামে টান দিত, তখন ঘোড়া সামনের পা উঁচিয়ে কাফেরদের মাথার উপর পড়ত এবং যখন ঘোড়া তার পা গুটিয়ে নিয়ে আসত, তখন তাতে দু'একজন রোমীয় থেতলে যেত। এটা ছিল রোমীয়দের বিরাট গণহত্যা। রোমীয়রা যুদ্ধে টিকতে না পেরে রিকাদ উপত্যকার দিকে পালাতে থাকে। সেখানে কিছু দূর এগুতেই হযরত যাররার (রা.)-এর বাহিনী তাদেরকে তীর-বর্শা মেরে মেরে চালুনী বানিয়ে দিত আর তারা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে এসে পড়ত।

মুসলমানরা এই বিজয় অর্জন করার জন্য বহু জান কুরবানী করেছিল আর যারা মারাত্মক আহত হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে সারা জীবনের জন্য প্রতিবন্ধী হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে মুসলিম রমণীরাও লড়েছিল। মহিলারা

পলায়নপর পুরুষদের ধমক দিয়ে পলায়ন হতে প্রতিহত করেছিল। এবার যে শত্রুরা ইসলামকে চিরদিনের জন্য উৎখাত করার ইচ্ছায় দেড় লাখ সৈন্য নিয়ে এসেছিল, তারা বিরাট ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল। রিকাদ উপত্যকা তাদের জন্য মৃত্যুর উপত্যকায় পরিণত হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ঐ দোয়া কবুল করেছিলেন, যা তারা রাত জেগে জেগে করেছিল এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করেছিল। তারা একটি আয়াত বারবার পড়ছিল :

"অনেকবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আল্লাহর ইচ্ছায় বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যশীল ও অটল-অবিচলদের সঙ্গে থাকেন।"

পরে রণাঙ্গনের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, রোমীয়দের থেকে আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিল, যা মুসলমানদের উচ্চকিত নারাধ্বনির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিল। উপত্যকায় গভীর অনেক পরিখা ছিল, কতক রোমীয় সেসব পরিখায় পড়ে যায় এবং অত্যন্ত করুণভাবে মৃতুমুখে পতিত হয়।

✪✪✪

ইয়ারমুক যুদ্ধের ৬ষ্ঠ এবং শেষ দিনের সূর্য রণাঙ্গনের উড়ন্ত ধুলা-বালুতে ডুবে গিয়েছিল। ময়দান ছিল রক্তে লাল। মশাল জ্বলে ওঠে এবং রোমীয়দের লাশের মাঝে ঘুরতে থাকে। এটা ছিল মুসলমানদের মশাল। তারা তাদের শহীদ ভাই ও আহত সঙ্গীদের খুঁজে ফিরছিল এবং গণীমতের মালও এক স্থানে জমা করছিল। তাঁবুতে জয়ের সংবাদ পৌঁছলে মহিলারাও চলে আসে। তারা কয়েক পক্ষের লোকজনকে খুঁজে ফিরছিল।

"তুমি জান্নাতী" একটু পরপর কোনো না কোনো মহিলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, "তুমি জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছ।"

মুসলিম মহিলারা রণাঙ্গনে ঘুরছিল। যখন তারা কোনো শহীদকে পাচ্ছিল, তখন এই কথা বলছিল।

নিয়মিত যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর যুদ্ধ তখনও অব্যাহত ছিল। সারা রাত মুসলমানরা শহীদ, আহত এবং মালে গণীমত নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর ব্যস্ততা ছিল ভিন্ন ধরনের। তাঁর যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। তিনি যেসব জীবিত রোমীয়দের বন্দী করেছিলেন, তাদের থেকে জানতে চেষ্টা করছিলেন যে, তাদের প্রধান সেনাপতি মাহান, যে আর্মেনীয় সৈন্যদের বাদশাও ছিল সে কোন দিকে গিয়েছে। বেশির ভাগ বন্দীদের এই তথ্য জানা ছিল না। পরিশেষে তিনি জানতে পারেন যে, ইস্তে কিয়ার পথ ধরে মাহানকে দামেস্কের দিকে যেতে দেখা গেছে। তার সঙ্গে রয়েছে তার বডিগার্ড বাহিনী, যাদের সংখ্যা ছিল দুই হাজার।

পরদিন সকাল হতেই হযরত খালিদ (রা.) তাঁর নির্বাচিত অশ্বারোহী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মাহানের খোঁজে রওনা হন। ততক্ষণ মাহান দামেস্কের কাছাকাছি পৌঁছেছিল। তার ধারণাও ছিল না যে, মুসলমানরা এত দূরে তার পশ্চাদ্ধাবন আসতে পারে। সম্ভবত এই কারণে সে খুবই শান্তভাবে পথ চলছিল। তার মনে কোনো ভয় কিংবা উদ্বেগ ছিল না। রাতে সে নিশ্চিন্তে যাত্রা বিরতি করেছিল এবং ভোরে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল।

"মহামান্য বাদশা!" তার সঙ্গী এক সৈন্য তাকে বলে, "ঐ দেখুন, ধুলা-বালু উড়ছে। মনে হচ্ছে কোনো সৈন্যদল হবে।"

"নিজেদেরই দলের লোক হবে" মাহান বলে, "তাদের ধুলা-বালু দেখ না, যারা যুদ্ধের ময়দানের ধুলা-বালু হতে পালিয়ে এসেছে। এরা পরাজিত হয়ে এসেছে।"

অতঃপর তাদের মাঝে নীরবতা নেমে আসে। মাহানের মাথার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। সে কারো সঙ্গে কথা বলছিল না। তার আফসুসের কারণ শুধু এই ছিল না যে, সে পরাজয় বরণ করেছিল; বরং বড় কারণ ছিল, সে খুব কম সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করে পরাজিত হয়েছিল। সে মুসলমানদের পিষে ফেলার দাবী করেছিল কিন্তু এখন সে ইন্তেকিয়া যাওয়ার পরিবর্তে দামেস্ক যাচ্ছিল। ইন্তেকিয়ায় রোম সম্রাট হিরাকেল ছিল। মাহান পরাজিত হয়ে তাকে মুখ দেখাতে চাচ্ছিল না।

যেসব অশ্বারোহীদের ধুলা-বালু দেখা গিয়েছিল একটু পরে তাদের ঘোড়ার পদশব্দের খটখট আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, যা অতি দ্রুত কাছাকাছি আসছিল। মাহানের দৃষ্টি পেছনে ছিল না। সে আগন্তুকদেরকে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা তাদেরই পক্ষের সৈন্য মনে করছিল।

অশ্বারোহীরা কাছাকাছি এসে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের অবরুদ্ধ করতে শুরু করে। এর পাশাপাশি একটি হুংকার শোনা যায় :

انا فارس الضديد

انا خالد بن الوليد

আমি পারস্যদের যমদূত
আমি খালিদ বিন ওলীদ।

এই হুংকার শুনে মাহান চমকে ওঠে। তার সঙ্গে নিজের দুই হাজার বডিগার্ড শুধু ছিল না; বরং আর্মেনীয় নিয়মিত কিছু সৈন্য এবং কিছু ঈসায়ী আরবও ছিল। সে দ্রুত সবাইকে লড়াইয়ের বিন্যাসে বিন্যস্ত করে এবং নিজে কিছু বডিগার্ড নিয়ে এক দিকে সরে যায়।

হযরত খালিদ (রা.)-কে জানানো হয়েছিল যে, মাহানের সঙ্গে কেবল তার বডিগার্ড বাহিনী রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার সঙ্গে দ্বিগুণের থেকেও বেশি সৈন্য ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ঘেরাও অবস্থা অব্যাহত রেখে আক্রমণ করেন। মাহানের সৈন্য দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করে। কিন্তু মুসলমানরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ তাজদমের মত ছিল। এটা ছিল বিজয়ের খুশির প্রতিক্রিয়া।

ইতিহাস ঐ মুজাহিদের নাম সংরক্ষণ করেনি, যে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে আস্তে আস্তে মাহানের কাছে চলে গিয়েছিল। সে মাহানের বডিগার্ডদের বলয় ভেঙ্গে ফেলে এবং মাহানকে হত্যা করে। সে মুজাহিদ নিজেও আহত হয়। কিন্তু সে মাহানকে হত্যা করে মুসলমানদের কাজকে সহজ করে দেয়। নিজেদের বাদশা এবং প্রধান সেনাপতিকে মরতে দেখে তার পক্ষের সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিতে শুরু করে এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে আস্তে আস্তে পালাতে থাকে। পেছনে তারা বহু লাশ এবং মূল্যবান ঘোড়া ফেলে রেখে যায়।

দামেস্ক বেশি দূর ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) দামেস্ক অভিমুখে রওনা হন। এটা তাঁর আরেকটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ছিল। দামেস্ক মুসলমানদের অধিকারে ছিল। কিন্তু রোমীয়দের বিরাট বাহিনী দেখে মুসলমানরা দামেস্ক শহরকে হস্তমুক্ত করে দিয়েছিল।

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "দামেস্কের দরজা আবারও আমাদের জন্য খুলে যাবে।"

আশা ছিল না যে, বাস্তবেই এমনটি হবে। হওয়ার কথাও ছিল না। কেননা, এটা ভাবনার বাইরে ছিল যে, মুসলমানদের চলে যাবার পরও রোমীয়রা এই গুরুত্বপূর্ণ শহরের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে না।

হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা যখন দামেস্কে পৌঁছে, তখন প্রাচীরের উপর থেকে কেউ জানতে চায় যে, তোমরা কারা?

"তোমরা কি চিনছ না যে, আমরা যদিও তোমাদের শাসক ছিলাম কিন্তু দেশ ছিল মূলত তোমাদেরই?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তোমরা কী এমন কথা বলতে না যে, রোমীয়দের থেকে মুসলমানরা ভাল? ... খোদার কসম! আমরা রোমীয়দেরকে চিরতরে খতম করে এসেছি।"

"মুসলমানরা এসে গেছে" এটা ছিল একটি শ্লোগান, যা দেয়ালের উপর উচ্চকিত হয় অতঃপর এই আওয়াজ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

শহরের বড় দরজা খুলে যায় এবং শহরবাসীদের একটি বড় দল বেরিয়ে আসে। জনগণ দু'হাত বাড়িয়ে মুসলমানদের অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রফুল্লচিত্তে আনন্দ উদযাপন করে। তারা সসম্মানে হযরত খালিদ (রা.) এবং তাঁর

অশ্বারোহী বাহিনীকে শহরে নিয়ে যায়। এটা ঐ ভাল ব্যবহার এবং মার্জিত আচরণের ফসল ছিল, যা মুসলমানরা দামেস্কবাসীর সঙ্গে করেছিল। মুসলমানরা এই কৃতিত্বও প্রদর্শন করেছিল যে, দামেস্ক হতে বিদায় গ্রহণের পূর্বে শহরবাসীদের থেকে উসুলকৃত করও ফেরত দিয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.) দামেস্কে অবস্থান করতে পারছিলেন না। তাকে এখনই ইয়ারমুক যাওয়ার এবং জয় পরবর্তী করণীয় বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি দামেস্কে এক মুহূর্তকাল দেরী না করে তখনই ইয়ারমুকের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

সিরিয়া হতে রোম সাম্রাজ্যের পাততাড়ি উঠে গিয়েছিল। কিছু দিন পর সম্রাট হিরাকেল ইন্তেকিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর বর্তমান ঠিকানা হয়েছিল কুসতুনতুনিয়া। ঐতিহাসিক বালাজুরী ও তবারী লিখেছেন যে, সম্রাট হিরাকেল যখন ইন্তেকিয়া হতে রওনা হন তখন তিনি কিছু দূর গিয়ে যাত্রা বিরতি করে পেছন পানে তাকান।

"হে সিরিয়া!" তিনি আফসুসের সঙ্গে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলেন, "এই হতভাগার বিদায়ী সালাম গ্রহণ কর, যে তোমাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে কখনো রোমীয়রা এ এলাকায় এলেও তাদের উপর তোমার ভীতি প্রবল থাকবে। ... কত সুদর্শন ভূখণ্ড শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম!"

ইয়ারমুক যুদ্ধ সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিক এবং রণবিশেষজ্ঞগণ কিছু না কিছু অবশ্যই লিখেছেন। তবে এ ব্যাপারে সকলেই এক মত যে, এ যুদ্ধে মুসলমানরা একমাত্র হযরত খালিদ (রা.)-এর জ্ঞানগত বিবেক-বুদ্ধি এবং রণনৈপুণ্যে জয়লাভ করেছিল। অনেক চাল চেলে এবং রণকৌশল পরিবর্তন করে করে তিনি এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

এই অসম যুদ্ধে সর্বমোট চার হাজার মুসলমান শহীদ হন। আর আহত প্রায় সকলেই হয়েছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) নিজেও আহত হয়েছিলেন। রোমীয়দের নিহতের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। তবে বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের ঐক্যমত হলো, ৭০ হাজারের মত মারা গিয়েছিল। এ যুদ্ধ বিজয়ের ফলে ইসলামী সাম্রাজ্য সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

তারা সংখ্যায় খুব স্বল্প ছিল। তাদের হাতিয়ার শত্রুদের তুলনায় নিম্ন ছিল। তাদের আসবাবপত্র এত সীমিত ছিল যে, তারা স্বদেশ হতে অনেক অনেক দূরে ছিল। মদদের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কোনো স্থান হতে তাদের উপকার লাভ কঠিন ছিল। শত্রু সংখ্যা ছিল পতঙ্গকুলের মত। তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ছিল উন্নত। তারা ছিল স্বদেশে। দেশ নিজেদের, কেল্লা নিজেদের ছিল। মদদের তাদের

কোনো শেষ ছিল না। তারা স্বদেশ হতে লাখ লাখ লোককে যুদ্ধ করার জন্য ময়দানে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু যারা সংখ্যায় কম ছিল এবং যারা লাগাতার কয়েক বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তারা তাদের শত্রুদের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, যারা কোথাও তিনগুণ এবং কোথাও চারগুণের চেয়েও বেশি শক্তিধর ছিল।

তারা কারা ছিল, যারা তৎযুগের সবচেয়ে পরাশক্তিধর শত্রুদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেছিল?

তারা ছিল মুসলমান।

তারা নামেমাত্র মুসলমান ছিল না।

তারা রণশক্তিকে আদম সংখ্যা এবং ঘোড়ার সংখ্যার দ্বারা নয়; বরং জযবা-প্রেরণা এবং ঈমান দ্বারা মাপতো।

এটা ছিল ঈমানী শক্তির কারিশমা-নৈপুণ্য যে, সিরিয়ায় রোম সাম্রাজ্যের ঝাণ্ডা নেমে গিয়েছিল। যে কেল্লাসমূহে এ ঝাণ্ডা পতপত করে উড়ত এখন সেসব স্থানে আজান ধ্বনিত হচ্ছিল।

ইয়ারমুক রণাঙ্গনে চার হাজার মুজাহিদ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে রোমীয়দের থেকে সিরিয়া দখল করে নিয়েছিল। সম্রাট হিরাকেল যিনি একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন এবং নিজের বাহিনীকে অজেয় বাহিনী মনে করতেন এমন করুণ অবস্থায় সিরিয়ার সীমান্ত হতে বেরিয়ে যাচ্ছিল যে, তিনি জবাবী হামলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে নীতিগতভাবে পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন।

তাঁর সৈন্যদের পলায়নের ধরন কোনো সুশৃঙ্খল এবং শক্তিধর বাহিনী মত ছিল না। তাঁর সেনাদলের অর্ধেকই নিহত হয়েছিল। আহতদের সংখ্যার কোনো হিসেব ছিল না। যারা লড়াই করার উপযুক্ত ছিল তারাও বিক্ষিপ্তভাবে পলায়ন করছিল। তাদের বেশিরভাগই বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তৎযুগে বায়তুল মুকাদ্দাসকে 'ইলা' বলা হত। এটা ছিল সর্বশেষ কেল্লা, যা রোমীয়দের হাতে রয়ে গিয়েছিল। দু'চারটি অন্যান্য কেল্লাও ছিল, যা তখনও রোমীয়দের অধিকারে ছিল। কিন্তু তা বায়তুল মুকাদ্দাসের মত বড় ছিল না। সেখানেও মুসলমান ত্রাস পৌঁছে গিয়েছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, শহরবাসী যখন দেখে যে, রোমীয়দের গৌরব রবি অস্তমিত প্রায়, তখন তারা রোমীয় সৈন্যদেরকে সাহায্য করতে কিংবা আশ্রয় দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। মুসলমানদের ব্যাপারে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে আপাদমস্তক বজ্র এবং কঠিন পাথরের মত আর শাসনের ক্ষেত্রে তারা রেশমের মত নরম।

যেসব ছোট ছোট কেল্লা পদানত করা হয়। কোথাও সামান্য বাঁধা আসে কিন্তু তা মুসলমানদেরকে প্রতিহত করতে পারে না। বাকী অন্যান্য কেল্লার

দরজা কোনোরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই খুলে যায়। শহরবাসী মুসলমানদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায় এবং কর আদায় করে দেয়। অবশ্য বায়তুল মুকাদ্দাস কিছুটা বড় শহর ছিল। আর শহরটি ছিল কেল্লা পরিবেষ্টিত। মজবুত দুর্গ ছিল। ফলে তা পদানত করা কঠিন মনে হচ্ছিল।

বায়তুল মুকাদ্দাসে রোমীয় সালার উতরুবুন ছিল। তার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে সমরশাস্ত্রে এবং রণবিদ্যায় হিরাকেলের সমপর্যায়ের ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে হিরাকেলের সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে অভিহিত করেছেন। মুসলিম গোয়েন্দা বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের আনীত তথ্য মোতাবেক উতরুবুন জাদরেল এবং নির্ভীক সালার ছিল। সে আমৃত্যু লড়াইকারী বীর যোদ্ধাও ছিল। বায়তুল মুকাদ্দাস রক্ষায় তার জন্য আমৃত্যু লড়াই করার বিকল্প ছিল না। কেননা ঐ ভূখণ্ডে রোমীয়দের শেষ এবং মজবুত কেল্লা ছিল এটিই।

আরেকটি স্থানও ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তার নাম কয়সারিয়া। এ দুর্গটিও বেশ মজবুত ছিল। ইয়ারমুক যুদ্ধ শেষে মুসলিম বাহিনী যাবিয়া এসে সেনা ছাউনী স্থাপন করে অবস্থান করতে থাকে। আহতদের সংখ্যা ছিল অস্বাভাবিক। আর যারা আহত ছিল না তারাও নতুন করে যুদ্ধে নামার যোগ্য ছিল না। তারা পূর্ব হতেই ক্লান্ত-শ্রান্ত ছিল। ইয়ারমুক যুদ্ধ তাদের মনোবল বৃদ্ধি করলেও শরীর ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। তাদের দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল এবং আহতদের সেবা-শুশ্রুষা এবং ব্যান্ডেজ বাধার প্রয়োজনীয়তা ছিল আরও বেশি। তাদের ক্ষত শুকিয়ে ভাল হওয়ার অপেক্ষা করা ছিল একান্ত জরুরী। অথচ অপেক্ষা করাটাও ছিল সাংঘাতিক।

রোমীয়রা এক যুদ্ধবাজ জাতি ছিল। তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলেও এত তাড়াতাড়ি এবং এত সহজে তারা পরাজয় স্বীকার করার মত ছিল না। বেশি আশংকা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে। কেননা সেখানে উতরুবুনের মত জাদরেল এবং অভীজ্ঞ সালার বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রোমীয় কিছু সৈন্য ছড়ানো-ছিটানো ছিল। গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিচ্ছিল যে, কোথাও কোথাও রোমীয়দের সালারও তাদের সঙ্গে আছে।

হযরত আবু উবায়দা (রা.)-সহ অন্যান্য সালারগণ এই আশঙ্কা অনুভব করছিলেন যে, রোমীয়রা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো স্থান হতে জবাবী হামলা করতে পারে।

"আমার বন্ধুগণ!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর সালারদের বলেন, রোমীয়রা অবশ্যই হামলা করবে। কিন্তু তাদের মাঝে এখন আগের সেই প্রেরণা ও জযবা নেই যে, তারা এখনই হামলা করবে। এছাড়াও তারা দূর-দূরান্তে

বিক্ষিপ্ত হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, তাদের এক জায়গায় হওয়ার জন্যেও অনেক সময়ের প্রয়োজন।"

বাস্তবতাও এমন ছিল যে, যেমনিভাবে মুসলমানদের মধ্যেও সামান্যতম লড়াইয়ের শক্তি ছিল না, তেমনিভাবে রোমীয়দের মাঝেও যুদ্ধ করার মত দৃঢ় মনোবল ছিল না। কেননা, প্রথমেই বলা হয়েছে যে, দেড় লাখ সৈন্যের মধ্যে ৭০ হাজার সৈন্য মারা গিয়েছিল। আর যারা জীবিত ছিল তাদেরও বেশিরভাগ ছিল আহত। গোয়েন্দা তথ্য এই ছিল যে, রোমীয়রা কোথাও জবাবী হামলার জন্য সংগঠিত হচ্ছে না। তবে তারা যে যেখানেই থাক না কেন সেখানে যুদ্ধ প্রতিহতের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

✪✪✪

৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মোতাবেক ১৫ হিজরীর শাবান মাসের এক দিন প্রধান সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর সালারদের তলব করেন।

"আমার বন্ধুগণ!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "বেশিরভাগ আহত মুজাহিদরা যুদ্ধ করার যোগ্য হয়ে গেছে। অন্যান্য সৈন্যরাও যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছে। আমরা আবার এর যোগ্য হয়ে গেছি যে, কোথাও গিয়ে চড়াও হব। দু'টি স্থান কব্জা করা খুবই জরুরী। একটি হলো কায়সারিয়া। আর দ্বিতীয় স্থান হলো, বায়তুল মুকাদ্দাস। তোমরা কী বলতে পার, এই দুই স্থানের মধ্যে হতে কোথায় আমরা আগে আক্রমণ করব?"

এই বিষয়ে আলোচনা হলে সালারদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। এক পক্ষ বলে, উভয় স্থানই প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে সুদৃঢ়। তাই তাদের উপর পর্যায়ক্রমে হামলা করা হোক। কেউ কেউ মন্তব্য করে, উভয় স্থানই এক সঙ্গে অবরোধ করা হোক। হযরত আবু উবায়দা (রা.) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

"এটা কী ভাল হয় না যে, আমরা আমীরুল মুমিনীনের কাছে জিজ্ঞাসা করব যে, আমরা কায়সারিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যে কোন স্থানে আগে অবরোধ করব?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমি আপনাদের সকলের প্রেরণা ও অভিমতকে মূল্যায়ন করছি। এর প্রতিদান আল্লাহ আপনাদের দিবেন। আমি কারো মনোবল নিজ মুখে ভাঙ্গতে চাই না। আলহামদুলিল্লাহ! শত্রুরা এই ভূখণ্ড হতে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের বিজয় পরিপূর্ণ করতে হবে। আমি এটাই ভাল মনে করছি যে, আমরা দূত মদীনায় পাঠিয়ে আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি ও নির্দেশ চাইব।"

সকল সালার হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তৎক্ষণাৎ এক দ্রুতগামী দূত মদীনায় এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করা হয় :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর দরবারে সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ এর পক্ষ হতে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সকল আনুগত্য আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে যে বিশাল বিজয় দান করেছেন, তা ভবিষ্যত প্রজন্মদের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে। সমস্ত বিজয়ের তথ্য গণীমতের মালসহ মদীনায় পাঠানো হচ্ছে। বর্তমানে আমরা যাবিয়া নামক স্থানে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করছি।

আল হামদুলিল্লাহ! ইতিমধ্যে আহতরা সেরে উঠেছে এবং যুদ্ধের যোগ্য হয়ে গেছে। এখন দরকার হলো সামনে অগ্রসর হওয়া এবং রোমীয়দেরকে সিরিয়ার ভূখণ্ড হতে চিরদিনের জন্য উৎখাত করে দেয়া। আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিনা যে, আমরা কায়সারিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্য হতে কোন স্থানকে প্রাধান্য দিব। আমীরুল মুমিনীন বরাবর আমরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

যাবিয়া হতে মদীনার দূরত্ব প্রায় এক মাসের মত ছিল। দূতের যাওয়া-আসার জন্য কম করে হলেও বিশ দিনের প্রয়োজন ছিল। এই মধ্যবর্তী সময়ে আহতরা আরও সুস্থ হয়ে ওঠে। আর যারা সুস্থ ছিল তারা আরও বেশি বিশ্রাম এবং প্রস্তুতি নেয়ার অধিক সুযোগ পায়।

বায়তুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে যেমন পরাজয়ের আক্ষেপ, লজ্জা এবং ভীতি আচ্ছাদিত ছিল, তেমনি জোশ-প্রেরণাও কম ছিল না। এটা ছিল রোমীয় সালার উতরুবুনের সৃষ্টি। সে তখনও পর্যন্ত মুসলমানদের মুখোমুখি হয়েছিল না। সে শুনেছিল এবং ভাল করেই শুনেছিল যে, রোমীয় সৈন্যরা মুসলমানদের মোকাবেলায় একটি রণক্ষেত্রেও টিকতে পারেনি। কিন্তু উতরুবুন নিজেকে নিজে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী বানিয়ে রেখেছিল যে, সে অবশ্যই মুসলমানদের বায়তুল মুকাদ্দাসে পরাজিত করে ছাড়বে। সে মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য পরিকল্পনা তৈরী করা শুরু করে এবং এর সুবাদে একবার সে কয়সারিয়া যায়।

কয়সারিয়ায় সে সালার এবং সৈন্যদের ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পায়। "মনে হচ্ছে, তোমরা লড়াই করার পূর্বেই পরাজয় মেনে নিয়েছ" উতরুবুন কয়সারিয়ার সালারকে বলে, "অথচ আমি তোমাদের মুসলমানদেরকে পরাজিত করার জন্য তৈরী করতে এসেছি।"

"যদি হিরাকেল পালিয়ে যায় তবে আমরা তাদের মোকাবেলায় টিকতে পারব না" কয়সারিয়ার সালার বলে, "যে সৈন্য আমার অধীনে আছে তাদের

উপর ঐ সিপাহীদের প্রভাব পড়েছে যারা ইয়ারমুক থেকে পালিয়ে এখানে এসেছে। ... তারা এখনও আসছে। জানি না, তারা কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আসছে। তাদের চেহারা, চোখ এবং কথাবার্তা ভীতিজনক।"

"কাপুরুষ!" উতরুবুন উপহাসের ভঙ্গিতে বলে, "যুদ্ধ হতে পালিয়ে আসা সৈন্য এবং সালাররাও এমন ধরনের কথা বলে। তারা শত্রুদের জ্বিন এবং প্রেতাত্মা বলে সাব্যস্ত করে, যাদের তারা মোকাবেলাই করতে পারে না। ... আপনারা কী আমাকে এই পরামর্শ দিতে চান যে, হিরাকেলের মত আমরাও মুসলমানদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করি? আপনাদের বিবেকের উপর এমন পর্দা পড়ে গেছে যে, আপনারা এটা ভাবারও যোগ্য নন যে, হিরাকেলের অনুপস্থিতিতে আমার নির্দেশ চলে এবং আপনারা আমার নির্দেশের অধীন। আপনারা যাই বলুন না কেন আমরা লড়ব।"

"আমি আপনাকে সৈন্যদের অবস্থা তুলে ধরেছি মাত্র" কয়সারিয়ার সালার বলে, "এটা বলি নাই যে, আমরা পালিয়ে যাব। আপনি নির্দেশ দিন। সৈন্যরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আপনি আমাকে যুদ্ধের ময়দানে দেখবেন।"

"সৈন্যদের লড়াই করানো আপনার দায়িত্ব" উতরুবুন বলে, "আপনি আর যা কিছু বলেছেন, সেটা বড় বীরের কথা। হিরাকেল আরব মুসলমানদের আরবের বদ্দু এবং মরুদস্যু বলেছিল। তাঁর সালারাও এ কথা বলতে বলতে মুসলমানদের হাতে মারা যায় যে, একজন মুসলমানকেও জীবিত ফিরে যেতে দিব না। নির্দেশ হলো এবং এটা বর্তমান পরিস্থিতিরও দাবী যে, স্বীয় বাহিনীকে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করুন। মুসলমানরা অবশ্যই বায়তুল মুকাদ্দাসে আক্রমণ করবে। আপনাদের কাজ হবে, যখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করবে, তখন তাদের অবরোধ করবেন। আপনাদের কাছে সৈন্যের কমতি নেই। যদি আপনারা পূর্ণাঙ্গভাবে মুসলমানদের অবরুদ্ধ না করতে পারেন, তাহলে পেছন হতে তাদের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ করতে থাকবেন। আমি আমার বাহিনী শহরের বাইরে পাঠিয়ে এমন মারাত্মক হামলা করব যে, শত্রুরা ভালভাবে দাঁড়াতেও পারবে না। পশ্চাতে আপনি থাকবেন। এরপর দেখবেন, এই হতভাগারা কোন দিকে পালিয়ে যায়।" এরপর উতরুবুন আপন মনে বলে, "মুসলমানরা ক্লান্তিতে শেষ হয়ে গেছে। তাদের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজারের মত হ্রাস পেয়েছে। এবার তাদের পরাজিত করা কঠিন হবে না।"

"আর যদি তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে না গিয়ে কয়সারিয়ায় আসে, তাহলে ...?"

"তবে আমি আপনাদের সাহায্যে আসব" উতরুবুন বলে, "এবং আমি আপনাদের সাহায্য সেভাবে করব, যেভাবে আমি আপনাদেরকে আমার সাহায্য করতে বলেছি।"

তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, দু'জনের যারই উপর হামলা হোক না কেন, তখন অপরজন তার সাহায্যে চলে আসব। উতরুবুন নিশ্চয়ের সঙ্গে বলে যে, মুসলমানরা আগে বায়তুল মুকাদ্দাসই আক্রমণ করবে।

✪✪✪

যখন মুসলমানরা সিরিয়া কব্জা করে নিয়েছিল এবং হিরাকেল সিরিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং মুসলমানরা ফিলিস্তিন অধিকার করার উপক্রম হয়েছিল, তখনকার সময়ের ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতভিন্নতা পাওয়া যায়। কেউ কেউ ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছেন। যুদ্ধের ধারাবাহিকতার মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ করেছেন। কারো লেখায় নিহতদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন দেখা যায়। তারা রোমীয় এবং মুসলমানদের সঠিক সংখ্যাও লেখেননি।

আফসুসের সঙ্গে বলতে হয় যে, বেশিরভাগ অমুসলিম ঐতিহাসিক সত্য-সঠিক ঘটনা তুলে ধরেছেন এবং মুসলমানদেরকে ধন্যবাদও দিয়েছেন। কিন্তু কতিপয় মুসলিম ঐতিহাসিক এবং পরবর্তী যুগের ইতিহাস রচয়িতা নিজ নিজ মাজহাবী টানে পক্ষপাতিত্ব করেছেন এবং এক ঘটনাকে অপর ঘটনার মাঝে গুলিয়ে ফেলেছেন। তাদের মাথায় পক্ষপাতিত্বের যে ভূত সওয়ার হয়েছিল তা তারা আমীরুল মুমিনীন এবং মুজাহিদদের উপরও প্রয়োগ করেন। যেমন, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে বরখাস্ত করে মদীনায় তলব করেছিলেন। আমরা এর যথার্থ কারণ সামনে গিয়ে বলব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর অন্তরে হযরত খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আক্রোশ ও ক্ষোভ ভরা ছিল। এর দ্বারা এই ঐতিহাসিক এটা প্রমাণ করতে চান যে, হযরত উমর (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ততটা উচ্চাঙ্গের ছিল না যেমনটি উল্লেখ করা হয়।

আমরা যেহেতু শুধু হযরত খালিদ (রা.)-এর জীবনী বর্ণনা করছি, সেহেতু তাদের আলোচনা বেশি করব না, যাদের সম্পর্ক হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে নেই।

কয়েকজন ঐতিহাসিক এবং পরবর্তী ইতিহাস রচয়িতাদের লেখার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হলে উল্টা-পাল্টা কিছু তথ্য ছাড়া আর কিছুই মেলে না। যেমন এক দিকে একটি তথ্য এই পাওয়া যায় যে, প্রধান সেনাপতি হযরত আবু

উবায়দা (রা.) আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর কাছে দূত মারফৎ এটা জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি প্রথমে কায়সারিয়ার প্রতি মনোযোগী হবেন, না বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি। আর অপর দিকে কিছু ইতিহাস রচয়িতা এমন আছেন, যারা লিখেছেন, হযরত আমর বিন আস (রা.) আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর কাছে এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, আমরা আগে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর হামলা করব না কি করব? আরেক ইতিহাস রচয়িতা লিখেছেন, আমীরুল মুমিনীন বায়তুল মুকাদ্দাস হতে সামান্য দূরে কোনো এক স্থানে ছিলেন।

অথচ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, আমীরুল মুমিনীন তখন মদীনাতেই ছিলেন। সেখানেই তিনি বিভিন্ন রণক্ষেত্রের রিপোর্ট পাচ্ছিলেন। মালে গণীমত বিভিন্ন এলাকা হতে আসতে থাকে। আমীরুল মুমিনীন নিজ হাতে তা বন্টন করেন এবং তিনি সকল সালারদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠান।

✪ ✪ ✪

প্রধান সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা (রা.) যে দূত মদীনায় পাঠিয়েছিলেন তিনি খুব দ্রুতগামী ছিলেন। সেকালে দূতদের গতি এ কারণে বেশি দ্রুততর হত যে, পথিমধ্যে ঘোড়া পরিবর্তন করার ব্যবস্থা থাকত। আর তখন তো সিরিয়ার পুরো ভূখণ্ড মুসলমানদের কজায় ছিল। ফলে দূত মাত্র পনের দিনের মধ্যেই আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ বার্তা নিয়ে আসেন।

আমীরুল মুমিনীন লিখেছিলেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাস সর্বাগ্রে বিজয় হওয়া চাই। তবে তা অবরোধ করার পূর্বে রোমীয়দের মদদের রাস্তা বন্ধ হওয়া জরুরী। হযরত উমর (রা.)-এর এ তথ্যও জানা ছিল যে, কয়সারিয়ায় রোমীয় সৈন্য অধিক হারে বিদ্যমান। যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের সব ধরনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। হযরত উমর (রা.) মদীনায় থাকলেও তাঁর এ কথা জানা ছিল যে, কায়সারিয়া পর্যন্ত রোমীয়দের অতিরিক্ত সৈন্য সমুদ্র পথে আসতে পারে। তাই খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) প্রধান সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে নির্দেশ পাঠান যে, কায়সারিয়ার সেনাছাউনী খতম করা জরুরী।

আমীরুল মুমিনীন তাঁর নির্দেশ এবং নির্দেশনায় এটাও লিখেন যে, তিনি ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, সে তাঁর ভাই মুয়াবিয়াকে কয়সারিয়া অবরোধ করতে এবং রোমীয়দের ঐ মজবুত ও ভয়ঙ্কর দুর্গ জয় করার জন্য যেন তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেয়। যাতে বায়তুল মুকাদ্দাসের

রোমীয় সৈন্যরা কায়সারিয়া হতে এবং কায়সারিয়ার সমুদ্র পথে মদদ না পেতে পারে। এতে আরও লাভ হলো, কায়সারিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ঐ নির্দেশনামায় এটাও লিখা ছিল যে, কায়সারিয়া পদানত করেই অনতিবিলম্বে আবু উবায়দা বায়তুল মুকাদ্দাসে আক্রমণ করবে।

মদীনা হতে এভাবে বিভিন্ন সালার পর্যন্ত যে নির্দেশনা পাঠানো হয়, সে অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কায়সারিয়া অবরোধ করেন। সেখানকার রোমীয় সালারের আশা ছিল যে, উতরুবুন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। এ আশানুপাতে সে মুসলমানদের নিজের দিকে নিবদ্ধ রাখার এই কৌশল অবলম্বন করে যে, বিক্ষিপ্ত দল দূর্গের বাইরে পাঠিয়ে হামলা করাতে থাকে।

এ সকল হামলার ধারাবাহিকতা ও ধরন কিছুটা এমন ছিল যে, অবরোধ নামেমাত্র ছিল। কেল্লার বইরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। রোমীয়দের হামলা করার ধরন এমন ছিল যে, কেল্লার দু'তিনটি দরজা হঠাৎ খুলে যেত আর সে দরজা দিয়ে দুই-তিনটি দল বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবনের মত বাইরে আসত এবং মুসলমানদের উপর জোরদার আক্রমণ করত। কিছুক্ষণ লড়াই করে তারা পিছু হটে যেত এবং কেল্লায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত।

মুসলমানরা এই হামলার মোকাবেলা এভাবে করে যে, রোমীয় বাহিনী বাইরে এলে মুসলমানরা তাদের পশ্চাতে যেতে চেষ্টা করত। যাতে রোমীয়রা কেল্লায় ফিরে না যেতে পারে। পশ্চাতে যাওয়া এ কারণে আশংকাজনক ছিল যে, কেল্লার প্রাচীর হতে তাদের উপর তীর বর্ষিত হত। মুসলমানরা রোমীয়দের পার্শ্বভাগে চলে যেত এবং তীর বর্ষণ করে অনেক রোমীয়কে ধরাশায়ী করত।

এ পন্থায় রোমীয়দের এত ক্ষতি হয় যে, তারা লড়াই করার যোগ্য থাকে না। কায়সারিয়ার সালার উতরুবুনের কাছে এটা প্রমাণ করার জন্য যে, সে ভীরু-কাপুরুষ নয়, একবার নিজেই দুই-চারটি সৈন্যদল নিয়ে বাইরে আসে। মুসলমানদের উপর এমন হামলা কয়েকবার ইতিমধ্যে হয়েছিল, তাই এমন হামলা প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা তাদের হয়ে গিয়েছিল। এবার রোমীয় সালার নিজেই বাইরে এলে মুজাহিদ বাহিনী পূর্বের চেয়ে বেশি বীরত্ব জাহির করে। কয়েকজন মুজাহিদ রোমীয় সালারকে হত্যা করার জন্য সামনে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাকে হত্যা করা সহজসাধ্য ছিল না। সে বডিগার্ড পরিবেষ্টিত ছিল।

পরিশেষে মুসলিম ত্রাস তার কারিশমা দেখাতে শুরু করে। আর এমনটি হওয়ারও কথা ছিল। কেননা রোমীয়রা তাদের সাথীদের লাশের উপর পা রেখে লড়ছিল। ইতিপূর্বের হামলায় যারা মারা গিয়েছিল তাদের লাশ সেখানেই পড়ে ছিল। এসব লাশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। লাশের পচা গন্ধে বাতাস ভারী হয়েছিল।

মুসলিম ভীতি রোমীয়দের মাঝে পূর্ব হতেই ছিল। কিন্তু এবার তাদের সঙ্গে সালার নিজে থাকায় তাদের প্রেরণা কিছুটা চাঙ্গা হয়েছিল। কিন্তু যখন এক মুজাহিদের বর্শার আঘাতে সালার মারা যায়, তখন রোমীয়দের হিম্মত হঠাৎ নিভে যায়। রোমীয়রা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তারা কেল্লার দরজা খুঁজতে থাকে। দরজার কাছে আসলে দরজা খুলে যায়। এর থেকে মুসলমানরাও এই ফায়দা লাভ করে যে, তারাও রোমীয়দের সঙ্গে দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। এভাবে অনেক মুসলমান কেল্লার অভ্যন্তরে চলে যায়। ফলে কায়সারিয়া সহজে মুসলমানদের কব্জায় চলে আসে।

কায়সারিয়া এখন মুসলমানদের করতলে। এতে এই ফায়দা হয় যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের রোমীয়রা সমুদ্র পথে কায়সারিয়া হতে মদদ লাভের যেই সুযোগ ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। বায়তুল মুকাদ্দাস কায়সারিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

✪✪✪

কায়সারিয়ার সালার মনে এই আফসোস নিয়ে মরে যায় যে, উতরুবুন কথা দিয়ে কথা রাখেনি। সে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সাহায্য করতে আসেনি। তার জানা ছিল না যে, উতরুবুন কায়সারিয়ার অবরোধের কথা শুনেই স্বীয় বাহিনী নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস হতে রওনা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা আগেভাগেই জানত যে, কায়সারিয়া বাঁচানোর জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস হতে সাহায্য আসবে। তাই তারা এই সাহায্য বন্ধের ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিল। হযরত আমর বিন আস (রা.) তাঁর দুই সালার আলকমা বিন হাকীম এবং মাসরুক মক্কীকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাস হতে সৈন্য বের হলে তাদেরকে সেখানেই যেন প্রতিহত করা হয়।

এক গোয়েন্দা এসে জানায় যে, উতরুবুন স্বসৈন্যে আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হযরত আমর বিন আস (রা.) সালার আলকমা বিন হাকীম এবং সালার মাসরুক মক্কীকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে পাঠান এবং নিজে উতরুবুনের পশ্চাতে গমন করেন। কিন্তু আজনাদাইন পর্যন্ত কোনো রোমীয় বাহিনী তাঁর নজরে পড়ে না। অবশ্য মাটি বলছিল আজনাদাইনের দিকে সৈন্য গেছে। শহরের বাইরে কিছু লোকের সাক্ষাত পাওয়া যায়। তারা জানায় যে, রোমীয় সৈন্য এসেছিল এবং কেল্লায় প্রবেশ করেছে।

আজনাদাইন অন্যান্য শহরের মত কেল্লা পরিবেষ্টিত শহর ছিল। তার চতুর্দিকে প্রশস্ত পরিখা ছিল, যা পেরিয়ে যাওয়া ছিল দুঃসাধ্য। হযরত আমর বিন আস (রা.) কেল্লার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দেখেন। কেল্লা জয় করার কোনো লক্ষণ

দেখা যাচ্ছিল না। তিনি তার এক নায়েব সালারকে নিজের পক্ষ হতে দূত বানিয়ে সন্ধির বার্তাসহ কেল্লায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

"এটা জরুরী নয় যে, তুমি সন্ধি করেই আসবে" হযরত আমর বিন আস (রা.) দূতকে নির্দেশনা দিতে গিয়ে পরিশেষে বলেন, "আমি তোমাকে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য ভেতরে পাঠাচ্ছি। তুমি এটা অনুধাবন করার চেষ্টা করবে যে, ভেতরে কত সৈন্য আছে। এ ছাড়া আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে তাও করবে। তবে অবশ্যই এটা জানার চেষ্টা করবে যে, রোমীয় সালার উতরুবুনের মনোবল কেমন মজবুত।"

✪✪✪

দূত বডিগার্ডসহ কেল্লায় প্রবেশ করে। সে এক সময় ফিরে আসে এবং ফিরে এসে তার মন্তব্য জানায়। কিন্তু হযরত আমর বিন আস (রা.) তাঁর কথায় আস্থাশীল হতে পারেন না।

"তবে কি কাজটি আমি নিজেই করব?" হযরত আমর বিন আস (রা.) তাঁর সালারদের বলেন, "আমি যা জানতে চাই তা কেবল আমার চোখই দেখতে পারে।"

"ইবনুল আস!" এক সালার বলেন, "এর অর্থ কি এই নয় যে, আপনি সেখানে গিয়ে নিজেকে নিজে ঝুঁকির মুখে নিক্ষেপ করছেন?"

"খোদার কসম!" আরেক সালার বলেন, "ইসলাম আপনার মত সালার হাতছাড়া করার ক্ষতি সহ্য করতে পারবে না।"

"তোমরা কি মনে কর, উতরুবুন আমাকে বন্দী করে ফেলবে?" হযরত আমর বিন আস (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, "সে কি আমাকে হত্যা করবে?"

"পরাজিত শত্রু হতে বেশি ভাল কিছুর ধারণা না রাখা উচিত ইবনে আস!" এক সালার বলেন।

"আমি আমর বিন আসের রূপ ধরে যাব না" হযরত আমর বিন আস (রা.) বলেন, "আমি নিজের দূত হিসেবে যাব। আমাদের অবশ্যই এই কেল্লা পদানত করতে হবে। আমি এর জন্য যে কোনো সম্ভাব্য দিক পরীক্ষা করব।"

হযরত আমর বিন আস (রা.) বেশ-ভূষা পরিবর্তন করেন এবং এই ঘোষণা দেন যে, মুসলমানদের দূত সন্ধির শর্ত নির্ধারণ করার জন্য কেল্লার অভ্যন্তরে আসতে চায়। তার কথায় কেল্লার দরজা খুলে যায়। রোমীয়রা মজবুত তক্তা পরিখার উপর বিছিয়ে দিয়ে দূতকে পরিখা পার করায় এবং কেল্লার অভ্যন্তরে তাকে সালার উতরুবুনের কাছে নিয়ে যায়।

বহু ঐতিহাসিক ঘটনাটি লিখেছেন। তাদের বর্ণনামতে হযরত আমর বিন আস (রা.) নিজের বেশ-ভূষা বদলে ফেলেছিলেন। কিন্তু তার কথা বলার ভঙ্গি এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দু'এক কথা শুনে উতরুবুনের সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ লোক দূত হতে পারে না। হযরত আমর বিন আস (রা.) তার বেশ-ভূষা পরিবর্তন করতে সক্ষম হলেও সেনানায়কোচিত গভীর দৃষ্টি এবং পাণ্ডিত্য গোপন করতে পারেননি।

উতরুবুন অভিজ্ঞ সালার ছিলেন এবং তিনি মানুষও চিনতেন। সে এক বাহানা দেখিয়ে বাইরে যায় এবং তার বডিগার্ড বাহিনীর কমান্ডারকে ডেকে আনে।

"আমার সামনে বসা আরব মুসলমান এখনই ফিরে যাবে।" উতরুবুন তার কমান্ডারকে বলে, "এক বডিগার্ডকে রাস্তায় ওঁত পেতে রাখবে। আমি এই মুসলমানকে ঐ রাস্তা দিয়ে পাঠাব। এ লোক জীবিত ফিরে যাবে না। বডিগার্ড তাকে হত্যা করবে। এ লোক মুসলমানদের সালার আমর বিন আস। যদি সালার নাও হয় তবে আমর বিন আসের কোনো বিশেষ উপদেষ্টা অবশ্যই হবে এবং আমার বিশ্বাস হলো, আমর বিন আস এই উপদেষ্টার কথামত কাজ করে। যদি আজ তাকে আমি হত্যা না করি, তাহলে এর অর্থ হবে, আমি রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে গাদ্দারী করছি।"

ঐতিহাসিক লিখেন, যেভাবে উতরুবুন এক বাহানা দিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল, তাতে হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর সন্দেহ হয় তার নিয়ত সম্পর্কে। উতরুবুন ফিরে এলে হযরত আমর বিন আস (রা.) তার চেহারায় এবং কথায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখতে পান। এতেই তিনি বুঝে ফেলেন যে, উতরুবুনের নিয়ত খারাপ। ফলে তিনি কৌশল পরিবর্তন করেন।

"সম্মানিত সালার!" হযরত আমর বিন আস (রা.) বলেন, "আমরা দশজন সমর উপদেষ্টা আছি। আমরা উপদেষ্টা হিসেবে মুসলমানদের সঙ্গে এসেছি। আমি তাদের একজন। আমি আপনার শর্ত শুনেছি। আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তবে আমাদের সালার হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে আমি অবশ্যই পরামর্শ দিব। যেন তিনি আপনার শর্ত মেনে নেন। আমি আশাবাদী যে, আমার পরামর্শ তিনি গ্রহণ করবেন এবং বাড়তি রক্তক্ষয় হবে না।"

উতরুবুন ধোঁকা খেয়ে যায়। সে হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বডিগার্ড দলের কমান্ডারকে ইশারায় জানায় যে, এ লোককে হত্যা করার দরকার নেই। এভাবে হযরত আমর বিন আস (রা.) জীবিত অবস্থায় কেল্লা হতে বেরিয়ে আসেন। বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন, "উতরুবুন! আমিই আমর বিন আস!"

এরপরে আজনাদাইনের ময়দানে উভয় দলের মাঝে যে সংঘর্ষ হয় তা ইয়ারমুক যুদ্ধের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। আমরা এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না যে, উতরুবুন কেল্লা ছেড়ে বাইরে এসে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করেছিল এবং হযরত আমর বিন আস (রা.) নিত্য-নতুন কেমন চাল চেলে রোমীয়দের ব্যাপক প্রাণহানী ঘটিয়ে তাদেরকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেছিলেন।

উতরুবুন তার কিছু নির্বাচিত দলসহ পালিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে যায় এবং সেখানে গিয়ে কেল্লাবন্দী হয়ে যায়। আজনাদাইন যুদ্ধে মুসলমানদেরও অনেক প্রাণহানী ঘটেছিল।

✪✪✪

যখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) জানতে পারেন যে, কায়সারিয়া দখলে চলে এসেছে, তখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। সর্বাগ্রে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বিশেষ অশ্বারোহী দলটি সঙ্গে নিয়ে চলছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, উতরুবুন লড়াই করার যোগ্য নেই। তারপরেও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

বায়তুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরের চিত্র কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। যে উতরুবুন একদিন কায়সারিয়ার সালারকে 'ভীরু-কাপুরুষ' বলে হেয় করেছিল, সে আজ নিজেই বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রধান পাদ্রী আসকাফ সিফরীনুসের নিকট পরাজিতের মত বসে ছিল।

"সম্মানিত সালার!" সিফরীনুস তাকে বলে, "আমি এ ছাড়া আর কী করতে পারি যে, এই পবিত্র শহর মুসলমানদের হাতে তুলে দিব। এটা কি ভাল হয় না যে, এ কাজটি আপনি নিজ হাতে করুন।"

"না, সম্মানিত পিতা!" উতরুবুন বলে, "আমি এটা সহ্য করতে পারব না যে, মানুষ বলাবলি করবে, উতরুবুন মুসলমানদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছে।"

"আপনি কী এই শহরের পূতঃপবিত্রতার কথা ভুলে গেছেন?" সিফরীনুস বলে, "এটা সেই ভূখণ্ড যেখানে হযরত ঈসা (আ.)-কে শুলীতে চড়ানো হয়েছিল। আপনি কী অনুভব করেন না যে, এই পবিত্র ভূখণ্ডের মর্যাদা রক্ষায় আমাদের সমস্ত সৈন্য কুরবান করতে পারি?"

"আপনি কী সৈন্যদের অবস্থা দেখছেন না?" উতরুবুন বলে, "প্রায় অর্ধেক সৈন্য মারা পড়েছে অথবা মারাত্মক আহত হয়েছে। এই সৈন্যদের মনোবল পূর্ব হতে ভঙ্গুর ছিল। আমি বড় ঝুঁকির মধ্য দিয়ে কিছু সৈন্য আজনাদাইন থেকে বাঁচিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি।"

"সম্মানিত সালার!" আসকাফ সিফরীনুস বলেন, "এর অর্থ এই যে, আপনি মুসলিম সৈন্যদের উৎকৃষ্টতা মেনে নিয়েছেন। আপনি রোমীয়দের মহান সমর ঐতিহ্যকে মুসলমানদের পদতলে ছুঁড়ে মারছেন। আপনি তো কয়েকটি দিন মোকাবেলা করে দেখতে পারেন। মুসলমানরা আসমানের বাসিন্দা নয়। তারা অবশ্যই যুদ্ধে পারঙ্গম কিন্তু মানুষ তো বটে! তারা অবশ্যই ক্লান্তিতে শেষ হয়ে গেছে। আপনি মনোবল অটুট রাখুন। তারা এসে প্রথমে অবরোধ আরোপ করবে। এতে কয়েক দিন লেগে যাবে। এই মধ্যবর্তী সময়ে আপনি নিজের ও সৈন্যদের মনোবল সুদৃঢ় করবেন।"

মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। ওদিকে বায়তুল মুকাদ্দাসে রোমীয় সালার উতরুবুন নিজেকে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করছিল। কিন্তু তার সামনে সৈন্যদের করুণ অবস্থা যখন ভেসে উঠত, তখন তার যুদ্ধস্পৃহা খতম হয়ে যেত। তার উপর পাদ্রী আসকাফ সিফরীনুসের কথার বিশেষ প্রতিক্রিয়া পড়েনি। যখন পাদ্রী দেখেন যে, উতরুবুন নীতিগতভাবে পরাজয় মেনে নিয়েছে, তখন তিনি উতরুবুনকে জযবার কথা বলে উদ্দীপ্ত করতে এবং লজ্জা দিতে শুরু করেন। এর প্রভাব এতটুকু পড়ে যে, উতরুবুন মোকাবেলা করার ইচ্ছা পোষণ করে।

✪ ✪ ✪

ইসলামী ফৌজ পৌঁছে যায় এবং গিয়েই বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে। কেল্লার প্রাচীরের উপর অধিক সংখ্যক তীরন্দায এবং বর্শা নিক্ষেপকারী সৈন্য দণ্ডায়মান ছিল। তাদের অবস্থাই বলছিল যে, তারা মুসলমানদের কেল্লার কাছে ঘেঁষতে দিবে না। মুসলিম সেনাপতি কেল্লার চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন যে, কোথাও হতে পাঁচিল টপকানো যায় কি না অথবা এমন কোনো স্থানের সন্ধান মিলে কি না, যেখানে সুড়ঙ্গ করে ভেতরে যাওয়ার পথ বের করা যায়।

কোনো অনিবার্য কারণে অবরোধ পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল না। অবরোধ এক স্থানে খালি ছিল। মুসলমান সালার যখন দেখেন যে, দুর্গ সুরক্ষিত এবং তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর, তখন তিনি অবরোধকে দীর্ঘ করা সমীচীন মনে করেন। এভাবে অবরোধ দীর্ঘমেয়াদী হয় এবং অনেক দিন এভাবে গত হয়। এই সময়ে মুজাহিদরা কেল্লার প্রধান ফটকে চড়াও হয়, আহত হয় এবং জীবন কুরবানী দেন। কিন্তু পাঁচিলের উপর হতে আসা তীরের ঝাঁক এবং বর্শাসমূহ কোনো মুসলমানদের দরজা পর্যন্ত যেতে দেয় না।

পরিশেষে একদিন প্রধান ফটকের উপর হতে একটি উচ্চকিত আওয়াজ শোনা যায়।

"আপনাদের সালার সন্ধি করার জন্য এগিয়ে আসবেন?" পাঁচিলের উপর হতে ঘোষণা আসে, "আমরা আপনাদের শর্ত সম্পর্কে জানতে চাই।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এগিয়ে যান। হযরত খালিদ (রা.)-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি কারো দ্বারা এটা উচ্চ আওয়াজে শুনিয়ে দেন যে, সন্ধি শর্ত নির্ধারণের জন্য তোমাদের সালারকে বাইরে আসতে বল। মুসলমানদের পক্ষ হতে সেনাপতির এই কথা জানিয়ে দেয়ার কিছুক্ষণ পরে প্রধান পাদ্রী আসকাফ সিফরীনুস কতিপয় বডিগার্ডসহ কেল্লার প্রধান দরজা দিয়ে বাইরে আসেন। তাঁর সঙ্গে একটি বড় ক্রুশও ছিল।

"কোনো সালার কী উপস্থিত নেই?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) পাদ্রী আসকাফকে জিজ্ঞাসা করেন।

"সালার উপস্থিত আছেন" আসকাফ জবাবে বলেন, "কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস সেই শহর যার গুরুত্ব ও সম্মান কেবল আসকাফই জানে। যদি আমি না জানতাম তাহলে আমাদের ফৌজের শেষ সিপাহীও মারা যেত। এখান থেকে সন্ধির বার্তা আপনার কানে পৌঁছত না। আমি এই শহরকে রক্তের বন্যা হতে পবিত্র রাখতে চাই। রোমীয় সালার আমার আজ্ঞাবহ। আমি তাকে সন্ধি করার জন্য রাজি করিয়েছি। কিন্তু আমি আপনার শর্তসমূহ শোনার আগে নিজের একটি শর্ত পেশ করব। যদি সেটা আপনি মেনে নেন, তাহলে আমরা আপনার সমস্ত শর্ত মেনে নিব।"

"সম্মানিত পাদ্রী!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "এই শহরটি যেমনিভাবে আপনার কাছে পবিত্র, তেমনিভাবে আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র। এটা অসংখ্য নবী ও রসূলের শহর। আমরা আপনার ঐ সদিচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি যে, এই ভূখণ্ডের মর্যাদাকে রক্তক্ষয় হতে পবিত্র রাখা হবে। আপনি আপনার শর্ত বলুন।"

"সম্মানিত সেনাপতি!" পাদ্রী আসকাফ সিফরীনুস বলেন, "আমি জানি, আপনার শর্ত মোতাবেকই সিদ্ধান্ত হবে, তারপরেও আমি দরখাস্ত পেশ করছি যে, আপনি আপনাদের আমীরুল মুমিনীনকে এখানে আসার অনুরোধ করুন। আমি শর্ত তাঁর সঙ্গেই সম্পূর্ণ করব। আমি চাচ্ছি যে, এই শহরকে নিজের হাতে তাঁর হাতে তুলে দিব। পয়গাম্বরদের মাতৃভূমি হেতু এই শহর যেমনিভাবে আপনাদের তেমনিভাবে আমাদেরও।"

আসকাফ সিফরীনুস বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে এমন আবেগী কথা বার্তা বলেন যে, তাতে মুসলিম সেনাপতি গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তিনি আসকাফের এই শর্ত অনুমোদন করেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর

(রা.)-কে এখানে তাশরীফ আনার জন্য অনুরোধ করা হবে। আসকাফকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, আমীরুল মুমিনীন সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত করতে এখানে আসবেন।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.) এবং অন্যান্য সালারদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দেয়। মদীনা অনেক দূরে ছিল। শুধু যাওয়া কিংবা আসার জন্য প্রয়োজন ছিল এক মাসের। রোমীরদের পক্ষ হতে সন্ধি প্রস্তাব প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রোমীয়রা শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারছিল না। তাই তারা সন্ধির পথ বেছে নেয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুসলমান সালারদের সামনে সোজা পথ এই ছিল যে, তারা কেল্লার উপর যুৎসই হামলা করে তা দখল করে নিতেন। কিন্তু ইসলামী রীতি অনুযায়ী তারা শত্রু পক্ষকে নিরাপত্তা ও সন্ধির দিকে আসার জন্য পূর্ণ সুযোগ দেন। কুরআনের এই নির্দেশ বড়ই সুস্পষ্ট যে, দুশমন নত হলে তাদের সঙ্গে সন্ধি করা হবে। কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের আসার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন ছিল। সালারগণ এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা শুরু করেন।

"আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি" সালার হযরত শুরাহবীল (রা.) বলেন, "বায়তুল মুকাদ্দাসবাসী আমীরুল মুমিনীনকে কখনও দেখেনি। তাঁর দেহ ও গঠন কাঠামো অনেকটা ইবনে ওলীদের মত। দেখতে-শুনতেও দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। সময় বাঁচানোর স্বার্থে আমরা এটা করতে পারি যে, তিন-চার দিন পর ইবনে ওলীদকে আপনি নিজের সঙ্গে নিয়ে কেল্লায় যাবেন এবং বলবেন যে, ইনিই আমাদের আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব।"

"না" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "বায়তুল মুকাদ্দাসের পাদ্রী আসকাফ ইবনে ওলীদকে দেখেছেন। যদিও তাঁর সঙ্গে আমিই কথাবার্তা বলেছি এবং তার দৃষ্টি আমার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল, তিনি ইবনে ওলীদকে গভীরভাবে দেখেননি কিন্তু শহরের মাঝে এমন রোমীয় লোক বিদ্যমান থাকতে পারে, যারা কোনো রণাঙ্গনে ইবনে ওলীদকে ভালভাবে দেখেছে। যদি বাস্তবিকই এমনটি হয় আর এটা প্রকাশ পেয়ে যায় যে, আমরা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছি, তখন যে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে তার কথা একবার ভাব। যদি তখন কেউ একথা বলে ফেলে যে, এ লোক আমীরুল মুমিনীন নয়; বরং সে খালিদ বিন ওলীদ, যিনি যুদ্ধের ময়দানে এই নারাধ্বনি দেন, "আমি খালিদ বিন ওলীদ', তখন আমাদের মুখ থাকবে কী? আমার এই আশংকা ঠিক নয় কী?"

"এমন হতে পারে আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "এবং এটাও হতে পারে যে, আসকাফ অথবা কোনো রোমীয় সালার বলবে যে, মদীনা

হতে আপনাদের আমীরুল মুমিনীনকে হাজির করার শর্ত দিয়ে তলে তলে নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছে। এটা তাদের কালক্ষেপণের একটি কৌশল মাত্র।"

"আমরা এর ঝুঁকি নিতে পারি ইবনে হাসানা!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "কিন্তু তাই বলে আমরা ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারি না। এমনটি করলে তাতে ইসলামের গায়ে কলঙ্ক লাগবে।"

দু'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.)-এর পরামর্শক্রমে হযরত খালিদ (রা.)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গিয়ে আসকাফ সিফরীনুসকে বলা হয়েছিল যে, ইনি আমাদের আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং হযরত উমর (রা.)-এর পরিবর্তে হযরত খালিদ (রা.) হযরত উমর সেজে সন্ধিনামা চূড়ান্ত করেছিলেন। কিন্তু সামনের ঘটনাসমূহ এই তথ্যকে প্রত্যাখ্যান করে। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত উমর (রা.)-কে মদীনা হতে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি অনুরোধ পেয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এক দ্রুতগামী দূত মদীনায় প্রেরণ করেন। বার্তায় সে কথাই লেখা হয়, যা বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রধান পাদ্রী আসকাফের সঙ্গে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর হয়েছিল। বার্তা মদীনায় পৌঁছলে সেখানে আনন্দ-খুশির প্লাবন নামে। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.)-এর আনন্দের শেষ ছিল না। তিনি বিশেষভাবে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করতে। হযরত উমর (রা.) বিজয়ের শুভসংবাদ শোনার অপেক্ষায় ছিলেন।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর প্রেরীত বার্তা মসজিদে নববীতে নিয়ে যান এবং জনাকীর্ণ মসজিদে তা পড়ে সবাইকে শোনান।

"আপনারা আমাকে কী পরামর্শ দেন?" হযরত উমর (রা.) উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমার যাওয়া উচিত না কি না যাওয়া উচিত?"

"না যাওয়াই ভাল আমীরুল মুমিনীন!" হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বলেন, "আপনি না গেলে তা রোমীয়দের এই বার্তা দিবে যে, আপনি তাদেরকে কোনো গুরুত্ব দেননি এবং আপনি এত শক্তিধর যে, তাদের সন্ধির কোনো মূল্য আপনার কাছে নেই। এর ফল এই হবে যে, রোমীয়রা আমাদের মোকাবেলায় নিজেদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং কর প্রদান করে আমাদের অনুগত হয়ে যাবে।"

"আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন ইবনে আফফান!" হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর রায়ের প্রতি দ্বিমত পোষণ করে বলেন, "আমীরুল মুমিনীনের যাওয়াটাই শ্রেয় হবে। আপনি কী জানেন না, মুজাহিদগণ কতদিন ঘর ছাড়া? কত দিন যাবত তারা শীত, গরম, অন্ধকার, বর্ষা এবং তুফানের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে কালাতিপাত করছে? জীবন কুরবানী দিচ্ছে। আহত হচ্ছে। যদি আমীরুল মুমিনীন তাদের কাছে যান তাহলে তাদের ভেঙ্গে পড়া মনোবল সতেজ হবে। তাদের প্রেরণা চাঙ্গা হয়ে যাবে।"

"অবশ্যই, অবশ্যই!" কিছু লোকের সমর্থনসূচক আওয়াজ শোনা যায়।

"আমীরুল মুমিনীন না গেলে রোমীয়রা কেল্লার অভ্যন্তরে সংরক্ষিত অবস্থায় বসে থাকবে" হযরত আলী (রা.) বলেন, "তাদের সাহায্যও মিলে যেতে পারে। তখন কী এই সম্ভাবনা দেখা দিবে না যে, মুজাহিদদের শানে যে বিজয় অপেক্ষমান তখন তা করুণ পরাজয়ে পরিণত হবে?"

উপস্থিত জনতা হযরত আলী (রা.)-এর কথা জোরালোভাবে সমর্থন করে।

"আমার যাওয়াটাই ঠিক হবে" আমীরুল মুমিনীন বলেন, "আমি এখনই রওনা হতে চাই।"

✪✪✪

আমীরুল মুমিনীন একটি উটনীর পিঠে চড়ে মদীনা হতে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর নায়েব এবং উপদেষ্টাগণ ছিলেন। তাদের সংখ্যা এবং নাম কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না। হযরত উমর (রা.) এক মাসেরও কম সময়ে যাবিয়া গিয়ে পৌঁছান। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর সংবর্ধনার ব্যবস্থা যাবিয়াতে করেছিলেন এবং অশ্বারোহীদের একটি দল আমীরুল মুমিনীনের অভ্যর্থনার জন্য কিছুটা সামনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আমীরুল মুমিনীন যাবিয়া পৌঁছে সেখানে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ (রা.)-কে দেখে হতবাক হয়ে যান।

"তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের অবরোধ তুলে নিয়েছ?" হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা সকলে এখানে কেন?"

"আমীরুল মুমিনীন!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "আমরা অবরোধের দায়িত্ব হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর হাতে অর্পণ করে এখানে এসেছি। অবরোধ অব্যাহত আছে। আমরা আপনার অভ্যর্থনার জন্য এখানে এসেছি।"

হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ (রা.) অত্যন্ত মূল্যবান এবং সোনালী কারুকাজ করা জুব্বা পরিহিত ছিলেন। এই পোশাকে তাদেরকে

শাহজাদা মনে হচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা.) কুরাইশদের আমীর ঘরানার লোক ছিলেন এবং হযরত ইয়াযিদ (রা.) গোত্রের সর্দার আবু সুফিয়ানের ছেলে ছিলেন। আমীরুল মুমিনীনের অভ্যর্থনার জন্য তারা এমন সাজে সেজেছিলেন।

"খোদার কসম! যারা এমন শাহী লেবাসে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছ তারা বড়ই বেশরম" হযরত উমর (রা.) তাঁর স্বভাবসুলভ ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়ে বলেন, "দু'বছর পূর্বে আমাদের অবস্থা কেমন ছিল? তোমরা মদীনায় থাকতে কখনো দু'বেলা পেট করে খেয়েছো কী? ধিক্কার ঐ মাল-সম্পদের প্রতি, যা তোমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। তোমরা কী যুদ্ধের ময়দানে নও? ... খোদার কসম! তোমরা যদি পোশাকের শান-শওকতে পড়ে যাও, তাহলে সেদিন দূরে নয় যেদিন তোমাদের স্থলে অন্য কোনো শাসকের আবির্ভাব ঘটবে।"

আমীরুল মুমিনীনের নিজের অবস্থা এই ছিল যে, তিনি মোটা কাপড়ের একটি কোর্তা পরিহিত ছিলেন। কোর্তা এমন পুরাতন হয়ে গিয়েছিল যে, তাতে তালি লাগানো ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ (রা.) নিজ নিজ জুব্বা খুলে আমীরুল মুমিনীনকে দেখান। উভয়ে বর্ম পরিহিত ছিলেন এবং তলোয়ার সঙ্গেই ছিল।

"আমীরুল মুমিনীন!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমাদের জুব্বা এটা বাহ্যিক পর্দা মাত্র। আমরা জুব্বা পরলেও অস্ত্রহীন নই। যুদ্ধ করার জন্য সদা প্রস্তুত।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর যুক্তিপূর্ণ কথায় আমীরুল মুমিনীনের চেহারা হতে রাগ বিদূরিত হয়ে যায়। তাঁকে প্রশান্ত মনে হচ্ছিল।

"আমাদের তাড়াতাড়ি বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে হবে" আমীরুল মুমিনীন বলেন, "রোমীয়দেরকে আমি বেশি দিন অপেক্ষায় রাখতে চাই না।"

আমীরুল মুমিনীন এই দীর্ঘ সফরের কোনো পরোয়া করেন না। তিনি বিশ্রাম নেন না এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পানে যাত্রা শুরু করেন।

✪✪✪

আমীরুল মুমিনীন বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলে মুজাহিদগণ আত্মহারা হয়ে খুশি উদযাপন করেন। আমীরুল মুমিনীনের শুধু আগমনটাই তাদের হিম্মত অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয় বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়। ফলে মুজাহিদগণ আরও বেশি খুশি ও আনন্দ করার পর্যায়ে ছিল। বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় কোনো সাধারণ সফলতা ছিল না। আমীরুল মুমিনীন সমস্ত

মুজাহিদদের মাঝে ঘুরেন এবং সকলের সঙ্গে মুসাফাহা করেন। বায়তুল মুকাদ্দাস ইতিমধ্যেই করায়ত্ত হয়েছিল। শুধু চুক্তিনামা লেখা বাকী ছিল মাত্র।

সকলের সঙ্গে দেখা ও মুসাফাহা করতে করতে আসরের নামাযের সময় হয়ে যায়। আজানের সময় হয়ে গিয়েছিল। যে কেউ আজান দিলেই চলত। কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের সফরসঙ্গী হিসেবে যারা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে মদীনার প্রখ্যাত মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রা.)-ও ছিলেন। হযরত বেলাল (রা.) ঐ মুয়াজ্জিন ছিলেন যাকে ইসলামী ইতিহাস কেয়ামত পর্যন্ত বিস্মৃত হতে পারবে না।

"আমীরুল মুমিনীন!" কোনো একজন বলে, "বায়তুল মুকাদ্দাসের মত পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর আমাদের অধিকারে এসেছে। এটা এমন একটা শহর, যার বিজয়ের জন্য আমরা হাজারো শহর কুরবান করতে পারি। এই অসধারণ সফলতার আনন্দে আজ হযরত বেলাল (রা.) আজান দিলে কতই না ভাল হত! আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসে হযরত বেলাল (রা.)-এর আজানের পরে ঢুকব ইনশাল্লাহ!"

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত বেলাল (রা.)-এর দিকে তাকান। হযরত বেলাল (রা.) নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর চেহারায় উদাস ও বিষন্নভাব আরও প্রকট হতে দেখা যায়। হযরত বেলাল (রা.) হাবশী বংশোদ্ভুত ছিলেন। ইসলামের সূচনালগ্নেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ বড়, সুরেলা এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। তিনি প্রথমবার আজান দিলে মুসলমানরা তো বিমোহিত হয়ই এমনকি অমুসলিমরাও প্রীতিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এটা ছিল হযরত বেলাল (রা.)-এর আওয়াজের জাদু। কুরাইশবাসী এই আওয়াজ বন্ধ করতে হযরত বেলাল (রা.)-কে এত কঠোর নির্যাতন করেছিল যে, তিনি একবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে আসে, তখন সর্বপ্রথম যে কথাটি তার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল তা হলো মহান আল্লাহর পবিত্র নামে।

হযরত বেলাল (রা.)-এর মায়াবী আজান পাহাড়, জঙ্গল এবং মরুভূমিতে তন্ময়তা ছড়াত। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সাথে সাথে এই আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। হযরত বেলাল (রা.) প্রিয় রসূলের শোকে আজান দেয়া ছেড়ে দেন। তাঁর চেহারায় সর্বক্ষণ বিষণ্নভাব লেগে থাকত। দীর্ঘ দিন পেরিয়ে গেছে। আজ বায়তুল মুকাদ্দাস বিজিত হয়েছে। এর খুশিতে মুজাহিদরা চান বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম আজানটি হোক হযরত বেলাল (রা.)-এর কণ্ঠে। যে কণ্ঠের আজান এতদিন বন্ধ সেই কণ্ঠ হতে মানুষ

আজান শুনতে চাওয়ার দাবী করেন হযরত উমর (রা.)-এর কাছে। তাই হযরত উমর (রা.) দাবীর জবাবে হযরত বেলাল (রা.)-এর দিকে তাকান। কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন নির্বাক।

"বেলাল!" আমীরুল মুমিনীন বলেন, "আমি জানি, তোমার মনে কিসের বেদনা। কিন্তু এ সময়টি এমন যে, আমি নিজেও চাই যে, আজ তুমিই আজান দাও। বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়কালে কে এমন থাকতে পারে, যিনি আজ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করতে চাইবেন না!"

হযরত বেলাল (রা.) নিরুত্তর। তিনি দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকেন। এতে সকলেই ধরে নেয় যে, হযরত বেলাল (রা.) আজান দিবেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাঁর চেহারার কালো মেঘ সরে যায়। তিনি এদিক-ওদিক তাকান। অনতিদূরের একটি উঁচু স্থান তাঁর নজরে পড়ে। তিনি দ্রুত পদে সেই উঁচু স্থানে গিয়ে দাঁড়ান। দুই কানে আঙ্গুল দেন এবং সেই সাথে অনেক বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্র ভূখণ্ডে ঐ গাম্ভীর্যপূর্ণ আজানের ধ্বনি প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে থাকে, যা নবীজির ইন্তেকালের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেক দিন পর হযরত বেলাল (রা.)-এর সুরেলা কণ্ঠের গুরুগম্ভীর আজান ধ্বনিতে আমীরুল মুমিনীন, তাঁর সফরসঙ্গীগণ এবং উপস্থিত সকল মুজাহিদদের মাঝে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। সকলের মুখ হয়ে যায় মূক। যখন হযরত বেলাল (রা.) কণ্ঠ হতে এই বাক্য বের হয়, "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ", তখন উপস্থিত জনতার মাঝে হু হু করে কান্নার রোল পড়ে যায়। কিছু লোক মূর্ছা যান। এর পূর্বে সকলের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু নবীজির নাম শুনে সকলের জযবা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। কেউ নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না।

এক সময় আজান শেষ হয়। আজানের পরে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর ঈমামতিত্বে সকলে আসরের নামায আদায় করেন।

✪✪✪

পরের দিন আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ হতে একজন দূত বায়তুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে এই বার্তা নিয়ে যান যে, আমীরুল মুমিনীন সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত করতে মদীনা হতে আগমন করেছেন। শহরের পাদ্রী আসকাফ সিফরীনুস এই বার্তার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি কয়েক সঙ্গীসহ কেল্লার বাইরে আসেন। চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয় এবং আসকাফ শহরের চাবি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর হাতে তুলে দেন। সন্ধিনামা যেভাবে লিখিত হয় তার বিবরণ কিছুটা নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

"ঐ চুক্তির ভিত্তিতে যা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রধান পাদ্রী আসকাফ সিফরীনুসের মাঝে চূড়ান্ত হয়েছে, খলীফাতুল মুসলিমীন বায়তুল মুকাদ্দাসের বাসিন্দাদেরকে এই চুক্তির ভিত্তিতে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এই নিরাপত্তা বায়তুল মুকাদ্দাসের লোকদের জান ও মালের জন্য; তাদের গির্জা ও ক্রুশের জন্য, জীবনভর প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী লোকের জন্য, সুস্থ-অসুস্থের জন্য। কোনো গির্জা বা অন্য কোনো মাজহাবের ইবাদাতখানাকে বিজয়ী পক্ষের বিনোদনের জন্য কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না। তাদের চৌহদ্দির মধ্যেকার কোনো বস্তুর ক্ষতি করা হবে না, ধ্বংস করা হবে না। ...

গীর্জা অথবা অন্যান্য ইবাদাতখানা হতে কোনো মাল লুণ্ঠন করা হবে না। অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের পক্ষ হতে ধর্মীয় ব্যাপারে কোন চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। তাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণও করা যাবে না। তবে বায়তুল মুকাদ্দাসে কোনো ইহুদী থাকতে পারবে না। বায়তুল মুকাদ্দাসবাসীদের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত থাকবে যে, তারা এ শহর থেকে ইহুদী, রোমীয় এবং অপরাধমূলক কাজে জড়িত লোকদেরকে বের করে দিবে। বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানকারী প্রত্যেক লোক অন্যান্য শহরের লোকদের মত কর আদায় করবে। শহর ছেড়ে যারা চলে যেতে চায়, পরবর্তী মঞ্জিলে পৌঁছা পর্যন্ত তাদের জান-মালের নিরাপত্তা থাকবে। উল্লেখিত দেশসমূহ ব্যতীত অন্যান্য দেশের যেসব লোক এই শহরের থাকতে চায়, থাকতে পারবে। তবে তাদেরকেও কর দিতে হবে। যদি এই শহরের কোনো বাসিন্দা রোমীয়দের সঙ্গে কিংবা একাকী অন্যত্র চলে যেতে চায়, তাহলে তাদের জন্য তার অনুমতি থাকবে। তারা যাওয়ার সময় সঙ্গে যতটা পারে মাল-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে। তাদের জমিনে বর্তমানে যে ফসল লাগানো আছে তা দেখাশুনার জিম্মাদার খোদ খলিফার। ফসলের দ্বারা উদ্দেশ্য যা বর্তমানে জমিতে বপন করা আছে। তবে শর্ত হলো, তারা এগুলোরও কর আদায় করবে এবং জমিতে ফসল পাকলে তারা এসে সে ফসল কেটে নিয়ে যাবার অনুমতি পাবে।"

চুক্তিনামা চূড়ান্ত হলে আমীরুল মুমিনীন (রা.) তাতে মোহরাঙ্কিত করেন। অপর পক্ষ হতে পাদ্রী আসকাফ সিফরীনুস তাতে দস্তখত করেন। সাক্ষী হিসেবে সই দেন হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.), হযরত আমর বিন আস (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)।

সন্ধিনামা চূড়ান্ত হতেই আমীরুল মুমিনীন (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে নির্দেশ দেন, তাঁরা যেন সৈন্যদের নিয়ে এখনই সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে চলে যান, যেখানে কিছু স্থানে রোমীয়রা এখনও কেল্লাবন্দী ছিল। গোয়েন্দারা তথ্য দিয়েছিল যে, রোম সম্রাট হিরাকেল সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা যদিও ছেড়ে গেছেন কিন্তু তাঁর যেসব সৈন্য এখনও সিরিয়া বিদ্যমান, তাদের জন্য হিরাকেল সাহায্য প্রস্তুত করছেন।

✪✪✪

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.) এবং হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। আসকাফ সিফরীনুস তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এর একদিন পূর্বে সন্ধিনামা স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং সিফরীনুস সন্ধিনামা শহরবাসীকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। শহরবাসী এর পূর্বে আতঙ্কে ছিল। কারণ তারা পূর্বে বিজয়ীদের জুলুম ও নির্যাতন দেখেছিল। রোমীয়রা যখন সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাসে এসেছিল, তখন সম্রাট হিরাকেলের নির্দেশে এই শহরের বাসিন্দাদের উপর কেয়ামত বয়ে গিয়েছিল। জনতাকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এত সহজে কে মাজহাব-ধর্ম পরিবর্তন করে! ফলে যারা সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ধর্ম পরিবর্তন করে না তাদের নাক, কান কেটে দেয়া হয় এবং তাদের বসতবাড়ি গুড়িয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের জীবনে নেমে এসেছিল নির্যাতনের খড়্গ। মানবেতর জীবন যাপনে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল।

মুসলমানদের ব্যাপারে তারা আরও বেশি চিন্তিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। তাদের জানানো হয়েছিল যে, মুসলমানরা যে শহর জয় করে, সেখানকার বাসিন্দাদেরকে জোর করে মুসলমান বানায়। ঘর-বাড়ি লুটে নেয়। সুন্দরী-রূপসী মেয়েদেরকে নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বায়তুল মুকাদ্দাসের বাসিন্দারা রোম ফৌজের সিপাহীদের মুখ থেকে শুনেছিল যে, মুসলমানরা বঁড়ই জালিম প্রকৃতির। এই সিপাহীরা মূলত রণাঙ্গনের কাহিনী শোনাত অথচ শহরবাসী এটা বুঝে ভীত-সন্ত্রস্ত হত যে, মুসলমানরা মানুষ নয়; বরং হিংস্র ও রক্তখেকো। তাদের জানা ছিল না যে, মুসলমানরা রক্তখেকো ঠিকই, তবে তা শুধু যুদ্ধের ময়দানে।

বায়তুল মুকাদ্দাসবাসী যখন সন্ধিনামায় লিখিত বক্তব্য শুনে অতঃপর এটা দেখে যে, মুসলমান সিপাহীরা কোনো শহরবাসীর দিকে ফিরেও তাকায় না, তখন তারা আনন্দের উৎসব করা শুরু করে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) আলকমা বিন মুযাযযিরকে বায়তুল মুকাদ্দাসের শাসক ও আমীর নিয়োগ করেন।

আসকাফ সিফরীনুস আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-কে শহরটি ঘুরে-ফিরে দেখান। তাঁকে প্রাচীন সভ্যতা এবং জাতির স্থাপত্য দেখান। ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের উপাসনালয় দেখান। বায়তুল মুকাদ্দাসে অনেক প্রাচীন কীর্তি ও নিদর্শন ছিল। এর মধ্যে হযরত দাউদ (আ.)-এর মেহরাব এবং হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর হাওয়ায় ভাসমান পাথরটি অন্যতম। এ দু'টি ছিল পাথর, যাদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর উপর দাঁড়িয়ে মেরাজে গিয়েছিলেন।

শহর পরিদর্শনের এক পর্যায়ে আমীরুল মুমিনীন 'কেয়ামত গির্জার' পার্শ্ব অতিক্রম করেন। এ সময় জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি এদিক-ওদিক এই উদ্দেশ্যে তাকান যেখানে জোহরের নামায আদায় করতে পারেন।

"খলীফাতুল মুসলিমীন!" আসকাফ সিফরীনুস অনুযোগের কণ্ঠে বলেন, "আমার জন্য এটা গর্বের বিষয় হবে যে, আপনি গির্জার অভ্যন্তরে নামায আদায় করবেন।"

"না" খলীফা হযরত উমর (রা.) বলেন, "আমি এই গির্জার সম্মান করি। কিন্তু আমি এখানে নামায পড়ব না। কেননা তা সন্ধিচুক্তির খেলাপ হবে। যদি আমি আজ আপনার অনুরোধে এখানে নামায পড়ি, তাহলে আমার পরে মুসলমানরা একে প্রথা বানিয়ে নিবে এবং গির্জায় নামায পড়াকে নিজেদের অধিকার জ্ঞান করবে।"

'কেয়ামত গির্জা' ঐ স্থান যেখানে হযরত ঈসা (আ.)-কে খ্রীষ্টানদের ধারণানুযায়ী ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এখানে এই গির্জা নির্মাণ করা হয়েছিল। এর অনতিদূরে কুসতুনতীন গির্জা ছিল। আসকাফ তার দরজার সামনে জায়নামায বিছিয়ে দেন। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন সেখানেও নামায পড়েন না। তিনি নামায পড়েন মসজিদে আকসায়।

"সম্মানিত পাদ্রী!" আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) আসকাফ সিফরীনুসকে বলেন, "রোমীয়রা আপনাকে ছেড়ে গেল কেন? তাদের সালার উতরুবুন কোথায় গিয়েছে? শুনেছিলাম, তিনি নাকি রোম সম্রাট হিরাকেলের সমপর্যায়ের ব্যক্তিত্ব!"

"পালিয়ে গেছে" সিফরীনুস জবাবে বলেন, "পালিয়ে গেছে। ... কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি হিরাকেলের সমপর্যায়ের ছিলেন। তিনি আপনাকে পরাস্ত

করার নিপুণ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। তিনি কায়সারিয়ার সালারকে আপনার ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু আপনার সালারদের রণকৌশল উতরুবুনের পরিকল্পনাকে চুরমার করে দেয়। ইতিপূর্বে তিনি আপনার বাহিনীর মোকাবেলায় আসেননি।

"তিনি দেখেছিলেন যে, তার ফৌজের মধ্যে যুদ্ধ করার মানসিকতা নেই। ইয়ারমুক ও অন্যান্য স্থান হতে পালিয়ে আসা অনেক সিপাহী এখানে সমবেত হয়েছিল। তারা এসে সৈন্যদেরকে এমন এমন কথা শোনায়, যা শুনে সকলের মনোবল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উতরুবুন তার বাহিনীকে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারেন যে, মুসলমানরা কায়সারিয়া অবরোধ করেছে, তখন তিনি স্বীয় বাহিনী নিয়ে কায়সারিয়ার অবরোধ ভাঙ্গার জন্য রওনা করেন। কিন্তু আপনার কোন সালার যেন তার গতিরোধ করেন। তিনি প্রথমবারের মত মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং স্বীয় বাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন। ...

ফিরে আসার পর তার মতি-গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। ইতিপূর্বে তিনি অন্যান্য পরাজিত সালারদেরকে 'ভীরু-কাপুরুষ' বলে উপহাস করলেও এবং নিজ বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেও নিজে ভীরু-কাপুরুষে পরিণত হন। তার যুদ্ধ মনোবল সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। তিনি এখান থেকে অর্থ-সম্পদ ও খাযানা অন্যত্র নিয়ে যেতে শুরু করেন এবং সমুদ্র পথে সেসব কুসতুনতুনিয়ায় নিয়ে যান। বেশির ভাগ সৈন্যও তার সঙ্গে চলে যায়। এখন যে সৈন্য দেখছেন তা নামেমাত্র ছিল। তাদেরকে আমি কেল্লার প্রাচীরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। আমি আপনার সঙ্গে চুক্তি করতে এই জন্য আগ্রহী হই যে, যে সিদ্ধান্ত খলীফা নিতে পারেন, তা সালাররা নিতে পারেন না। আমার লক্ষ্য ছিল, এই শহর ও শহরবাসীদের জান-মাল রক্ষা করা।"

আসকাফ সিফরীনুস হযরত উমর (রা.)-কে এটা জানান না যে, উতরুবুন এবং সিফরীনুস উভয়ে মিলে বায়তুল মুকাদ্দাস হতে শুধু খাযানা স্থানান্তর করেননি; বরং গির্জার স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত অনেক আসবাবপত্রও তারা পরিকল্পিতভাবে স্থানান্তর করেছিলেন। এর মধ্যে বড় ক্রুশটিও ছিল। সিফরীনুস আমীরুল মুমিনীনকে মদীনা হতে এই উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন যে, যাতে তারা এই মধ্যবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় খাযানা, স্বর্ণ-রৌপ্য, রোমীয় সৈন্য এবং তাদের মাল-সম্পদ সরিয়ে ফেলার দীর্ঘ অবকাশ পায়। আমীরুল মুমিনীন আসার মধ্যবর্তী সময়ে তারা বায়তুল মুকাদ্দাস হতে মূল্যবান সবকিছু সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। আমীরুল মুমিনীনের আগমনের শর্তই ছিল তাদের কৌশল

মাত্র। সে কৌশলে তারা পূর্ণ কামিয়াব হয়েছিল এবং এ সময়ের মধ্যে তারা যা যা স্থানান্তর করতে চেয়েছিল সবই কুসতুনতুনিয়ায় সরিয়ে ফেলেছিল।

✪✪✪

৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মোতাবেক ১৬ হিজরীর রবিউল আউয়ালের একটি দিন। এদিন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাসে দশ দিন অবস্থান করে বিদায় হন। বিদায় নেয়ার পূর্বে তিনি বিস্তারিতভাবে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন যে, রোমীয় সৈন্য বর্তমানে কোথায় কোথায় আছে। সামগ্রিকভাবে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছিল। তাদের সম্রাট হিরাকেল সিরিয়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। রোমীয় সেনাবাহিনীর নামকরা সালাররা মারা গিয়েছিল। কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল, যেগুলো তখনও রোমীয়দের দখলে ছিল। সেখান থেকে রোমীয়দের তাড়ানো জরুরী ছিল।

এমন স্থানের মধ্যে একটি স্থানের নাম হলো কায়সারিয়া। এটা রোম উপসাগরের বন্দরস্থল ছিল। এখান থেকে রোমীয়দের হটানো খুবই জরুরী ছিল। কেননা রোমীয়দের নৌবাহিনী তখনও পূর্ণ শক্তিতে বিদ্যমান ছিল এবং নৌবাহিনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তারা এ শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারছিল না। কেননা মুসলমানরা নৌপথে লড়াই করত না। অবশ্যই তাদের নৌবাহিনী সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত হত। রিজার্ভ ফোর্স অবতরণের জন্য কায়সারিয়া বন্দরস্থল ব্যবহৃত হত।

আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশে কায়সারিয়ার পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করা হয়েছিল। বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকারে এলে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-কে কায়সারিয়া অবরোধ করার জন্য নির্দেশ দেন।

"ইবনে আবু সুফিয়ান!" হযরত উমর (রা.) বলেন, "এটা ভেবো না যে, তোমাকে এখনিই এই কেল্লাটি দখল করতে হবে। এটি অত্যন্ত মজবুত কেল্লা পরিবেষ্টিত স্থান। রোমীয়রা অতি সহজে এ স্থানটি দিবে না। আক্রমণ করে করে নিজের শক্তি বিনষ্ট করবে না। কায়সারিয়ায় রোমীয়দের সংখ্যা অনেক এবং সেখানে রসদেরও কোনো কমতি নেই। শত্রুরা এটাই চাইবে যে, তুমি ঐ কেল্লায় আক্রমণ করে করে এত দুর্বল হয়ে যাও যে, হয়ত এ কারণে এক সময় তুমি অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হবে অথবা তোমাকে দুর্বল পেয়ে শত্রুরা বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং তোমার বাহিনীর উপর এমন হামলা করবে যে, তুমি পিছু হটারও সুযোগ পাবে না।"

"আমীরুল মুমিনীন!" ইয়াযিদ (রা.) বলেন, "কেল্লা দেরিতে পদানত হোক কিংবা দ্রুত, আমি জানি যে, সেদিক হতে সাহায্য আসবে। আমি সেই সাহায্য আসতে দিব না।"

"তোমার প্রতি আল্লাহর রহম হোক ইবনে আবু সুফিয়ান!" হযরত উমর (রা.) বলেন, "রোমীয়রা কোনোভাবে সাহায্য পেয়ে গেলে, সেটা আমাদের জন্য বড়ই পেরেশানির কারণ হয়ে দেখা দিবে। তোমার ওখানে প্রধান কাজ দু'টি। অবরোধ দীর্ঘ করা এবং রোমীয়দের সাহায্য প্রতিহত করা।"

হযরত উমর (রা.) খলীফা ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সফর বাদশা এবং বর্তমান সময়ের শাসকদের মত ছিল না যে, কোথাও গেলেন, কাউকে সাবাসী দিলেন, কাউকে পুরস্কৃত করলেন এবং ফিরে এলেন। তিনি সফরে এসে অত্র এলাকার সকল অঞ্চলের ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। সমর বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যালোচনা করেন। নিজের সৈন্য এবং শত্রু পক্ষের সৈন্যদের অবস্থা যাচাই করেন এবং সে অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী সালারগণ নিজ নিজ স্থানে চলে যান।

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে রোমীয়রা কোথাও কোথাও কেল্লা পরিবেষ্টিত ছিল। তাদের আশা ছিল যে, রোম সম্রাট হিরাকেল যেখানেই থাকুন না কেন অবশ্যই সাহায্য পাঠাবেন। অপরদিকে মুসলমানরা এই চেষ্টায় ছিলেন যে, রোমীয়রা যেন কোনো স্থান হতে সাহায্য পেতে না পারে। এই পরিকল্পনার একটি দিক এই ছিল যে, হযরত ইয়াযিদ (রা.) স্বীয় বাহিনী নিয়ে কায়সারিয়া চলে যান এবং ঐ শহরের যেটা সমুদ্রবন্দর ছিল তা অবরোধ করেন।

সালার হযরত আমর বিন আস (রা.) এবং হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.) ফিলিস্তিন এবং জর্দান রওনা হয়ে যান। তাদের জিম্মায় এই দায়িত্ব ছিল যে, যেসব এলাকা থেকে তারা রোমীয়দেরকে হটিয়ে দিয়েছিল, সেসব এলাকা কব্জা করে নগর ব্যবস্থাপনা এবং কর উসূল ব্যবস্থাকে নবায়ন করা এবং সেসব এলাকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা। রোমীয়দের পক্ষ হতে জবাবী হামলার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল।

প্রধান সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা (রা.) দামেস্ককে নিজের হেডকোয়ার্টার বানানোর জন্য চলে যান। তাঁর সঙ্গে থাকা মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা ছিল সতের হাজারের মত।

✪✪✪

কনসিরীন কেল্লা পরিবেষ্টিত একটি স্থান ছিল। সেখানে রোমীয় সৈন্য বিদ্যমান ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঐ কেল্লা অবরোধ করে সেখান থেকে রোমীয়দেরকে বের করছিলেন। এটি একটি মজবুত দুর্গ ছিল, যেখানে রোমীয়দের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। হযরত খালিদ (রা.) মুজাহিদ বাহিনীর অগ্রগামী দলে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে চার হাজার বিশেষ অশ্বারোহী দল ছিল, যাদেরকে প্রান্ত বদল করে করে যুদ্ধ করার ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল।

কনসিরীনে এক প্রখ্যাত সালার ছিল। তার নাম ছিল মিনয়াস। সে খোঁজ-খবর রাখার জন্য দূর-দূরান্তে গোয়েন্দা ছড়িয়ে রেখেছিল। একদিন তাদের মধ্য হতে একজন ঘোড়া ছুটিয়ে আসে এবং সোজা মিনয়াসের কাছে চলে যায়। লোকটি মিনয়াসকে জানায় যে, মুসলমানদের একটি বাহিনী আসছে, যাদের অগ্রগামী দলে অশ্বারোহী সৈন্য আছে। লোকটি তাদের সংখ্যা তিন থেকে চার হাজারের মাঝামাঝি বলে জানায়। লোকটি এটাও জানায় যে, অগ্রগামী দলটি এখান থেকে কত দূরে। মিনয়াসের জন্য তথ্যটি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। সে দ্রুত নিজ বাহিনীকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করে।

"রোম সাম্রাজ্যের মর্যাদার ধারক-বাহকগণ!" সে তার বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা করতে আবেগী কণ্ঠে বলে, "তারা ভীরু-কাপুরুষ ছিল, যারা নিজেদের মনে আরব বদ্দুদের ভীতি সঞ্চারিত করেছিল। তোমাদের মাঝে ঈসায়ী আরবও আছে। যদি মুসলমানরা বড় বাহাদুর হয়ে থাকে, তবে তোমরাও তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নও। আরবের মুসলমানরা তো তোমাদেরই মত। তোমরাও সে মরুভূমি হতে সৃষ্ট। ... আর রোমীয়রা! তোমরা সেদিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন তোমরা বিজয়ীবেশে এই ভূখণ্ডে পা রেখেছিলে। তারা ছিল তোমাদেরই পিতা এবং দাদা। কল্পনায় আন যে, সে সময় তাদের মাথা কত উঁচু এবং সীনা কতখানি প্রশস্ত হয়েছিল। আর আজ চিন্তা কর যে, তাদের রূহগুলো কেমন লজ্জিত হচ্ছে। ...

"এটা ভেব না যে, সম্রাট হিরাকেল পালিয়ে গেছেন। রোম সাম্রাজ্যের মর্যাদা, ক্রুশের সম্মান এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্রতাকে সামনে রাখ। এরপর সামনে রাখ সালার উতরুবুনের আত্মমর্যাদাবোধ হীনতাকে, যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর নগরী বায়তুল মুকাদ্দাসকে তোমাদের মাজহাব এবং তোমাদের আকীদা-বিশ্বাসের শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছে। ...

কল্পনা কর, নিজ নিজ কন্যা এবং স্ত্রীর কথা, যারা এখন থেকে মুসলমানদের সন্তান জন্ম দিবে। ... নিজেদেরকে দেখ, তোমরা আজ হেরে গেলে জীবনভর মুসলমানদের গোলামে পরিণত হবে। আজ তোমরা কত শান-

শওকতে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হচ্ছ। তোমরা যদি অস্ত্র সমর্পণ কর, তাহলে ঘোড়ার পিঠে চড়ার দিন তোমাদের শেষ হয়ে যাবে। তোমরা শাহসওয়ার হতে আস্তাবলের সহিসে পরিণত হবে এবং ঘোড়ার মল-মূত্র পরিষ্কার করাই হবে তোমাদের জীবনের চরম পরিণতি।"

"রক্ত গরম করবেন না হে সালার!" এক অশ্বারোহী বড়ই উচ্চকণ্ঠে বলে, "আপনি কি মনে করেছেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি? আপনি কী আমাদের বীরত্ব ও মর্যাদাবোধের প্রতি সন্দিগ্ধ?"

"হে শাহী ঘোড়ার বাহাদুর সওয়ার!" মিনয়াস বলে, "আমি সন্দেহ কেন করব না! আমাদের এমন কোন সালার আছে, যে রণাঙ্গন হতে পলায়ন করেনি অথবা মারা যায়নি? হিরাকেলের সমপর্যায়ের ব্যক্তিত্ব উতরুবুন মুসলমানদের কচুকাটা করার কত না দাবী করত! এখন তিনি কোথায়? তিনি এক দিনও লড়াই করেননি এবং বায়তুল মুকাদ্দাস হতে তিনি বিনা যুদ্ধে পালিয়ে গেছেন। ...

তোমরা কী প্রধান পাদ্রী আসকাফ সিফরীনুসকে এখনও তোমাদের ধর্মগুরু মানবে, যিনি কেল্লা হতে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের খলীফাকে স্বাগতম জানান এবং তাকে বলেন যে, কেয়ামত গির্জায় নামায পড়ুন? তিনি এটা চিন্তা করেননি যে, তিনি স্বীয় উপাসনালয়কে শত্রুদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। আজ তোমাদের প্রমাণ দিতে হবে যে, তোমরা তাদের মত হীনবল ও কাপুরুষ নও, আত্মমর্যাদাবোধহীন নও। যদি তোমরা যুদ্ধে দৃঢ়পদ হতে পার, তবে আশা করা যায় সম্ভবত সাহায্য আসবে। কিন্তু সাহায্য আসার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখি না এবং আমি সাহায্যের প্রয়োজনও অনুভব করিনা।"

"সম্মানিত সালার! আমরা লড়ব" প্রথমে একটি এরপর কয়েকটি আওয়াজ উচ্চকিত হয়, "সালার! আমাদেরকে ভীরু এবং আত্মমর্যাদাবোধহীন বলবেন না। পরীক্ষা করে দেখুন। ... কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। ... আমরা একদিনেই অবরোধ গুড়িয়ে দিব।"

"আমরা অবরোধ করার সুযোগ দিবনা" সালার মিনয়াস বলে, "আমরা শত্রুদেরকে কেল্লার অদূরেই পথিমধ্যে প্রতিরোধ করব। আমি তোমাদের আগে আগে থাকব।" ঐতিহাসিক লিখেছেন, রোমীয় সালার মিনয়াস দুঃসাহসিক সালার ছিলেন। তার দুর্দান্ত নেতৃত্বের কথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল আর তার আরেকটি খ্যাতি এই ছিল যে, সে স্বীয় বাহিনীর সৈন্যদের খুবই প্রিয়ভাজন এবং তাদের আপনজন ছিল। সিপাহীদের সঙ্গে সে অমায়িক ও মমতাসুলভ আচরণ করত। এতে করে সিপাহীরাও তাকে প্রাণ দিয়ে মহব্বত করত। স্বীয় বাহিনীকে চাঙ্গা

করতে তার নির্দেশই যথেষ্ট ছিল; এত আবেগ প্রদর্শন ও জোরালো ভাষণের প্রয়োজন ছিল না।

ঐতিহাসিকগণ একথাও লিখেছেন যে, ইতিপূর্বে তার মোকাবেলা মুসলমানদের সঙ্গে হয়নি। সে সালার ছিল। যখন সে জানত পারত যে, অমুক ময়দানে রোমীয়দের পরাজয় হয়েছে, তখন সে এর নেপথ্য কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হত। তাকে হযরত খালিদ (রা.) সম্পর্কে জানানো হয় যে, তাঁর সমর চাল পূর্ব হতে কেউ ধরতে পারে না এবং তিনি একজন দুঃসাহসী বীরযোদ্ধা।

"তিনি তো কোনো জ্বিন-ভূত নন" মিনয়াস বলছিল, "তাঁর হাতে পরাজয় বরণকারীরা তাকে আসমানে উঠিয়ে দিয়েছে। তারা মিথ্যা বলে। পরাজিত যারা হয় তারা এমন মিথ্যা বলে থাকে। আমি হিরাকেলকে খালিদ বিন ওলীদের লাশ দেখাব।"

✪✪✪

রোমীয় সালার মিনয়াসের নেতৃত্বে কনসিরীনে অবস্থানরত সৈন্যরা বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবনের মত কেল্লার বাইরে বের হয়। তাদের মাঝে জোশ ও ক্ষোভ ছিল পূর্ণমাত্রায়। তাদের গতি ছিল দ্রুত।

ওদিকে হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে চার হাজার অশ্বারোহী বিজয়ীবেশে আসছিল। তারা সাধারণ সফরের বিন্যাসে ছিল। কথা ছিল, তারা কনসিরীনের কাছাকাছি গিয়ে থামবে এবং বাদবাকী সৈন্য আসার অপেক্ষায় থাকবে। কনসিরীন থেকে কয়েক মাইল দূরে 'খাতের' নামক একটি স্থান ছিল। পথিমধ্যে এই স্থানটি পড়ত। হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী যখন খাতের নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন সামনের গতিবিধির উপর নজরদারী করতে যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের একজন ফিরে আসে এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে জানায় যে, রোমীয়দের একটি বিরাট দল আসছে।

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.) গর্জন করে বলেন, "আমি আমীনুল উম্মতের অপেক্ষা করব না।"

বাকী সৈন্য ও মূল বাহিনী আমীনুল উম্মত হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সঙ্গে পেছনে আসছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর উচিত ছিল, তাদের আসার অপেক্ষা করা। কেননা, তাকে জানানো হয়েছিল যে, রোমীয় সৈন্যদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর অবাধ্য মন অপেক্ষা করতে রাজি হয় না। তিনি তার দলটিকে ত্বরিৎ গতিতে যুদ্ধ বিন্যাসে বিন্যস্ত করেন। এই দলটি চোখের পলকে বিন্যাস পরিবর্তনের ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিল। মুহূর্তে মুহুর্মুহু প্রান্ত বদল করে তারা শত্রুর চোখে ধুলা দিতে পারত। এতে লাভ হত এই যে, তারা

নিজেদেরকে বাঁচিয়ে শত্রু সারি কচুকাটা করে দিত। শত্রুরা তাদেরকে নাগালে আনতে পারত না। চোখের পলকে উধাও হয়ে অন্য স্থানে হাজির হত। হযরত খালিদ (রা.) নিজে তাদেরকে এই বিশেষ ট্রেনিং দিয়েছিলেন। যার ফলে এ দলটি হয়েছিল চিরদুর্বার ও দুর্দান্ত।

উভয় বাহিনী খাতের নামক স্থানে মুখোমুখি হয়। রোমীয় সালার মিনয়াসের ধারণা ছিল, মুসলমানরা মূল যুদ্ধের পূর্বে চিরায়ত নিয়মানুযায়ী মল্লযুদ্ধ করবে। তাদের সালার মল্লযুদ্ধ করার জন্য রোমীয় সালারকে আহ্বান জানাবে। এভাবে কয়েকজনের মাঝে মল্লযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সৈন্যদের সারিবদ্ধ করা হবে। কিন্তু মুসলমান অশ্বারোহীরা মল্লযুদ্ধ না করেই এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যায় যে, মিনয়াস ঘটনা বুঝতেই পারে না। কিছু বুঝার আগেই তার উপর মুহুর্মুহু আক্রমণ শুরু হয়ে যায়।

মিনয়াস স্বীয় বাহিনীর প্রেরণা চাঙ্গা রাখতে সর্বাগ্রে ছিল। তার চতুর্দিকে বডিগার্ডদের দেয়াল ছিল; যা ভীষণ মজবুত ছিল। কয়েকজন মুসলিম অশ্বারোহী মিনয়াসের বডিগার্ড বাহিনীর প্রতি হামলা করে। বডিগার্ডরা কঠিনভাবে মুসলমানদের প্রতিরোধ করে। রোমীয়দের সংখ্যা ছিল বেশী। এ ছাড়া তারা তাদের সালার মিনয়াসকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করত। যার ফলে রোমীয়রা দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করে এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কঠিন আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু তাদের প্রতিটি হামলা এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল, যেন তারা শূন্যে ঘুষি মারছে। এর কারণ এই ছিল যে, তাদের মোকাবেলা এমন অশ্বারোহীদের সঙ্গে হচ্ছিল, যারা এক স্থানে থেকে লড়াই করছিল না। তাদের ধরন ও গতিতে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। রোমীয়রা যার সঙ্গে পরিচিত ছিল না।

জোশের সঙ্গে উপর্যুপরি হামলা রোমীয়রা করছিল এবং ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিও তাদের হচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা.) নিজেও সিপাহীর মত লড়ছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষিত বাহিনীর কমান্ড দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। কমান্ড প্রয়োজন ছিল রোমীয় সালার মিনয়াসের। সে দেখছিল যে, তার বাহিনী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। সে এমন কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করছিল, যেখান থেকে সে স্বীয় বাহিনীকে দেখে কোনো চাল চালতে পারে। কিন্তু এরই মধ্যে মুসলিম অশ্বারোহীরা তার বডিগার্ড দলের বেষ্টনী ভেদ করে তাকে হত্যা করে ফেলে।

যুদ্ধের ময়দানে এমন হত যে, সালার মারা গেলে এবং ঝাণ্ডা ভূপাতিত হলে সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হত এবং পিছু হটা শুরু হয়ে যেত। এই জন্যে যুদ্ধে সেনাপতি মারা গেলে বিষয়টি গোপন রাখা হত। কিন্তু রোমীয় সালার মিনয়াস মারা গেলে নিয়ম পাল্টে যায়। তার বডিগার্ড দল ঘোষণা করে যে, সালার মিনয়াস মারা গেছে।

এই ঘোষণায় মুসলমানরা এই ভেবে খুশি হয় যে, এবার রোমীয় সৈন্যদের মাঝে হুলস্থুল পড়ে যাবে এবং তারা রণে ভঙ্গ দিবে। কিন্তু ফল দেখা দেয় উল্টো। রোমীয়রা সালার নিহত হওয়ার খবরে ভেঙ্গে পড়ে না; বরং তারা মারাত্মক বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা "প্রতিশোধ, প্রতিশোধ ... মিনয়াসের রক্তের প্রতিশোধ নাও" স্লোগান দিতে শুরু করে এবং তাদের হামলা জোরদার হয়। তারা বজ্র ও বিদ্যুতে পরিণত হয়। কিন্তু তাদের এই ক্ষোভ ও বিক্ষুব্ধ হওয়াটা তাদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। কারণ তারা ফুঁসে উঠেছিল ঠিকই কিন্তু তাদেরকে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে পরিচালনা করার কেউ ছিল না। যে ছিল সে মারা গিয়েছিল। তাই এখন বিক্ষুব্ধ সেনারা অপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ করতে থাকে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের মাঝে জটলার অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাদের চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়ে।

হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের এই জটলাবস্থা দেখে তাঁর অশ্বারোহী দলকে নয়া নির্দেশনা দেন। এই নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে রোমীয়দের গণহত্যা শুরু হয়। তারপরেও তারা পিছপা হয় না। এর ফল এই হয় যে, একজন রোমীয় সৈন্যও ময়দান হতে পালাতে পারে না এবং একজনও জীবিত থাকে না। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক একযোগে বলেন যে, মিনয়াসের একজন সৈন্যও জীবিত ছিল না এবং একজনও পালায় না। তাদের তুলনায় মুসলমানদের প্রাণহানী ছিল খুবই কম।

✪✪✪

এক সময় যুদ্ধ শেষ হয়। খাতেরের স্থানীয় লোকেরা সবাই ছিল ঈসায়ী। তারা বাইরে বেরিয়ে আসে এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে।

"আপনার বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করেছে, তারা নিজেদের পরিণতি নিজেরাই ভোগ করেছে" এক ঈসায়ী বুযুর্গ শহরবাসীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে বলে, "আমরাও ঈসায়ী। কিন্তু আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পূর্বেও রাখিনি এবং এখনও রাখি না। আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করছি।"

"যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যতিরেকেই আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়, তারা আমাদের নিরাপত্তার বলয়ে চলে আসে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তোমাদের উপর কর ধার্য হবে না এবং তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কথাও বলা হবে না। তোমাদের উপাসনালয় নিরাপদ থাকবে।"

তখনও হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর বাহিনী এসে পৌঁছেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল অবরোধ করা, তাই তাদের কোনো তাড়া ছিল না। তারা এক স্থানে যাত্রা বিরতিও করেছিল। হযরত খালিদ (রা.) খাতেবে বসে থাকেন না। কেনদা,

তাঁর দায়িত্ব ছিল কনসিরীন অবরোধ করা। এলাকাটি সে স্থান হতে বেশি দূরে ছিল না।

কনসিরীনে কিছু সৈন্য বিদ্যমান ছিল। হযরত খালিদ (রা.) অবরোধ করলে রোমীয়রা শহর রক্ষা পাঁচিলের উপর উঠে তীর বর্ষণ করা শুরু করে। হযরত খালিদ (রা.)-এর বিশ্বাস ছিল যে, ভেতরে বেশি সৈন্য নেই। ভেতরে সৈন্য বেশি থাকলেও হযরত খালিদ (রা.) হিম্মত হারাতেন না। তিনি স্বীয় পক্ষের এক দূতকে এই বার্তা দিয়ে কেল্লার দরজার কাছে পাঠান।

"হে রোমীয়!" যদি তোমরা আকাশের গা ঘেষে চলমান মেঘমালার মধ্যেও হতে, তবুও আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের পর্যন্ত অথবা তোমাদেরকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাতেন। আমরা তোমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি যে, অত্যন্ত করুণ পরিণতির শিকার হওয়ার আগেই কেল্লার দরজা খুলে দাও। যদি দরজা আমাদের খুলতে হয়, তাহলে সন্ধির শর্ত তোমাদের কোমর ভেঙ্গে দিবে। তোমাদের সালার মিনয়াস খাতেবের বাইরে মরে পড়ে আছে এবং যে সৈন্য সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল তার একজনও জীবিত নেই। আমরা তোমাদেরকে করুণ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করছি।"

এই বার্তার নগদ ফল হয়। কেল্লার দরজা খুলে যায়। মুসলমানরা বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করে। করের অংক এবং অন্যান্য শর্ত নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে সাধারণ একটি শর্ত এই ছিল যে, কনসিরীন শহর এবং তার শহরবাসীর জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তাবে। আর যে লোক এ শহর ছেড়ে চলে যেতে চায়, সে নিজ পরিবারের সঙ্গে কিংবা একাকী স্বীয় মাল-সম্পদ নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

কনসিরীন শহর যখন হযরত খালিদ (রা.)-এর পূর্ণ অধিকারে চলে আসে, তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) এসে পৌঁছান।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে কোলাকুলি করে বলেন, "তোমার উপর আল্লাহর রহম হোক। আমি খাতেবের বাইরে রোমীয়দের লাশ দেখে এসেছি।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেদিনই মদীনায় খলীফাতুল মুসলিমীন বরাবর বার্তা পাঠান। সে বার্তায় তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর বিরাট সফলতার পূর্ণ বিবরণ লিখে পাঠায়। এই সফলতা এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিরাট ছিল যে, 'রোম সাম্রাজ্যের কফিনে এটা ছিল আরেকটি পেরেক স্থাপন।'

প্রায় সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, আমীরুল মুমিনীন এই বার্তাটি পাঠ করে বলেছিলেন, "আল্লাহ তা'আলা খালিদকে জন্মগতভাবেই যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধ পরিচালনার জ্ঞান প্রদান করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপর আল্লাহর রহমত হোক, তিনি আমার চেয়ে মানুষ চিনতেন বেশি।"

✪✪✪

কনসিরীনের পরে হালাব নামক একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল। সেখানে রোমীয়দের একটি বড় দল কেল্লাবদ্ধ ছিল। সেখানে যে রোমীয় সালার কেল্লাপতি ছিলেন তার নাম ছিল ইউকন্না। তিনিও অভীজ্ঞ সালার ছিলেন। তিনি জীবনে অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং সকল যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) হালাব অভীমুখে যাত্রা করেছিলেন। রোমীয় সালার ইউকন্না যথাসময়ে জানতে পারেন যে, মুসলিম বাহিনী আসছে।

রোমীয় সালাররা কিছু দিন ধরে এই নিয়ম চালু করেছিল যে, তারা যখন শুনত, মুসলিম বাহিনী আসছে, তখন তারা সৈন্যদেরকে একত্রিত করে উত্তেজনাকর ভাষণ দিত এবং কেল্লার বাইরে এসে লড়াই করত। এটি একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ছিল। সম্ভবত তারা এর মাধ্যমে এটা প্রকাশ করতে চায় যে, তারা মুসলমানদেরকে ভয় করে না। সেই ধারাবাহিকতায় রোমীয় সালার ইউকন্নাও এমনটি করেন। তিনি হালাব থেকে স্বীয় বাহিনী বের করে কেল্লা হতে ছয় মাইল আগে চলে আসেন।

মুসলিম বাহিনীর সর্বাগ্রে এবারও হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় প্রশিক্ষিত দলটি নিয়ে ছিলেন। ইউকন্নাও তার সঙ্গী সালার মিনয়াসের মত মুসলমানদের অগ্রগামী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পন্থা অবলম্বন করেন। ইউকন্নার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মুসলিম বাহিনীকে কেল্লার অদূরেই শেষ করে ফেলবেন। মিনয়াসের মত তারও ধারণা ছিল যে, সামনাসামনি এসে মুসলিম বাহিনী থেমে যাবে এবং যুদ্ধ বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে লড়াই করবে।

এবারও হযরত খালিদ (রা.) তেমনটিই করেন যে, রোমীয়দের আসার সংবাদ পেয়েই স্বীয় দলটিকে যুদ্ধ বিন্যাসে ঢেলে সাজান। রোমীয়দের দেখে হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় দলটিকে থামান না। তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করে পার্শ্বদেশ হতে হামলা শুরু করে দেন। অশ্বারোহীরা এভাবে প্রান্তের পর প্রান্ত বদল করে লড়াই করে যে, রোমীয়রা চতুর্দিক হতে মাঝখানে এসে জমা হয়। এ সময় হযরত খালিদ (রা.) সম্মুখ দিক থেকেও হামলা করেন।

হযরত খালিদ (রা.)-এর এই আক্রমণাত্মক পলিসি ইউকন্না্র জন্য অযাচিত ছিল। তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার বিপরীত হয় এবং তার বাহিনীর পা উপড়ে যায়। এই যুদ্ধেও রোমীয়দের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় বেশি ছিল।

ইউকন্নার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায়। তিনি পিছু হটেন এবং কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় নেন। কেল্লাটি ছিল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এ কারণে তা অধিকার করা কঠিন ছিল। মুসলমানরা কেল্লা অবরোধ করে রাখে। ইউকন্না অনেক বার স্বীয় বাহিনীকে কেল্লা হতে বের করে মুসলমানদের উপর হামলা করাতেন। কিন্তু অযথা প্রাণহানী ছাড়া তার আর কোনো ফায়দা হয় না।

ইউকন্নার আশা ছিল যে, সম্রাট হিরাকেল সৈন্য এবং রসদ সামগ্রী পাঠাবেন। সম্ভবত তার এই তথ্য জানা ছিল না যে, প্রায় সমগ্র সিরিয়ায় মুসলমানরা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এখন আর কোথাও হতে তার সাহায্য পাবার সম্ভাবনা ছিল না। এক সময় ইউকন্না হামলার ধারা বন্ধ করে দেন এবং কেল্লার অভ্যন্তরেই চুপচাপ বসে থাকেন। মুসলমানরা যে কোনো উপায়ে কেল্লার অভ্যন্তরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল কিন্তু সফল হতে পারেন না।

এভাবে অবরোধকাল চার মাস পেরিয়ে যায়। দীর্ঘ অবরোধে কেল্লার অভ্যন্তরের রোমীয়রা এমন উদ্বিগ্ন ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয় যে, ইউকন্না এক দিন তার দূত বাইরে এই বার্তা দিয়ে পাঠায় যে, তিনি অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত আছেন। ইউকন্নার এই আশা ছিল না যে, হযরত খালিদ (রা.) তার দেয়া শর্ত মেনে নিবেন। তার শর্ত এই ছিল যে, তাকে এবং তার সকল সৈন্যকে কেল্লা হতে নিরাপদে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

তার দূত যখন ফিরে গিয়ে তাকে জানায় যে, মুসলমানরা তার শর্ত মেনে নিয়েছে তখন তিনি হতবাক হয়ে যান।

"না!" তিনি বলেন, "এমনটি হতে পারে না যে, বিজয়ীরা ঐ সৈন্যদেরকে ক্ষমা করে দিবে, যারা তাদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে। ... আমি জানি, কপালে কী আছে। যখন খালি হাতে সৈন্যরা বাইরে বের হবে, তখন তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হবে।"

এক সময় সে ক্ষণ আসে, যখন ইউকন্নার বাহিনী অস্ত্রহীন অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তাঁরা মুসলমানদের মাঝখান দিয়ে নিরাপদে চলে যায়। নিয়ম ছিল, ইউকন্না সকলের পূর্বে বের হবেন কিন্তু তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরিশেষেও বের হন না। হযরত খালিদ (রা.) কেল্লায় প্রবেশ করলে ইউকন্না তাকে সাদর সম্ভাষণ ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

“রোমীয় সালার!” হযরত খালিদ (রা.) বলেন, “আপনি এবার যেতে পারেন।”

“ইবনে ওলীদ!” ইউকন্না বলেন, “আমি যাব না। যদি আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই তাহলে আমাকে কোন শর্ত মানতে হবে?”

“ইসলাম কবুল করুন!” হযরত খালিদ (রা.) বলেন, “অতঃপর আপনার মর্যাদা তাই থাকবে যা এখন আছে।”

“নিঃসন্দেহে এটাই আমার তামান্না ছিল!” ইউকন্না বলেন।

ইউকন্না হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি প্রমাণ দেন যে, তিনি ইসলামের একজন নির্ভরযোগ্য ও দুর্বার সালার।

✪✪✪

সিরিয়ার একটি বড় শহর ‘ইন্তেকিয়া’। এ শহরের গুরুত্ব ছিল অনেক। এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর হওয়ায় রোম সম্রাট হিরাকেল এখানে তার হেডকোয়ার্টার বানিয়েছিলেন। এখান থেকেই তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মত সৈন্য ও যুদ্ধ সাজ-সরঞ্জাম পাঠাতেন। হিরাকেল বর্তমানে এখানে ছিলেন না। তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিরিয়া ভূখণ্ড ত্যাগ করেছিলেন এবং সম্ভবত কুস্তুনতুনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্তেকিয়ায় পূর্বের মত রোমীয় সৈন্য এবং হেডকোয়ার্টার বিদ্যমান ছিল। সেখান থেকে রোমীয়দের উৎখাত করা অনিবার্য ছিল। কারণ এর উপরেই সিরিয়ার পূর্ণাঙ্গ বিজয় নির্ভরশীল ছিল।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ইন্তেকিয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। নিয়মানুযায়ী হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় প্রশিক্ষিত অশ্বারোহী দলটি নিয়ে সর্বাগ্রে চলছিলেন।

যেহেতু ‘ইন্তেকিয়া’ রোমীয়দের সর্বশেষ বড় কেল্লা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়ে গিয়েছিল এবং সেটা রোমীয় সৈন্যদের হেডকোয়ার্টারও ছিল এই কারণে এটাই স্বাভাবিক ধারণা ছিল যে, এখানেও ইয়ারমুকের মত রক্তক্ষয়ী লড়াই হবে।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) মুজাহিদ বাহিনীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সামনের বিপদ কত ভয়াবহ। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা এই ছিল যে, মুজাহিদ বাহিনী মদীনা হতে বের হওয়ার সময়কাল চার বছর ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং তারা নিয়মিত লড়ে চলছিল। দীর্ঘ লড়াই হেতু তাদের দৈহিক শক্তি লোপ পেয়েছিল। তারা বর্তমানে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান ছিল, যা

তাদেরকে মনুষ্যতার উচ্চ স্তরে উন্নীত করেছিল। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর রাহে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

মুজাহিদ বাহিনীর বিশ্রামের সুযোগ ছিল না। দিনের বেলায় তলোয়ারের ঝংকার, তীরের শো শো আওয়াজ, বর্শার আঘাত প্রতিহত করা এবং পাল্টা আঘাত করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হত এবং রাত কাটত নিজেদের সাথী-সঙ্গীদের আত্মচিৎকার শোনার মধ্য দিয়ে। তারা বাতিলের একটি প্রান্তরের মূলোৎপাটন করতে না করতে সামনে আরেকটি প্রান্তর এসে দাঁড়িয়ে যেত।

তারা শেষমেষ রক্ত-মাংসের মানুষই ছিল। তাদের রক্ত-মাংস ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছিল। শত্রুরা তাদের এই দৈহিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং এটিই ছিল এক বড় ধরনের দুর্বলতা, যা সালারগণ মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। ইন্তেকিয়ার প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। গোয়েন্দাদের প্রেরীত তথ্য সালারদের উদ্বিগ্ন করে তুলছিল। কিন্তু থেমে যাওয়া এবং অপেক্ষা করাও ছিল বিপদসংকুল। রোমীয়দের কাঙ্ক্ষিত সাহায্য আসার পূর্বেই ইন্তেকিয়া জয় করা জরুরী ছিল।

মুজাহিদদের বারবার কুরআন শরীফের এই আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছিল যে, "ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই কর, যতক্ষণ কুফরী ফেতনার মূলোৎপাটন না হয়। ক্ষমতা কেবল আল্লাহ তা'আলার এবং পরিশেষে আল্লাহর দ্বীনেরই কেবল বিজয় হবে।"

ইন্তেকিয়া পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তায় দু'তিনটি ছোট ছোট কেল্লা ছিল। সেগুলো কব্জা করতে করতে যখন মুজাহিদ বাহিনী ইন্তেকিয়া হতে ১৩/১৪ মাইল দূরে এসে পৌঁছে তখন এক গোয়েন্দা এসে হাজির হয়।

"আবু সুলাইমান!" গোয়েন্দা হযরত খালিদ (রা.)-কে বলে, "অদূরেই একটি নদী আছে। নদীর উপর একটি মজবুত ব্রীজ রয়েছে। এ পুলের এপারেই একদল রোমীয় সৈন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অতএব হয় রাস্তা পরিবর্তন করা হোক কিংবা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হোক।"

'তোমার উপর আল্লাহর রহম হোক" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আল্লাহ চাইলে এ সৈন্যরাও আমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। ... তাদের সংখ্যা কত হবে?"

"আমাদের সমস্ত সৈন্যের চেয়ে দ্বিগুণ তো অবশ্যই হবে" গোয়েন্দা জানায়।

"পেছনে যাও" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "প্রধান সেনাপতিকে গিয়ে বল যে, তিনি যেন জলদি করে সমস্ত সৈন্য নিয়ে আসেন।"

✪✪✪

হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন পূর্ণ বাহিনী নিয়ে আসেন, তখন পুরো বাহিনীকে যুদ্ধসাজে ঢেলে সাজানো হয় এবং তাদেরকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। রোমীয় বাহিনী বেশি দূরে ছিল না। যে স্থানে রোমীয় বাহিনী মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করতে দাঁড়িয়েছিল, সেটা ইন্তেকিয়া হতে বার মাইল দূরে ছিল। রোমীয় সালার এই প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিল যে, তারা নদীকে তাদের পশ্চাতে রেখেছিল। সে স্থানে বড় মজবুত পুল ছিল। পুলটিও রোমীয়দের পশ্চাতে ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) রীতি অনুযায়ী অপেক্ষা করেন না। এসেই স্বীয় প্রশিক্ষিত অশ্বারোহী দলটিকে প্রশিক্ষণ মোতাবেক হামলা করার নির্দেশ প্রদান করেন। এর পেছনে তার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, এতে করে রোমীয়দের বিন্যাস ভেঙ্গে যাবে অথবা বিপর্যস্ত হবে। বিশেষ বাহিনী "আক্রমণ কর আর এদিক-ওদিক সটকে পড়" রীতি অনুযায়ী আমল করতে থাকে।

যখন শত্রুদের ঐক্যে ফাটল ধরতে থাকে, তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) শত্রুদের এক পার্শ্ব বাহিনীর উপর হামলা শুরু করেন। পেছনে নদী ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর চেষ্টা এই ছিল যে, শত্রুদেরকে পেছনে এতটুকু ঠেলে দেওয়া, যাতে নদী তাদের জন্য মুসিবতে পরিণত হয় অথবা তাদেরকে এতটুকু সামনের দিকে এগিয়ে আনা যাতে তাদের পশ্চাতে যাওয়ার জন্য ঘোড়াদের জায়গা হয়ে যায়।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর আক্রমণ কিছুটা এই ধরনের ছিল, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়। কিন্তু রোমীয় সৈন্যদের সালারও অভিজ্ঞ এবং সমর নেতৃত্ব ও রণকৌশলের উস্তাদ ছিল। সে তার বাহিনীকে সুশৃঙ্খল রাখে এবং মুসলমানদের উপর হামলা করায় ও মুসলমানদের হামলার প্রতিরোধও করায়। এভাবে যুদ্ধ ক্রমেই রক্তক্ষয়ী হতে থাকে।

হযরত খালিদ (রা.) রোমীয় সালারকে দেখতে পান। তিনি কয়েকজন অশ্বারোহীকে বলেন, তারা যেন সম্মুখ বাহিনীর মাঝে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করে। কয়েকজন অশ্বারোহী এ চেষ্টায় জীবন বাজি রাখে। অবশেষে কয়েকজন অশ্বারোহী রোমীয় সালার পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তার বডিগার্ডদের ব্যূহ ভেদ করে সালারকে হত্যা করতে সফল হয়।

রোমীয় ঝাণ্ডা ভূপতিত হতেই সৈন্যদের মাঝে হুলস্থুল পড়ে যায় এবং তারা পিছু হটতে থাকে। অনেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ে। বাকীরা পুল পেরিয়ে নদী পার হয়ে যায়। এভাবে পালিয়ে পালিয়ে তারা এক সময় ইন্তেকিয়া গিয়ে পৌঁছে।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) ইন্তেকিয়া পৌঁছে কেল্লা অবরোধ করেন। রোমীয়দের যুদ্ধ করার মানসিকতা ময়দানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) কয়েকবার ঘোষণা করান যে, কেল্লার দরজা খুলে দেয়া হোক। নতুবা কাউকে ক্ষমা করা হবে না এবং কোনো শর্ত মানা হবে না।

রোমীয় সৈন্যরা পূর্ণ হতেই শক্তিহীন হয়ে গিয়েছিল আর এখন তাদের মাঝে তাদের সালারও ছিল না। ময়দানেই সে নিহত হয়েছিল। ফলে তারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নেয় না। ভেতর থেকে একজন দূত বাইরে আসে। সে এসে অস্ত্র সমর্পণ করে এবং এই শর্ত পেশ করে যে, রোমীয় সৈন্যদেরকে নিরাপদে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে। মুসলিম সালারগণ এই শর্ত মেনে নেন। কেল্লায় থাকা রোমীয় সমস্ত সৈন্য কেল্লা ছেড়ে চলে যায় এবং মুসলমানরা ইন্তেকিয়ায় প্রবেশ করে। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ইন্তেকিয়া বিজয়ের মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে সমগ্র সিরিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রোমীয়দের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় শহরও মুসলমানদের দখলে চলে আসে। এর পরে ছোট ছোট দু'চার স্থান রয়ে গিয়েছিল, যেখানে রোমীয়রা বিদ্যমান ছিল। তবে তারা যুদ্ধের জন্য বিদ্যমান ছিল না; বরং পালিয়ে যাবার সুযোগ তাদের হচ্ছিল না। এভাবে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সিরিয়া যেমনি মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে, তেমনি এ ভূখণ্ড হতে রোমীয়দের শাসন ব্যবস্থা চিরতরে রহিত হয়ে যায়। অবসান ঘটে রোমীয় যুগের। শুরু হয় ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নবযুগ। ক্ষমতার হয় হাতবদল ও পালাবদল।

✪✪✪

কুসতুনতুনিয়ায় হিরাকেল ঈসায়ীদের এক প্রতিনিধি দলের সামনে তাঁর মহলে বসা ছিলেন। ইনি সেই সম্রাট হিরাকেল যার চোখের হাল্কা পলকে কয়েকজন মানুষকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হত। এই সেই হিরাকেল, যিনি প্রথমদিকে মুসলমানদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইনি সেই হিরাকেল যিনি এক সময় এই কথা বলে আশ্চর্য প্রকাশ করেছিলেন যে, আরবের এই বুদ্দুদের এই দুঃসাহস কিভাবে হল যে, তারা রোম সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে পা দিয়েছে! কিন্তু অল্প কিছু দিন পরেই সেই হিরাকেল তার রাজত্বের অর্ধেক মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে পরাস্ত অবস্থায় নিজের রাজধানী কুসতুনতুনিয়ায় বসা ছিলেন। যেন কখনও হার না মানা জুয়াড়ি বাজিতে হেরে গেছে এবং তার কাছে এক ফুটো পয়সাও নেই।

"তোমরা কীভাবে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পার যে, তোমরা মুসলমানদেরকে তাদের দখলকৃত অঞ্চল থেকে বের করে দিবে?" হিরাকেল তার সকাশে উপস্থিত ঈসায়ী প্রতিনিধি দলকে বলছিলেন, "যদি তোমাদের মাঝে এতটুকু জান-প্রাণ থাকত, তাহলে আজ আমাকে তোমাদের মাঝে এভাবে বসতে হত না।"

"রোম সম্রাট!" ঈসায়ী প্রতিনিধি দলের নেতা বলে, "এখন এই চিন্তা করা অর্থহীন যে, পরাজয়ের দায়ভার কার। আমরা যে বিষয় নিয়ে এসেছি তা আরেকবার শুনুন। ...

আপনারা যে ভূখণ্ড মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে এসেছেন, সেটা না আপনাদের ছিল, না মুসলমানদের। সেটা আমাদের ভূখণ্ড। পরাজয় আপনার সেনাবাহিনীর হয়েছে। কিন্তু আমরা এক ভীন জাতির গোলামে পরিণত হয়েছি। মুসলমানরা আমাদের থেকে কর নিয়েছে। এটা আমাদের জন্য অপমানকর। আমাদের দুর্বলতা হলো, আমরা একাকী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে পারি না। আমরা লড়ব। আমরা আমাদের জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনার সাহায্য আমাদের দরকার। যদি আপনি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করছি।"

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী ঈসায়ীদের কথা হিরাকেল এভাবে শুনছিলেন, যেন এ লোকেরা তার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে এসেছে অথচ এসব লোকের এসব বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। অথচ বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। হিরাকেলের আন্তরিক ইচ্ছা এটাই ছিল যে, তিনি সিরিয়ার ঈসায়ীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবেন, যা হবে অতি দীর্ঘ। যাতে মুসলমানরা সিরিয়াতেই ব্যস্ত থাকে এবং রোম সাম্রাজ্যের বাড়তি এলাকার দিকে অগ্রসর না হয়। এটা এক ধরনের গেরিলা আক্রমণের মত হবে।

বেশিরভাগ ঐতিহাসিক লিখেছেন, হিরাকেল তলে তলে সিরিয়ার নির্ভরযোগ্য পাদ্রীদের উস্কে দিয়েছিল। যাতে তারা ঈসায়ীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। ইতিহাসে এ তথ্যও লেখা আছে যে, ঈসায়ীরা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। ঈসায়ীদের যে প্রতিনিধি দল হিরাকেলের সামনে বসা ছিল, তাদের এই খবর ছিল না যে, যে প্রস্তাব তারা পেশ করতে এসেছে হিরাকেল পূর্ব হতেই তা বাস্তবায়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেছে। আগত প্রতিনিধি দলের কাছে তিনি এটা প্রকাশ করতে চান যে, তাদেরকে সাহায্য করে তিনি তাদের উপর মহা অনুগ্রহ করছেন।

পরিশেষে হিরাকেল প্রতিনিধি দলকে জানান যে, তারা যেন ফিরে গিয়ে স্থানীয় পাদ্রীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং পাদ্রী তাদের জানাবে যে, তাদের পেশকৃত প্রস্তাব কীভাবে কার্যকর হবে। হিরাকেল তাদের একথা বলেও আশ্বস্ত করেন যে, ঈসায়ীরা যখন মুসলমানদের উপর স্থানে স্থানে হামলা শুরু করবে, তখন হিরাকেল তাদেরকে সাহায্য হিসেবে তার ফৌজ প্রদান করবেন।

✪✪✪

মুসলমানরা তাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন চতুর্দিকে ছড়িয়ে রেখেছিলেন। যাদের মধ্যে এমন গোয়েন্দাও ছিল, যারা ঈসায়ী বেশে ঈসায়ীদের সঙ্গেই থাকত এবং পাদ্রীদের মুরীদ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কতক সিরিয়া ছেড়ে দক্ষিণ তুর্কী পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এটি রোম সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ ছিল।

এক দিন এক গোয়েন্দা উত্তর সিরিয়ার গোয়েন্দাদের থেকে তথ্য নিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে এসে বলে যে, ঈসায়ীরা ব্যাপকভিত্তিক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং হিরাকেল তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এরপর আরও দু'জন গোয়েন্দা এসে এ ধরনের রিপোর্ট দেয়। এসব রিপোর্টের ভিত্তিতে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা সামনে আসে। ঈসায়ীদের লোকজন অনেক ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর জানা ছিল যে, ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অত্যন্ত মারাত্মক হবে। এর কারণ এই ছিল যে, রোমীয়রা যেসব এলাকা ছেড়ে গিয়েছিল তা তাদের ছিল না। তারা পালিয়ে তাদের মূল সাম্রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অধিকৃত ভূখণ্ড মূলত ঈসায়ীদের ছিল। মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করায় তাদের প্রতি কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়নি। কিন্তু তারপরেও তারা মুসলমানদের গোলামী মেনে নিতে পারছিল না। যুদ্ধ করতে এসে পরাস্ত হলে তাদের জন্য পালানোর কোনো স্থান ছিল না। তাই তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি এমনভাবে নিচ্ছিল যা তাদের জয়ের কারণ হতে পারত।

গোয়েন্দাদের থেকে পূর্ণ রিপোর্ট নেয়া হয় যে, ঈসায়ীদের সংখ্যা কত হবে। তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেমন হবে এবং তাদের নেতৃত্ব কেমন হবে। ধারণা করা হচ্ছিল যে, যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবে রোমীয় সালাররাই। কেননা, ঈসায়ীদের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার মত কোনো সালার ছিল না। কেউ থেকে থাকলেও সে মুসলমান সালারদের সমপর্যায়ের কখনও ছিল না। তারপরেও যে উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাও মুসলমানদের জন্য বিরাট শঙ্কার কারণ হতে পারত।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে পরামর্শ চেয়ে বলেন, "সিরিয়ায় আমাদের রাজত্ব নবজাতকের মত। আমাদের কদম এখনও জমেনি। যদি আমরা কোনো ঝুঁকি নিই এবং তাতে পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়, তাহলে আমরা মদীনা পর্যন্ত জীবিত পৌঁছতে পারব না।"

"আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমাদের জীবিত থাকা না থাকার প্রশ্ন নয়। এটা চিন্তা করুন যে, তখন ইসলামের পতন শুরু হয়ে যাবে। কেননা, সমস্ত সৈন্য এখন সিরিয়ায়।"

"এটা কী ভাল হয় না যে, আমরা এ বিষয়ে আমীরুল মুমিনীনকে অবগত করি?" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "এবং মদীনা হতে সাহায্যও চাই! আমাদের সংখ্যা আর কতইবা আছে!"

"আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "মদীনা পর্যন্ত বার্তা যেতে এবং সেখান থেকে সাহায্য আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। এটা কী ভাল হয় না যে, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা আমাদের সৈন্যদেরকে আমরা এক স্থানে সমবেত করি? সেসব স্থানে আমরা একান্ত প্রয়োজনমত সৈন্য রাখব আর বাদ বাকীদেরকে কোথাও প্রত্যাহার করে নিয়ে আসব? খোদার কসম! আমি ঈসায়ীদেরকে খোলা ময়দানে এনে লড়াতে চাই।"

এসব আলোচনা হিমসে বসে হচ্ছিল। সেখানে অন্যান্য সালাররাও ছিল। তাদের সকলের মত ছিল, আমরা হিমসের অভ্যন্তরেই থাকব আর ইসায়ীদেরকে এখানে এসে অবরোধ করার সুযোগ দিব। হযরত আবু উবায়দা (রা.) অধিকাংশের মত অনুযায়ী এটাকেই রায় হিসেবে ঘোষণা করেন। আশেপাশের এলাকায় যেসব মুজাহিদ ছিল, তাদেরকেও হিমসে এনে সমবেত করা হয়। এর পাশাপাশি হযরত আবু উবায়দা (রা.) এক দ্রুতগামী দূতের হাতে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর বরাবর একটি বার্তা পাঠান। সে বার্তায় তিনি বিস্তারিতভাবে জানান যে, হিরাকেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ঈসায়ীরা কেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এটাও লিখেন যে, তিনি আপাতত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, হিমসে কেল্লা পরিবেষ্টিত থেকেই তিনি লড়াই করে যাবেন।

৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

✪✪✪

আরও দেড়-দুই মাস চলে যায়। একদিন ঈসায়ীদের একটি বিরাট দল হিমসে এসে পৌঁছে এবং শহর অবরোধ করে। মুসলমানরা এর জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য খোরাক এবং তীর ইত্যাদির স্তূপ শহরে জমা করে

রেখেছিল। ঈসায়ীরা মুসলমানদেরকে কেল্লাবদ্ধ দেখে এই ভেবে হতবাক হয়ে যায় যে, যারা খোলা ময়দানে লড়তে অভ্যস্ত তারা কীভাবে কেল্লাবদ্ধ হয়ে থাকল। এটাকে ঈসায়ীরা মুসলমানদের দুর্বলতা মনে করে। তারা মুসলমানদের আহ্বান করতে থাকে।

"মুসলমানরা! এবার তোমাদের মোকাবেলা হবে আরব ঈসায়ীদের সঙ্গে।"

"আমরা রোমীয় নই। মুসলমানেরা! হিম্মত কর, বাইরে এসে লড়াই কর।"

"কেল্লার দরজা খুলে দাও। নতুবা তোমাদের একজনও জীবিত থাকবে না।"

"এবার আমরা কর নিব।"

"ইসলামের সূর্য ডুবে গেছে।"

"বাইরে এসো এবং আমাদের কাছে করুণা ভিক্ষা চাও।"

এভাবে হরেক রকম কথা এবং ভর্ৎসনা করতে থাকে ঈসায়ীরা। মুসলমানদের পক্ষ হতে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করা হয়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-সহ অন্যান্য সালারগণ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন যে, তারা বাইরে বের হয়ে গেরিলা ধরনের আক্রমণ করে করে ঈসায়ীদের অস্থির ও তটস্থ করে তুলবেন।

কিন্তু হামলার সুযোগই আসে না। অবরোধের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম দিন চলছিল। হঠাৎ ঈসায়ীদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে যায়। তাদের উপর কোনো বিপদ নেমে এসেছিল কিংবা বিপদ পতিত হচ্ছিল। যেসব মুসলমান কেল্লার পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, তারা অবাক বিস্ময়ে দেখছিলেন যে, তাদের দশা এমন হওয়ার কারণটা কী?

দূরের দিগন্তে ধুলি উড়ছিল। উড়ন্ত ধুলা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল এবং উপর পানে উঠছিল। এটা কোনো কাফেলার উৎক্ষিপ্ত ধুলি ছিল না। দূর থেকেই বুঝা যাচ্ছিল যে, এটা কোনো ফৌজের উৎক্ষিপ্ত ধুলা-বালু হবে। যদি তারা কোনো ফৌজী দল হয়ে থাকে, তবে হয়ত ঈসায়ীদের কোনো দল হবে কিংবা রোমীয় ফৌজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

ঈসায়ীদের মধ্যে যে হুলস্থুল পড়ে যায় তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা যুদ্ধ করার বিন্যাসে বিন্যস্ত হতে থাকে। উৎক্ষিপ্ত ধুলি ঝড় তখনও অনেক দূরে ছিল। ঈসায়ীরা এক অজানা আতঙ্কে হিমসের অবরোধ গুটিয়ে নিয়েছিল এবং তারা একদিকে অতি দ্রুততার সঙ্গে চলছিল। মুসলমানরা কেল্লার দেয়ালে দেয়ালে নারাধ্বনি দিতে শুরু করে।

ধুলা-বালুর আস্তর ভেদ করে শনৈ শনৈ এক দল ফৌজের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। এটা ছিল মুসলিম বাহিনী। ঈসায়ীরা তাদের আগমনের খবর পূর্ব হতেই জেনে ফেলেছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, ঈসায়ীদের কোনো ট্রেনিং ছিল না। তারা অবরোধ অব্যাহত রাখলে নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে যেত। হিমসের কেল্লার দরজা খুলে যেত এবং ভেতর থেকে মুসলিম বাহিনীও বেরিয়ে আসত। তখন ঈসায়ীদের পরিনাম হত অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের সামনে এই আশঙ্কাও ছিল যে, তারা বসতিতে কোনো সৈন্য রেখে আসেনি। ফলে যুদ্ধ শুরু হলে মুসলমানরা তাদের পরাজিত করে তাদের বসতিতে হামলা চালিয়ে বসতি গুড়িয়ে দিবে এবং বসতির একজন মানুষও জিন্দা থাকবে না।

হিমসে অবরুদ্ধ মুসলিম বাহিনীকে যে মুসলিম ফৌজ সাহায্য করতে আসে তাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। তারা সকলেই অশ্বারোহী ছিলেন এবং তাদের সালার ছিলেন কা'কা' বিন আমর। এই মদদ এভাবে আসে যে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.)-কে বার্তা পাঠালেন। তিনি বলেছিলেন যে, ঈসায়ীরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক নয়। তাদেরকে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.) সামলাবেন। কিন্তু সাহায্যের আশু প্রয়োজন। হযরত উমর (রা.) ইরাকে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে নির্দেশ পাঠান যে, তিন জন সালারকে ঈসায়ী অধ্যুষিত এলাকায় পাঠিয়ে দাও।

তিন সালারের মধ্যে ছিলেন হযরত সুহাইল বিন আদী, আব্দুল্লাহ বিন উতবা এবং আয়ায বিন গনাম। হযরত উমর (রা.) ফরমানে এটাও লিখেছিলেন যে, সালার কা'কা বিন আমরকে চার হাজার অশ্বারোহী দিয়ে আবু উবায়দার সাহায্যার্থে হিমসে পাঠিয়ে দাও।

এভাবে কা'কা' অবরুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্যে পৌছান। তাঁর জানা ছিল না যে, হিমাস ঈসায়ীদের দ্বারা অবরুদ্ধ। তাদের আসতে দেখেই ঈসায়ীরা অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যায়।

আমীরুল মুমিনীন বাস্তবই বলেছিলেন যে, ইসায়ীরা সুশৃঙ্খল কোনো বাহিনী নয়। এটা ঈসায়ীরা নিজেরাই প্রমাণ করে দেয় এবং তারা আরও প্রমাণ দেয় যে, ঈসায়ীদের উপর মুসলমানদের নির্ভরশীল না হওয়া চাই। আর মুসলমানরা সিরিয়া বিজয়কে ততক্ষণ পূর্ণাঙ্গ মনে করবে না, যতক্ষণ তারা ভেতরগত আশঙ্কারও মূলোৎপাটন না করে। ঈসায়ীদের এই যুদ্ধ পরিকল্পনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মাজহাব এক না হওয়ার কারণে অথবা তারা মুসলমান না হওয়ার কারণে তাদের গাটছড়া এবং বন্ধুত্ব রোমীয়দের সঙ্গেই।

খলীফার নির্দেশে উপদ্বীপের সমস্ত এলাকা মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেয়া হয় না। যদি কোথাও ঈসায়ীরা সশস্ত্র হয়ে বাধা দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবলম্বন করা হয়। উত্তর সীমান্তকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে বাঁচাতে হযরত আবু উবায়দা (রা.) সীমান্তের ওপারে গিয়ে হামলা শুরু করেন। এসব রীতি-নীতি ও পদক্ষেপের ফলে সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। জনগণের জান-মাল নিরাপদ হয়ে যায়।

✪✪✪

হযরত উমর (রা.) ন্যায়-ইনসাফের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। ফারুকী ন্যায়পরায়নতা প্রবাদতুল্য ছিল। তাঁর ন্যায় ও ইনসাফের লাঠি দ্বারা সবাইকে সমানভাবে শায়েস্তা করা হত। তার ন্যায়দণ্ড গরীব-আমীর, রং, বংশ এবং মনিব-গোলাম কাউকে চিনত না। তৎযুগে হযরত খালিদ (রা.)-এর সমপাল্লার কোনো সালার ছিল না। তিনি ইসলামকে সিরিয়া, জর্দান এবং ফিলিস্তিন পর্যন্ত প্রসার করেছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়ী যেই হোন না কেন, এতে কোনো সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হযরত খালিদ (রা.) না হলে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করা এত সহজ হত না। হযরত উমর (রা.) ব্যক্তিগতভাবে ভাল করে জানতেন যে, কায়সার ও কিসরার বিরুদ্ধে কতক বিজয় এই জন্য সম্ভব হয়ছিল যে, সেসব যুদ্ধের ব্যাপারে হযরত খালিদ (রা.) অসাধারণ দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঠাণ্ডা মেজাজের সালার ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সঙ্গে না থাকলে রোমীয়দের বিরুদ্ধে এত দ্রুত এত বেশি সফলতা অর্জন করা সম্ভব হত না।

স্বয়ং হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রশংসাকারী ছিলেন। কিন্তু যখন হযরত উমর (রা.)-এর কানে হযরত খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে এমন এক অভিযোগ পৌঁছে যা ইসলামী রীতি-নীতির বিরোধী ছিল এবং যেটা হযরত উমর (রা.) এড়িয়ে যেতে পারেন না, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। হযরত উমর (রা.) এটা ভাবেন না যে, মর্যাদা ও সম্মানের বিচারে হযরত খালিদ (রা.)-এর যে উঁচু অবস্থান, তাতে সামান্য অভিযোগ আমলে না নিলেও চলে।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত উমর (রা.) খলীফা হয়েই সমস্ত বাহিনীতে এক-দুইজন করে বিশেষ গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছিলেন। যাদের দায়িত্ব ছিল, সালার ও দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নজর রাখা। যখন

সিরিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে কনসিরীনের শাসক বানিয়ে দেয়া হয়, তখন মদীনায় হযরত উমর (রা.) জানতে পারেন যে, হযরত খালিদ (রা.) আশয়াছ বিন কায়েস নামীয় এক কবিকে দশ হাজার দেরহাম শুধু এই জন্য পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন যে, তিনি কনসিরীন গিয়ে হযরত খালিদ (রা.) এবং বর্ণাঢ্য বিজয়ের ধন্যবাদ ও প্রশংসাস্বরূপ একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন।

আশয়াছ বিন কায়েস বনু কিন্দার সর্দার ছিলেন। তিনি কবিতা রচনা এবং গুণ-কীর্তন করাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি এবং তার মত আরও কিছু কবি সালার এবং শাসকদের কাছে যেতেন, কবিতা পাঠ করতেন এবং হাদিয়া-তোহফা ও পুরস্কার অর্জন করতেন। এভাবে আশয়াছ কনসিরীনে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে যান।

হযরত খালিদ (রা.) আমীর পিতার পুত্র ছিলেন। তিনি জীবনে অস্বচ্ছলতা কোনো দিন দেখেননি। শাহজাদাদের মত লালিত-পালিত হয়েছিলেন। অর্ধেক জীবন যুদ্ধের ময়দানে, মাটিতে শুয়ে এবং ঘোড়ার পিঠে পার করেছিলেন। তাঁর রুচি ও স্বভাব ছিল উন্নত ও মার্জিত। তিনি দানশীল ছিলেন। প্রত্যেক সুন্দরের ভক্ত এবং অনুরক্ত ছিলেন। ছিমছাম ও ফিটফাটকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি ঐ কবিকে যে পুরস্কার দিয়েছিলেন, তা নিজের পকেট থেকে দিয়েছিলেন। সে সময়ে সালার এবং আমীররা অনেক ধনী হত। এর কারণ এই ছিল যে, দুশমনের যে সালারকে তিনি মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করতেন, তার সমস্ত সহায়-সম্পদের অধিকারী তিনি হতেন। এ ছাড়া গণীমতের মাল থেকে তিনি অংশ পেতেন।

হযরত খালিদ (রা.) জীবনে অনেক শত্রুপক্ষের সালারকে মল্লযুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। তাদের সহায়-সম্পদ হযরত খালিদ (রা.) লাভ করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদ নিজের কাছে রাখতেন না। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সিরিয়ার যুদ্ধ সমাপ্ত হলে হযরত খালিদ (রা.) নিজের প্রশিক্ষিত দলটিকে নিজের পকেট থেকে নগদ পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ বাহিনী যে নৈপুণ্য ও কীর্তি পেশ করেছিল, তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তারা এর চেয়েও বেশি পুরস্কারের যোগ্য ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতির দৃষ্টিতে পুরস্কারের হিসেবটা ছিল ভিন্ন এবং সেটাই ছিল ইসলামের আইনের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

✪✪✪

হযরত উমর (রা.) ইসলামী ইতিহাসের প্রখ্যাত মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রা.)-এর হাতে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নামে একটি লিখিত পত্র পাঠান।

"... খালিদকে মুজাহিদদের মাঝে দাঁড় করাবে। তার মাথা হতে পাগড়ী খুলে ফেলবে। পাগড়ী দ্বারা তার দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধবে। তার মাথা থেকে টুপিও খুলে ফেলবে। এরপরে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, সে আশয়াছ বিন কায়েছ নামীয় এক কবিকে যে পুরস্কার দিয়েছে তা কি নিজের পকেট থেকে দিয়েছে না কি গণীমতের মাল হতে দিয়েছে। যদি সে স্বীকার করে যে, মালে গণীমত হতে দিয়েছে, তাহলে তাকে খেয়ানতকারী হিসেবে বন্দী করবে। আর যদি সে নিজের পকেট থেকে দিয়ে থাকে, তাহলে তাকে অপচয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। এ দুয়ের মধ্য হতে যে অভিযোগই সে স্বীকার করবে তার প্রতিফল হিসেবে তাকে বর্তমান পদ থেকে বরখাস্ত করবে এবং তাঁর স্থানে তুমি কাজ করবে। ..."

এটা আরবদের রীতি ছিল যে, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তারা তার হাত তারই পাগড়ী দ্বারা বেঁধে জনতার সামনে জিজ্ঞাসা করা হত যে, সে এই অপরাধ করেছে কি না। একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে এমন আচরণ করা হত। কিন্তু হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর মত এক মহান সেনাপতি এবং ইতিহাস নির্মাতা সালারকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন এই পত্র পাঠ করেন তখন নীরবতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। যদি হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে সামান্যতমও অনুমতি দিতেন বিষয়টি তদন্ত করার জন্য, তাহলে তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন না। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) জানতেন যে, হযরত উমর (রা.) ন্যায়ানুগ আচরণ এবং আদল-ইনসাফের ব্যাপারে কেমন কঠোর।

সে সময়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হিমসে এবং হযরত খালিদ (রা.) কনসিরীনে ছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) দূত পাঠান কনসিরীন থেকে হযরত খালিদ (রা.)-কে ডেকে আনতে।

দূত এসে যখন হযরত খালিদ (রা.)-কে বার্তা দেন, তখন তিনি বসা হতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান।

"খোদার কসম! হযরত খালিদ (রা.) নারাধ্বনি দেয়ার মত বলেন, "আমাকে আরেকটি যুদ্ধ করার জন্য তলব করা হয়েছে।"

হযরত খালিদ (রা.) মনে মনে এই খুশি নিয়ে হিমসে পৌছান যে, রোমীয় অথবা বাযানতিন এর বিরুদ্ধে বড় কোনো যুদ্ধের অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যখন তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সামনে আসনে তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর চেহারায় বিষন্নতার ছাপ দেখেন।

"আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর কাছে বসে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি যে ধারণা করে এসেছি তা কি ভুল?"

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) গভীর ভগ্নাহত কণ্ঠে বলেন, "আমরুল মুমিনীন তোমার উপর অভিযোগ দায়ের করেছেন যে, তুমি দশ হাজার দেরহাম আশয়াছকে দিয়েছ। যদি তা গণীমতের মাল হতে দাও তাহলে এটা খেয়ানতের অপরাধ আর যদি নিজের পকেট থেকে দাও তাহলে এটা অপব্যয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে নাজায়েয। হযরত বেলাল (রা.) এই জবাব নেয়ার জন্য এসেছেন।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে, তিনি নীরব হয়ে যান।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) আরেকবার জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর মুখ হতে একটি শব্দও বের হয় না। মূলত হযরত আবু উবায়দা (রা.) চাচ্ছিলেন যে, হযরত খালিদ (রা.) কিছু না কিছু অবশ্যই বলুক। যাতে ঐ কাজ করা না লাগে যা করতে আমীরুল মুমিনীন পত্র মারফত নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর উপর এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি হযরত বেলাল (রা.)-এর দিকে ফিরেও তাকান না।

পরিশেষে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর দিকে তাকান। এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি যেন আরবের রীতি অনুযায়ী হযরত খালিদ (রা.) হতে জবানবন্দী নেন। হযরত বেলাল (রা.) পূর্ণ নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল কর্তব্য পূর্ণ করে যাওয়া। হযরত খালিদ (রা.) কিছুটা সময় চান, যা মঞ্জুর করা হয়। এই সুযোগ তিনি পেতেনই। কেননা, রীতি অনুযায়ী সমস্ত ফৌজ একত্রিত করার প্রয়োজন ছিল, যাদের সামনে হযরত খালিদ (রা.) অপরাধ স্বীকার করবেন।

✪✪✪

হযরত খালিদ (রা.)-এর এক বোন ফাতেমা হিমসে থাকতেন। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাসায় যান এবং তাকে বলেন যে, উমর (রা.) তাঁর উপর এই অভিযোগ আরোপ করেছেন। বোনের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন এই জন্য

দেখা দিয়েছিল যে, হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর নিকটতম আত্মীয় ছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) বড় দুঃখ হেতু হযরত উমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে একটি কঠিন কথা বলেন। হযরত খালিদ (রা.) প্রথমেই চিন্তিত ছিলেন এবং ভেতরে ভেতরে তার ক্ষোভও ছিল। বোনের পরামর্শ তার কাছে ভাল লাগে এবং তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে চলে আসেন।

"আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমি কোনো জবানবন্দী দিব না।"

এরপর আসমান ও জমিন যে দৃশ্য দেখে তা দেখেও কেউ বিশ্বাস করবে না যে, এমন আচরণ ঐ মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে করা হচ্ছিল যিনি ইসলামের মহানত্বের ভিত্তি এবং যিনি ব্যতীত ইসলাম বর্তমান অবস্থায় পৌছাতে পারত না। হযরত খালিদ (রা.)-এর হাত পিছমোড়া করে তাঁরই পাগড়ীতে বাঁধা ছিল। তার মাথায় টুপি ছিল না। তিনি মাটিতে দোজানু হয়ে বসা ছিলেন এবং হযরত বেলাল (রা.) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অপরাধের স্বীকারোক্তি নিচ্ছিলেন।

"ইবনে ওলীদ!" হযরত বেলাল (রা.) জিজ্ঞাসা করছিলেন, "তুমি আশয়াছকে দশ হাজার দেরহাম নিজের পকেট থেকে দিয়েছ নাকি গণীমতের মাল হতে?"

হযরত খালিদ (রা.)-এর চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নীরব থাকেন। হযরত বেলাল (রা.) আরেকবার জিজ্ঞাসা করেন।

"ইবনে ওলীদ!" হযরত বেলাল (রা.) বলেন, "আমি আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ পালন করছি। জবাব দাও। তুমি দশ হাজার দেরহাম আশয়াছকে নিজের পকেট থেকে দিয়েছ নাকি গণীমতের মাল হতে?"

"নিজের পকেট হতে" হযরত খালিদ (রা.) পরিশেষে জবাব দেন।

হযরত বেলাল (রা.) তার হাত খুলে দেন এবং স্বহস্তে পাগড়ী তার মাথার উপরে রাখেন।

"আমাদের সকলের উপর আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ পালন করা ফরজ।" হযরত বেলাল (রা.) বলেন, "আমরা প্রত্যেক সালারকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি।"

ঘটনাস্থলে যত সৈন্য ছিল তাদের মাঝে নীরবতা বিরাজ করছিল। এই নীরবতার মাঝে ক্ষোভ লুকায়িত ছিল। প্রত্যেকের চোখে-মুখে প্রশ্ন ও অভিযোগের চিহ্ন ছিল। সকলের মনের কথা এটা ছিল যে, কমপক্ষে হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে এমন আচরণ না হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শৃঙ্খলা ও নিয়মের দাবী ছিল যে, এক বৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কারো মুখ খোলার উপায় ছিল না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এবং হযরত বেলাল (রা.)-এর অবস্থাও

এমন ছিল যে, তারা চোখ উপরে তোলেন না। তাদের দৃষ্টি ছিল নিম্নগামী, অশ্রুতে ছলছল ছিল তাদের চোখ।

হযরত খালিদ (রা.) এই ভেবে ঘোড়ায় চড়ে বসেন এবং সেখান থেকে চলে আসেন যে, ব্যাপারটি মনে হয় এখানেই শেষ। এরপর ৭/৮ দিন চলে গেলেও হযরত খালিদ (রা.) নতুন কোনো নির্দেশ পান না; ফলে তিনি শঙ্কিত মনে হিমসে আসেন এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশনামা হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেন, "নাও, কী লেখা আছে পড়।"

এটা ছিল সেই হুকুমনামা যা আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর বরাবর পাঠিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিল, খালিদ যেটাই স্বীকার করুক না কেন তাকে যেন বরখাস্ত করা হয়।

"আপনার উপর রহম হোক আমীনুল উম্মত!" হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেন, "আমীরুল মুমিনীনের এই নির্দেশ আমাকে সেদিনই কেন শোনাননি?"

"খোদার কসম আবু সুলায়মান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, "তোমাকে যে দুঃখ দেয়া হয়েছে, আমি বলে তোমার সে দুঃখ আর বাড়াতে চাইনি। এটা দুঃখের উপর দুঃখ যে, তোমাকে বরখাস্তও করা হয়েছে।"

হযরত খালিদ (রা.) নীরবে তাঁর ঘোড়ায় চেপে বসেন এবং হিমস ছেড়ে চলে আসেন। ইতিহাস এ তথ্য দিতে অক্ষম যে, হযরত খালিদ (রা.) তখন আপন মনে কী ভাবছিলেন। তার আবেগে কেমন উত্থান-পতন হচ্ছিল। তিনি নিজের পকেট থেকে পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এটা কোনো অপরাধ ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাঁকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তা খুবই অপমানকর এবং কঠিন। তার জীবনের এটা ছিল দ্বিতীয় ঘটনা যে, তিনি ভাঙ্গা উদাসমনে সফর করছিলেন। প্রথম ঘটনাটি ছিল মক্কা হতে মদীনায় আসার সময়ের। সে সময়েও তিনি আপন মনে উদাসভাবে একাকী সফর করছিলেন। সে সফরে তিনি মক্কা হতে মদীনায় গিয়ে নবীজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর এখনও তিনি উদাসভাবে সফর করছিলেন, হিমস থেকে কনসিরীনের উদ্দেশ্যে তার বরখাস্তের নির্দেশ শুনে। তার স্মৃতিতে বিভিন্ন কষ্ট-বেদনা, চাঞ্চল্য এবং না জানি কত শত চিন্তাধারা ভীড় জমিয়েছিল। তিনি সেই চিন্তার ভীড় কেটে কেটে নীরবে পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন।

ঘোড়ার উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তিনি আত্মভোলার মত পথ চলছিলেন। তারপরেও প্রশিক্ষিত ঘোড়া তাকে কনসিরীনে পৌঁছে দেয়। শহরে গিয়েই তিনি তার হাতে গড়া বিশেষ অশ্বারোহী দলটিকে ডেকে পাঠান। এই দলটি ছিল নির্বাচিত ও সুশিক্ষিত। এই দলটিই তাদের থেকে কয়েক গুণ বেশি শক্তিধর শত্রুর পা উপড়ে দিয়েছিল। এই দলটি হযরত খালিদ (রা.)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। তাঁর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে দু'দিন আগের কথা যে, এই দলটিই তাঁর নির্দেশে কীভাবে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং জয় ছিনিয়ে আনত। অথচ এখন তিনি তাদের তলব করেছেন তাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করার জন্য।

এক সময় প্রিয় দলটি তাঁর সামনে আসে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বহুত কিছু বলতে চান। কিন্তু মুখ তার ফোটে না। মুখ থেকে কথা বের হয় না। দীর্ঘ নিরবতায় তিনি হারিয়ে যান। মূলত তিনি এ দলের থেকে বিচ্ছিন্নতা ও বিদায় গ্রহণ সহ্য করতে পারছিলেন না। পরিশেষে তিনি মুখ খোলেন। অস্ফুট কণ্ঠে সংক্ষেপে তাদের বিজয়, বিদ্যুৎগতি, জীবনবাজি এবং বীরত্বের মন খুলে প্রশংসা করেন। এরপর তাদের জানান যে, তিনি আজ তাদের থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করছেন।

হযরত খালিদ (রা.)-এর শেষ কথাটি তাদের হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তারা শক খায়। তারাও সইতে পারে না প্রিয় নেতার বিরহ বেদনা। ফলে অস্ফুট কান্নায় তাদের শ্বাস ফুলতে থাকে ও সুনসান নীরবতা নেমে আসে সকলের মাঝে। অবশেষে কান্নার রোল নীরব-নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দেয়। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেন এবং সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করেন। কারণ এই দৃশ্য তাঁর সহ্যের বাইরে ছিল।

সেখান থেকে হযরত খালিদ (রা.) হিমসে যান। সমস্ত মুজাহিদদের সঙ্গে দেখা করেন। ভাঙ্গা মনে সকলকে বিদায় জানান এবং মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

✪ ✪ ✪

হযরত খালিদ (রা.) মদীনায় প্রবেশ করেন। কিন্তু এক বিজয়ী সালারের বেশে নয় যে, জনতা ঘর থেকে বের হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। তাঁর অবস্থা ছিল এক সাজাপ্রাপ্ত আসামীর মত। ঘটনাক্রমে মদীনার এক গলিতে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর মুখোমুখী হন।

"আবু সুলায়মান!" হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর সমর কীর্তির কথা এভাবে স্মরণ করে বলেন, "তুমি ঐ কাজ করেছ, যা অন্যরা করতে পারে না। তবে প্রত্যেক কাজ আল্লাহই করেন।"

"আর আপনি যে কাজ করেছেন তা কোনো মুসলমানের মনঃপুত হয়নি", হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "হে ইবনে খাত্তাব! আপনি আমার সঙ্গে বে-ইনসাফী করেছেন।"

"কোথা হতে এসেছে এই অর্থ-সম্পদ, যা তুমি অবৈধভাবে খরচ করছ?" হযরত উমর (রা.) বলেন, "আবু সুলাইমান! তুমি কি রোমীয় ও পারস্যদের মত বাদশা হতে চাও? ... খোদার কসম! তুমি অবশ্যই আমার কাছে সম্মানের পাত্র। তুমি আমার প্রিয়জন। এখন তোমার বিরুদ্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ থাকবে না। খোদার কসম! আমি কোনো সালার, আমীর এবং কোন শাসককে বাদশার মত হতে দিব না যে, কেউ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে সে তার পকেট পুরস্কার দিয়ে ভরে দিবে।"

হযরত খালিদ (রা.) এরপর এক-দুই দিন মদীনায় থেকে কনসিরীন চলে যান। তিনি চিরদিনের জন্য মদীনা ছেড়ে যান।

আল্লাহর তলোয়ার খাপে বদ্ধ হয়ে যায়।

✪✪✪

আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে অনেক কথা বলা যায়। ইতিহাস রচয়িতাগণ এ ব্যাপারে নিজ নিজ মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ হযরত উমর (রা.)-এর উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনকে হেয় প্রতিপন্নকারীরা লিখেছেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর মনে হযরত খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল, যা তিনি এভাবে মেটান যে, খলীফা হয়েই তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করে দেন।

কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কিছু ছিল। যদি আমরা বিষয়টি বর্তমান যুগ এবং এ যুগের শাসকদের অবস্থা সামনে রেখে ভাবি, তাহলে হযরত উমর (রা.)-এর ফায়সালা ভাল লাগবে না, ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু যদি আমরা সে যুগের অবস্থা কল্পনায় আনি এবং তার গভীরে প্রবেশ করি, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য যে, যুগ হিসেবে হযরত উমর (রা.)-এর ফায়সালাই সর্বোচ্চ সঠিক ছিল।

চিন্তা করুন, হযরত উমর (রা.) বলেছিলেন, তুমি বাদশা হতে চাও? কেন তিনি এ কথা বলেছিলেন? কারণ হলো, বাদশাহদের প্রকৃতি এমনই হয় যে, যে ব্যক্তি তাদের প্রশংসায় দু'চার বাক্য বলে দেয়, তারা তাদেরকে সম্মান ও পুরস্কার দিয়ে ঢেকে দেয়।

চিন্তা করুন, হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টি ভবিষ্যতের পর্দা ভেদ করে কত গভীরে পৌঁছেছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে আগত খলীফারা পুরস্কার ও

সম্মানীর ধারার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। আব্বাসীরা তো পুরোদস্তুর বাদশাহ হয়ে গিয়েছিল। স্পেনের শেষ যুগকে দেখুন! তখনকার চিত্র ছিল এমন, রাজপুরীতে দরবার বসেছে। কবি এবং সাহিত্যিক গদ্য ও পদ্যে কবিতা পড়ছে এবং পুরস্কারে নিজেদের থলে ভরছে। তখন খোশামোদ ও চাটুগিরি পেশায় পরিণত হয়েছিল। অথচ এই সব পুরস্কারভোগী, প্রশংসাকারী এবং চাটুকাররাই স্পেনের রাজত্বকে কর্ডোভা পতন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল।

এরপর ইসলামী সাম্রাজ্য বাদশাহদের মাঝে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। হিন্দুস্তানে (ভারতবর্ষে) মোঘল সাম্রাজ্যের পুরস্কার প্রথার কথা তো সুপ্রসিদ্ধ। পরে এক সময় এ কারণে এই সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত হয়।

পাকিস্তানের দিকে তাকান। পুরস্কার ও সম্মানীর ঐ নিন্দিত ধারা চলে আসছে, যাকে ইসলাম অবৈধ অপব্যয় বলে অভিহিত করেছে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) নিজের পকেট থেকে পুরস্কার দেন এবং এর জন্য বরখাস্তের শাস্তি পান। কিন্তু আমাদের শাসকগণ বর্তমানে সরকারী কোষাগার হতে পুরস্কার দিচ্ছে। বাস্তবতা এই যে, পুরস্কারের এ অঢেল অর্থ মূলত বিদেশ থেকে আনা ঋণেরই অর্থ, যার সুদ আমরা দিয়ে থাকি।

হযরত উমর (রা.)-এর দূরদৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে যে, যদি হাদিয়া-তোহফা ও পুরস্কারের ধারা অব্যাহত থাকে তবে তার পরিণামে পতন অনিবার্য। তাই তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর মাহাত্ম্য ও সম্মান সত্ত্বেও ঐ কঠোর পদক্ষেপ নেন। তিনি এর দ্বারা সবাইকে সতর্ক করে দিতে চান যে, অদূর ভবিষ্যতে কেউ যদি এমন অপচয় করে তাহলে তার ক্ষমা নেই। বিচারের কাঠগড়ায় তাদের দাঁড়াতেই হবে। শাস্তির সম্মুখীন হতেই হবে। তাঁর এই পদক্ষেপ আপাতদৃষ্টিতে কঠিন ও রূঢ় মনে হলেও তার অন্তর্নিহিত বার্তা ছিল বড়ই শিক্ষামূলক। ভবিষ্যতের জন্য সকলেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। এতে যেমন এক নাজায়েয কাজের লাগাম টেনে ধরা হয়েছিল, তেমনি ইসলামী সাম্রাজ্যের পতনের এক সমূহ সম্ভাবনার মূলোৎপাটন করা হয়েছিল। যদি হযরত উমর (রা.) সেদিন এই কঠিন পদক্ষেপ না নিতেন তাহলে ইসলামী সাম্রাজ্যের আমীর ও শাসকদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের প্রবণতা শুরু হয়ে যেত। সমাজে চাটুকার ও খোশামোদীর সয়লাব বয়ে যেত। হযরত উমর (রা.) এটাকেই কঠিন হস্তে দমন করেছেন।

হযরত উমর (রা.) এ কারণেও হযরত খালিদ (রা.)-কে ক্ষমা করেন না যে, তিনি বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে চান, আদল-ইনসাফ ও শাস্তির ক্ষেত্রে ছোট-বড়র কোনো পার্থক্য নেই। আইন সকলের জন্য সমান। তিনি আরও ভেবেছিলেন যে, তিনি যদি আজ হযরত খালিদকে মাফ করে দেন, তাহলে এটা

রীতি হয়ে যবে যে সালার, আমীর, শাসক এবং গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা শাস্তির উর্ধ্বে। তারা অন্যায় করলেও শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। অর্থাৎ আইন শুধু দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর জন্য; সবল ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা আইনের উর্ধ্বে। তখন আদল-ইনসাফ বলতে আর কিছু বাকী থাকবে না এবং ইসলামী সমাজ ছোট ও বড় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। হযরত উমর (রা.) আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এত কঠোর ছিলেন যে, তিনি এক অপরাধে নিজের পুত্রকে পর্যন্ত একশত বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আশিটি বেত্রাঘাত করার পর তাঁর পুত্র মারা গিয়েছিল। হযরত উমর (রা.)-কে বিষয়টি জানানো হলে তিনি নির্দেশ দেন যে, একশত আঘাত পূর্ণ কর। ফলে বাকী কুড়িটি বেত্রাঘাত লাশের উপরেই প্রদান করা হয়। এই হল উমর আর এমনই ছিল তাঁর ন্যায়-নীতি।

✪✪✪

মদীনা হতে হযরত খালিদ (রা.) কনসিরীনে যান। সেখান থেকে হিমসে চলে আসেন। বাদ বাকী চার বছর তিনি সেখানেই কাটান। এক সময় এমন আসে যে, হযরত খালিদ (রা.) নিঃসম্বল ও কর্পদকহীন হয়ে যান। কুরাইশদের শাহজাদা রণক্ষেত্রের বাদশা, উদার মনের অধিকারী, অমায়িক, হাজার হাজার দেরহাম দানকারী মানুষটি চরম অর্থ-সংকটে পড়েন। কিছু দিন পূর্বে আমীরুল মুমিনীন কতক মুসলমানের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। বাৎসরিক তিন হাজার দেরহাম। হযরত খালিদ (রা.) এ ভাতা পেতে থাকেন। এই ভাতার পয়সা দ্বারাই তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে হিমসে কালাতিপাত করতে থাকেন।

হযরত খালিদ (রা.) সেই খালিদ আর ছিলেন না, যার এই গর্জনে :

انا فارس الضديد – انا خالد بن الوليد

আমি পারস্যদের জমদূত
আমি খালিদ বিন ওলীদ।

শত্রুদের উপর ভীতি ছেয়ে যেত। তিনি এখন ঘরকুনো হয়ে যান। তাঁর হাসি-খুশি, খোশমেজাজ এবং বিলাসিতা সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নির্বাক ও বিষণ্ন মানব হয়ে যান।

✪✪✪

৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৮ হিজরীতে তিনি আরেক আঘাতের সম্মুখীন হন। এ আঘাত তাকে শেষ করে দিয়েছিল। ফিলিস্তিনের আমওয়াস এলাকায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এ রোগ

মহামারী আকারে সমস্ত ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ দ্রুত মৃত্যুর মুখোমুখী হতে থাকে।

এ পর্যায়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর শেষ জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। আর তা হলো, ঐতিহাসিকগণ লিখেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন মহামারী এড়াতে মদীনায় চলে আসেন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) জবাব দেন যে, আমার যেসব সঙ্গী যুদ্ধের ময়দানে কখনও আমাকে ছেড়ে যান নি, প্লেগ মহামারির ভয়ে আমি তাদের ছেড়ে আসব না। সুতরাং তিনি তাঁর বাহিনীর সঙ্গেই থাকেন এবং প্লেগ মহামারীর শিকার হয়ে ইন্তেকাল করেন।

হযরত খালিদ (রা.) যেসব সালার সঙ্গীদের সাথে থেকে একযোগে বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারাও উক্ত মহামারীতে মারা যান। তাদের মধ্যে হযরত আবু উবায়দা (রা.), হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রা.), হযরত যাররার (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) অন্যতম ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর কয়েকজন সন্তানও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। চোখের সামনে প্রিয় সন্তানদের মারা যাওয়াটা হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য প্রচণ্ড আঘাত ছিল। তিনি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিলেন। আঘাতে আঘাতে তার ভেতরটা ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। প্লেগ মহামারীতে প্রায় পঁচিশ হাজারের মত মুসলমান মারা গিয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.) প্রথম থেকেই সদা চুপচাপ থাকতেন। কিন্তু এবার প্লেগে সন্তানদের মারা যাওয়ায় এত নীরব হয়ে যান, যেন তাঁর কথা বলার শক্তিই শেষ হয়ে গেছে। মুসলমানদের বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর প্রধান সেনাপতি হন হযরত আমর বিন আস (রা.)। হযরত খালিদ (রা.) যখন মুসলমানদের কোনো বিজয়ের খবর শুনতেন, তখন তাঁর চেহারায় আনন্দ ঝলমল করত। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য মাত্র। পরক্ষণেই সেই চেহারা মেঘেরা এসে দখল করে নিত। খুশির ঝিলিক দূর হয়ে পুরানো বেদনার ছাপ আবার তাঁর চেহারাকে গ্রাস করে নিত। সম্ভবত এ কারণে তার মনে বেদনা জাগত যে, আরেকটি যুদ্ধ হয়ে গেল অথচ তিনি তাতে শরীক হতে পারলেন না।

৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ২১শে হিজরীতে হযরত খালিদ (রা.)-কে এমন সব রোগ ঘিরে ধরে, যা তাঁকে ভেতর থেকে অতি দ্রুত কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে চলছিল। এটা ছিল আঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব। এক সময়ে তাঁর শরীরে পচন শুরু হয়। এই অবস্থায় একদিন তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে দেখতে আসেন এবং তাদের মাঝে আলোচনা হয়।

"মনোযোগ দিয়ে দেখ" হযরত খালিদ (রা.) এক পা থেকে কাপড় সরিয়ে বন্ধুকে দেখান এবং জিজ্ঞাসা করেন, "আমার পায়ের এমন কোনো স্থান তুমি দেখছ যেখানে তীর, তলোয়ার বা বর্শার ক্ষত নেই?"

বন্ধু এমন কোনো স্থান দেখেন না, যেখানে ক্ষতস্থান ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) অপর পা আবরণমুক্ত করে বন্ধুকে দেখান এবং পূর্বের মত আবার জিজ্ঞাসা করেন। এরপর এক এক হাত করে উভয় হাত দেখান এবং উক্ত প্রশ্ন করেন। এরপর বুক ও পিঠ দেখান। তাঁর শরীরের এক বিঘত জায়গাও এমন ছিল না, যেখানে জখমের চিহ্ন ছিল না। তাঁর বন্ধু অবাক বিস্ময়ে তার শরীরের সবখানের এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

"তুমি কি জান আমি কত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি?" হযরত খালিদ (রা.) অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলেন, "এরপর আমি শহীদ হলাম না কেন? লড়াই করতে করতে আমার মৃত্যু হলো না কেন?"

"আপনি যুদ্ধের ময়দানে নিহত হতে পারেন না আবু সুলাইমান!"

বন্ধুবর তাকে আশ্বস্ত করে জানায়, "আপনাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম 'সাইফুল্লাহ' তথা আল্লাহর তরবারি আখ্যা দিয়েছেন। এটা নবীজির পক্ষ হতে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আপনি যুদ্ধের ময়দানে মারা যাবেন না। যদি আপনি রণক্ষেত্রে মারা যেতেন, তাহলে সবাই বলত যে, 'এক কাফের ইসলামের তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলেছে'। অথচ এমনটি হতে পারে না। ... আপনি ইসলামের 'নাঙ্গা তলোয়ার' ছিলেন।

ইন্তেকালের সময় হযরত খালিদ (রা.)-এর নিকটে হাম্মাম নামীয় এক ভৃত্য ছিল। সে জানায় যে, মুমূর্ষু অবস্থায় হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমি এক উটের মত মরছি। শয্যায় মারা যাওয়া আমার জন্য লজ্জাজনক।" এ কথা বলে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং ঐ আল্লাহর কাছে তিনি পৌছে যান, যার তলোয়ার তিনি ছিলেন। এভাবে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

হযরত খালিদ (রা.) ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের খবর দ্রুত সবস্থানে ছড়িয়ে যায়। মদীনায় তাঁর ইন্তেকালের খবর পৌছলে বনু মাখযুমের মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। তাদের ক্রন্দন করতে দেখে অন্যান্য গোত্রের মহিলারাও ঘরের বাইরে চলে আসে। এভাবে পুরো মদীনা শোকস্থলে পরিণত হয়। মহিলারা শোকে বুক চাপড়াচ্ছিল এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আমীরুল মুমিনীন খলীফা হয়েই রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন যে, কারো মৃত্যুতে কেউ মর্সিয়া ক্রন্দন করতে পারবে না। তাঁর নির্দেশ কঠিনভাবে পালিত হচ্ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর ইন্তেকালের

খবরে মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এসেছিল। হযরত উমর (রা.) নিজের বাড়িতে থেকে মহিলাদের এই কান্নাধ্বনি ও শোক গাঁথা শুনেন। এতে তিনি চরম ক্ষুব্ধ হন। দেয়ালে ঝুলানো লাঠি হাতে নিয়ে দ্রুত বাইরে আসেন। কিন্তু দরজা পর্যন্ত এসেই তিনি থেমে যান। কিছুক্ষণ চিন্তা করে ফিরে আসেন। লাঠি সেখানেই ঝুলিয়ে রাখেন যেখানে পূর্বে ছিল।

"বনু মাখযুমের মহিলাদের জন্য কান্নার অনুমতি আছে" হযরত উমর (রা.) ঘোষণা দেন, "তাদেরকে আবু সুলাইমানের ইন্তেকালে মাতম করতে দাও। তাদের কান্না দেখানোর জন্য নয়। ক্রন্দনকারীরা আবু সুলাইমানের মত ব্যক্তিত্বের ইন্তেকালে কাঁদতেই পারে।"

হিমসে একটি সুন্দর বাগিচা আছে। সেখানে আছে ফুল-ফল সমৃদ্ধ পুষ্পবীথি। মধ্যখানে রয়েছে একটি মসৃণ রাস্তা। ঐ বাগিচায় একটি মসজিদ আছে। মসজিদটি হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর নামে সুপ্রসিদ্ধ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় মসজিদ। এই মসজিদের এক কোণায় হযরত খালিদ (রা.)-এর কবর রয়েছে। হযরত খালিদ (রা.)-এর বীরত্ব গাঁথা যারা জানতে চান, তারা আজও যেন ঐ মসজিদ হতে এই হুংকার শুনতে পান–

انا فارس الضديد

انا خالد بن الوليد

আমি পারস্যদের যমদূত
আমি খালিদ বিন ওলীদ।

সমাপ্ত

অন্তত একবার পড়ুন

ইতিহাস মুক। সমর বিশেষজ্ঞগণ বিস্মিত। সকলের অবাক জিজ্ঞাসা - ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানেরা রোমীয়দের কিভাবে পরাজিত করল? রোমীয়দের সেদিন চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। এ অবিশ্বাস্য ঘটনার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পাকা ফলের মত মুসলমানদের ঝুড়িতে এসে পড়েছিল।

এটা ছিল অভূতপূর্ব সমর-কুশলতার ফল। ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ) যে সকল রণকৌশল অবলম্বন করেছিলেন আজকের উন্নত রাষ্ট্রের সেনা প্রশিক্ষণে তা গুরুত্বের সাথে ট্রেনিং দেয়া হয়।

ইসলামের ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার কোন কোন ঘটনায় পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। একই ঘটনা একাধিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। ফলে তা হতে সত্য ও বাস্তব তথ্য আহরণ পাঠকের জন্য গলদঘর্মের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।....

এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য-সঠিকরূপে পেশ করতে আমরা বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সকল যাচাই-বাছাই করেছি এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা লিখেছি।

যে ধাঁচে এ বীরত্বগাঁথা রচিত, তার আলোকে এটাকে একটি উপন্যাস বললে বলতে পারে, কিন্তু এটা ফিল্মি স্টাইল এবং মনগড়া কাহিনী-নির্ভর বাজারের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত নয়। এর পাঠক উপন্যাসের চাটনিতে ঐতিহাসিকতার পথ্য গলধঃকরণ করবেন গোগ্রাসে। এতে ঐতিহাসিকতা বেশী, ঔপন্যাসিকতা কম।

এটা কেবল ইতিহাস নয়, ইসলামী ঐতিহ্যের অবয়ব। মুসলমানদের ঈমানদীপ্ত কাহিনী। পূর্বপুরুষদের গৌরব-গাঁথা এবং মুসলিম জাতির জিহাদী জযবার প্রকৃত চিত্র। পাঠক মুসলিম জাতির স্বকীয়তা জানবেন, সাহিত্যরস উপভোগ করবেন এবং রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

বাজারে প্রচলিত চরিত্রবিধ্বংসী উপন্যাসের পরিবর্তে সত্যনির্ভর এবং ইসলামী ঐতিহ্য-উদ্বুদ্ধ উপন্যাস পড়ুন। পরিবারের অপর সদস্যকে পড়তে দিন। নিকটজনদের হাতে তুলে দিন মুসলিম জাতির এ গৌরবময় উপাখ্যান।

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

ISBN-984-32-1818-3

পরিবেশক

আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স
(মাতৃভাষা বাংলায় বিশুদ্ধভাবে ইসলামী জ্ঞান সম্প্রসারণের একটি নিবেদিত প্রয়াস।)
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০